KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২৩/১ ২৩/২ ২৩/৩ ২৩/৪	Year of Publication : বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৮ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬৮ কার্তিক - পৌষ ১৩৬৮ মাঘ - চৈত্র ১৩৬৮
	Condition : Brittle Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

চতুরঙ্গ ॥ হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮

ত্রৈমাসিক পত্রিকা চতুরঙ্গ মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮

॥ সূচীপত্র ॥

আলডুস হক্সলি ॥ সাহিত্য ও আধুনিক জীবন ২৭৯
আনন্দ বাগচী ॥ উপসংহার ২৮৬
চিত্ত ঘোষ ॥ হৃদয়ের পাপ ২৮৭
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ॥ অনাবিষ্কৃত ২৮৮
শামসুর রহমান ॥ একটি মৃত্যুবার্ষিকী ২৯০
মোহিত চট্টোপাধ্যায় ॥ একটি চতুর্দশপদী ২৯২
সুধাংশু ঘোষ ॥ ফানুসের উপমা ২৯৩
ভবতোষ দত্ত ॥ বাংলার শিক্ষা চিন্তা ৩৬০
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আধুনিক সাহিত্য ৩৭২
সমালোচনা—দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত,
প্রণবকুমার বর্ধন, নৃপেন্দ্র সান্যাল ৩৭৭

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

ত্রয়োবিংশতিতম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা চতুরঙ্গ মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮

সাহিত্য ও আধুনিক জীবন

অলড্যাস হক্সলি

সাহিত্য জীবনকে আর জীবনই বা সাহিত্যকে কিভাবে, কতখানি স্পর্শ করে—এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে এই বাক্যগুলির সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করা যাক। সাহিত্য বলতে এই প্রসঙ্গে কি বোঝায় আর যে জীবন সাহিত্যকে স্পর্শ করে আবার সাহিত্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই জীবনটা ঠিক কাদের, এইটাই আসল জিজ্ঞাস্য।

ইতিহাসের গতিনির্ধারণ করে অনেকগুলি জিনিস, যার মধ্যে মুখ্য হল যন্ত্র-শিল্পবিজ্ঞান, আর্থিক বিধিব্যবস্থা, যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে আছেন সেই সব বড় বড় ব্যক্তির কার্যকলাপ, এবং ভাব-সমষ্টি। সমস্ত চিন্তা ও ধারণাকেই সাহিত্য নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে, যখন লেখায় বা স্মরণীয় ভাষায় তাদের একটা বিধিবদ্ধ প্রকাশরূপ দেওয়া যায়। তবে 'শব্দরূপী ভাব-বস্তু'—সাহিত্যের এই সংজ্ঞা এতই ব্যাপক ও বৃহৎ যে আমাদের সাধারণ প্রয়োজনে সেটা তেমন কাজে লাগার মতো নয়। লক্, হেগেল, মার্ক্স ও লেনিনের রচনাবলী ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়েছে, এবং সরাসরি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকেও সেই সূত্রে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ধরা যাক্, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে শেক্সপীয়রের যা ধারণা ও মনোভাব কিংবা প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে অনুভূতি ও জল্পনা, তাদের প্রকাশ-রূপকে আমরা যে নাম ও সংজ্ঞা দিয়ে থাকি, অধ্যাত্মবিদ্যা বা অতি-বিজ্ঞান-বিষয়ক ভাবনার ও রাষ্ট্রদর্শনের ভাষা বা বাক্যরূপগুলিকে যদি আমরা সেই অভিধায় চিহ্নিত করি, তা হলে সেটা নিতান্তই অচল হয়ে দাঁড়ায়। এর পরে যা বলব, সেখানে 'সাহিত্য'কে শব্দটির ঐ শেক্সপীয়রের ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের অর্থেই প্রয়োগ করব।

এই সীমিত অর্থে, সাহিত্যকর্মের ভিতর থাকতে পারে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দার্শনিক ও রাষ্ট্রিক চিন্তার অতি উজ্জ্বল প্রকাশ, অর্থাৎ সেই সব ভাবধারা যা ইতিহাস-নির্মাণে সাহায্য করেছে, মানুষের সামাজিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তিজীবনকে স্পৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। বহুকাল ধরেই নানা কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধ-লেখক এই সব চিন্তা ও ভাবনার প্রবর্তনে আপনাদের বিশিষ্ট ক্ষমতা নিযুক্ত করেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে, কখনও বা সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। যেমন রুশোর

রাষ্ট্রিক চিন্তা ইতিহাসে দাগ রেখে গেছে, কিন্তু দান্তের ক্ষেত্রে সে কথা বলা যায় না। কিংবা আর একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দেওয়া যাক। এইচ্. জি. ওয়েল্‌স তাঁর সময়-কালে বোধ হয় সব চেয়ে প্রশংসিত লেখক ছিলেন এবং তাঁর লেখাও খুব ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়েছিল। পৃথিবীর সর্বত্র বহু লোক তাঁর অনেক বই পড়েছেন। কিন্তু যে মানবিকতা যে স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদ তিনি নিপুণভাবে নিয়ত প্রচার করে গেছেন, তা আমাদের এই শতকের ইতিহাসে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ফল রেখে যায় নি—প্রসঙ্গতঃ যে ইতিহাসকে বলা যায়, জাতীয়তাবাদের উগ্র উপাসনা এবং একনায়কত্বের ক্রমিক বৃদ্ধিরই ইতিহাস। 'ফ্যান্টাসি'-লেখক হিসাবে ওয়েলসের যেমন পরম সাফল্য, বিশ্বজনীনতার পুরোধা আর উদার বুদ্ধিবাদের অক্লান্ত সমর্থক ও কর্মী হিসাবে তেমনই তাঁর চরম ব্যর্থতা।

সমস্ত কিছু বিবেচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সাহিত্যিক ক্ষমতা আর প্রচারকর্মের সফলতা, এ দুয়ের মধ্যে সমানুপাত সম্পর্ক নেই। প্রতিভা যত বড়ই হোক, ইতিহাসের পরিবর্তন-ক্ষম কোনও মত বা চিন্তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার অঙ্গীকার দিতে সে অপারগ। বস্তুতঃ প্রতিভার স্পর্শই সে চিন্তার সাধারণ স্বীকৃতির বিপক্ষে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় কিংবা ব্যবসায়িক প্রচারকর্মের বেলায় সুন্দর ভাষা, সুকুমার বোধশক্তি, ভাবের গভীরতা বা সূক্ষ্মতা, কিছুরই প্রয়োজন হয় না। যা দরকার তা হচ্ছে, যে ভাবটা মনের মধ্যে ঢোকাতে হবে, তারই মূল ও স্থূল কথাগুলোকে কয়েকটা বাঁধা বুলির মাধ্যমে বারবার বলে যাওয়া। এই পুনরাবৃত্তি ও অতি-সরল কথনেও অনেক সময় ফল পাওয়া যায় না। তার সঙ্গে চাই অনুকূল অবস্থা এবং যাদের সহজে বোঝানো যায় না, তাদের মত ঘোরানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে দরকার হয় কখনও ইঙ্গিতে কখনও প্রকাশ্যে বল-প্রয়োগের ভয় দেখানো। আর প্রতিভাধর ব্যক্তিদের যে সব চিন্তা ও ভাব শেষ পর্যন্ত সাধারণ লোকের কাছে গ্রাহ্য হয় এবং ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেওয়ার মত ক্ষমতা অর্জন করে, তাদের অধিকাংশই হল দ্বিতীয় বা তৃতীয় হাত-ফেরৎ এবং ব্যাখ্যাকারীদের মুখে মূল ধারণাবস্তুর বিকৃত ব্যঙ্গ-রূপ ছাড়া বেশি কিছু নয়।

ল্যাটিন ভাষায় Vates কথাটি কবি ও ভবিষ্য-দ্রষ্টা উভয়কেই বোঝায়। ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে বলা চলে যে একাধিক মহৎ কবি উচ্চ আদর্শের স্রষ্টা, বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও বিশ্বাসের সমর্থক, পাপের অমঙ্গলের নির্মম সমালোচক, কল্যাণের সদ্ধর্মের মহান্ উদ্‌গাতা হিসাবেও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তবু এ কথাও মানতে হবে যে প্রফেটের কাজ আর কবি-কর্ম মূলতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্। বিজ্ঞদর্শনের ভিত্তি ঔচিত্যজ্ঞানে, তার কারবার ধর্মভাব ও বোধগম্যতার সঙ্গে। ভূয়োদর্শীকে জোর গলায় বলতে হয়, আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত মনে হলেও, সব-কিছুর মধ্যে একটা ঐশ্বরিক পরিকল্পনা, বিশ্বসৃষ্টির এক পরম উদ্দেশ্য রয়েছে। আর কাব্য এবং সাধারণতঃ সব ভাল সাহিত্যই যা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান তাকে নিয়েই জড়িত, যা হওয়া উচিত তার সঙ্গে নয়। তার বিষয়বস্তু হল শুধু জীবনের, অস্তিত্বের অবর্ণনীয় রহস্য। নিখিলের নর-নারীর মধ্যে যে অপার সম্ভাবনা আছে, যত রকম দোষ ও গুণ, উজ্জ্বল বুদ্ধি-শক্তি আবার তমোময় আত্মঘাতী নির্বুদ্ধিতা, মরমী অন্তর্দৃষ্টি আর অতিকায় কুসংস্কারের ঘৃণ্য প্রীতি—সেই সব বিচিত্র শক্তি ও সম্ভাবনাই তার স্বক্ষেত্র। অধ্যাত্মজীবনের সকল গুরুর উপদেশ হল 'আত্মানং বিদ্ধি'। এই অপরিহার্য অত্যাবশ্যক স্বজ্ঞান বা আত্ম-বোধের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সাহিত্যের উদ্দেশ্য এবং প্রধান কাজ। যাঁরা Vates তাঁরা প্রসঙ্গতঃ কিছু ভবিষ্য-দর্শন করান—হয় ঈশ্বরের নামে, নয়তো সমাজ-

বিজ্ঞান বা ইতিহাসের দোহাই দিয়ে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মুখ্যতঃ আত্মসন্ধিৎসু না হচ্ছেন, মানব-অভিজ্ঞতার বিচিত্র বৈষম্যের মধ্যে তাঁর দৃষ্টিপ্রবেশকে অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে না পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কেবল আলংকারিক শুধু প্রচারবিৎ থেকে যান। প্রকৃত কবি তাঁকে বলা যাবে না।

একটি ভালো কবিতা, বলতে গেলে ভালো সাহিত্যের যে কোনো নমুনা সব সময়েই একটি বিবৃতি—ডাঃ জনসনের ভাষায় যা আপাতসরল না হলেও প্রথম প্রকাশেই অকৃত্রিম সত্য বলে স্বীকৃতি পায়। আর যারা এর সন্ধান পায়নি, তারাও আশ্চর্য হয় ভেবে, এ জিনিস কেমন করে তাদের নজর এড়িয়ে গেছে। কিন্তু হায়, এতদিন যে দৃষ্টিগোচর হয়নি, তার কারণগুলি তো খুব সোজা! বেশির ভাগ লোক নিজেদের সম্বন্ধে খুব কম কথাই জানে। অনন্যসাধারণ নারী ও পুরুষেরা আত্মবীক্ষার ফলে জানতে ও বুঝতে পারেন—তাঁরা কি দেখেন ভাবেন ও অনুভব করেন, তাঁদের আচরণের পিছনে কি যুক্তি আছে—তাঁদের দেহ-মন-সত্তার বিচিত্র বাস্তব সত্য থেকে তাঁদের স্বনির্বাচিত অথবা পরিবেশ-নির্ধারিত জীবনের সুনির্দিষ্ট ছকটা কতখানি তফাত। গভীর ব্যঞ্জনা-উদ্রেকী ভাষায় সৎসাহিত্য পরিস্ফুট করে তোলে ঐ সব আত্মবীক্ষার ফলাফল, অভিজ্ঞতার উত্তরণ। যাঁরা এই জাতের সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেন, তাঁরা অনেকটা ঐ লেখকের মতই আত্মসন্ধান-ক্রিয়ায় উদ্দীপিত হন। আত্মার সঙ্গে দেহের, চেতন সত্তার সঙ্গে অবচেতন মনের, নিজের সঙ্গে অপরের,—প্রকৃতির, সমাজ-প্রতিষ্ঠানের ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের যে সব সম্পর্ক লেখক খুঁজে বার করেছেন, তার অন্ততঃ কিছুটা বাদ-সাদ দিয়েও পাঠকের কাছে সত্য বলেই গ্রাহ্য।

নিজেকে বোঝার এ শিক্ষা পাওয়া যায় সৎ সাহিত্য থেকে। আর খারাপ সাহিত্য শেখায় (যে কথা পরে বলার দরকার হবে) নিজেকে ভুল বোঝা। ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষিরা অন্যায়কে নিন্দা করেন, মানুষকে সৎপথে চালিত হবার নির্দেশ দেন। যাঁরা কবি, যতক্ষণ তাঁরা সত্যিকারের কবি, তাঁরা সৎ ও অসতের গোপন উৎসগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তোলেন। এই চৈতন্য এক মস্ত জিনিস,—এর উৎকর্ষ কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করে না, প্রমাণের অপেক্ষাও রাখে না। এই আত্মজ্ঞান যদিও এক চূড়ান্ত সত্য, যাকে নিরপেক্ষভাবে অনুসরণ করা যায়, তবু নৈতিক বিচারেও তা সমর্থনযোগ্য। সব ভালো সাহিত্যেরই যা লক্ষ্য, অর্থাৎ সত্যচেতনার বর্ধিত দীপ্তি, তা শুধু নিজগুণেই মঙ্গল নয়, সত্তার গভীরে সূক্ষ্মরূপী পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলেও তার পরম মূল্য। যে আত্মজ্ঞান এই রূপান্তর সাধন করছে, তার ফলে হয় তো কিছু কিছু অদৃশ্য দুর্বলতা, অজ্ঞাত পাপ ও নির্বুদ্ধিতা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু পরিবর্তনটা দৈব ক্রিয়ার মতো ভালোর দিকেও নিয়ে যেতে পারে।

সৎ সাহিত্য হল উদার সূর্যের মতো—ভালো-মন্দ, জড়-প্রতিভা সবার উপর তার অপক্ষপাত আলোকবৃষ্টি। "ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা"য় শেক্সপীয়র কোথাও বলেন নি—বহু-বিচিত্র পাত্রপাত্রীর মধ্যে, মানবপ্রকৃতি সমাজ ও নিখিল-সম্পর্কে কার মতামতটা খাঁটি। রোমাণ্টিক ও মূলতঃ নিষ্পাপ ট্রয়লাস অথবা বীর্যশালী হেক্টর কিংবা স্থির-বুদ্ধি বিজ্ঞ ইউলিসিস—কার ধারণাটা ঠিক? না কি ক্যাসন্ড্রার—যার মতে এই নিষ্ঠুর পৃথিবীটা দেবতাদের দ্বারা নয়, এক দুর্জ্ঞেয় নির্মম নিয়তির দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে? কিংবা পুষ্পিতযৌবনা হেলেনের ও ক্রেসিডার ধারণাটাই অভ্রান্ত—যাদের কাছে শরীরসর্বস্ব প্রেমের চেয়ে পৃথিবীতে বৃহত্তর সত্য আর নেই? না কি থেরসাইটিস—যার নির্মম সমালোচনায় যত সব বড় বড়

কথা আর মহান ভঙ্গিমা ধূলিসাৎ হয়ে যায়, যার বলায় ক্লান্তি নেই যে মহত্তম প্রাণ এমন দেহাশ্রয়ী—যার মর্যাদাহীন পরিণাম রোগভোগে, জরায়, শরীর-যন্ত্রণায়, অনিবার্য ধ্বংসে? সে কি সত্যিই সত্যকে জেনেছে, ধরতে পেরেছে? শেক্সপীয়র কারুর দিকেই টেনে কথা বলেন নি, কোনো মন্তব্যই পেশ করেন নি। এখানে তিনি Vates অর্থে প্রফেট হতে চান নি, যে ভূমিকায় সম্মানের সহজতর অধিকার। তিনি থেকে গেলেন Vates অর্থে কবি। যা হওয়া উচিত কিংবা অন্য রকম হলে পৃথিবীটা কি হতে পারত, তার দার্শনিক বিচার ও নৈতিক সমর্থন তাঁর কর্ম নয়। তিনি কবি—অর্থাৎ যা আছে, যা হয়ে থাকে তারই সন্ধান ও নিরপেক্ষ প্রকাশ হল তাঁর কর্মের আয়তি। এক দফা বিশ্বাস কিংবা এক বিশেষ ধরনের কর্মপন্ধতির মধ্যে পাঠককে তিনি জোর করে টেনে এনে ফেলতে চান নি। তিনি তাঁর কাহিনী রচনা করে গেছেন—যা পড়লে মন খুব প্রফুল্ল না হতে পারে, মস্ত আদর্শের দেখা নাও মিলতে পারে। তিনি পর্যবেক্ষণ আর আত্ম-বিশ্লেষণের ফলাফলগুলো ধরে দিয়েছেন। সত্য-জ্ঞানের এই কাব্যিক দীক্ষা গ্রহণ পাঠকের ইচ্ছাধীন, তাকে বর্জন করাতেও তার পূর্ণ স্বাধীনতা।

আত্মজ্ঞান হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বোধশক্তি। অর্থাৎ শব্দস্তরের নীচে যে সব অনুভূতি, একটা বৃহৎ বোধগম্যতায় রূপান্তরিত হবার আগে অস্তিত্বের অস্ফুট রহস্য সম্বন্ধে যে সব ধারণা, তারই প্রত্যয়-বোধ। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকারটা কি? উপযুক্ত ভাষা, একেবারে নিখুঁত বাক্যরূপ খুঁজে মরার অসীম যন্ত্রণার সার্থকতা কোথায়? এ প্রশ্নের বিপরীত-মন্য উত্তর হচ্ছে যে বাক্যের মাধ্যমেই ভাষাহীন সূক্ষ্মতর অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদের চেতনা জন্মায়। দন্তশূল কি পদার্থ কিংবা ব্যাঘ্র-ভীতির রকমটা কি, তা বলার জন্য ঔপন্যাসিক অথবা গীতি-কবির দরকার হয় না। কিন্তু যেখানে অভিজ্ঞতা তেমন সহজ নয়, প্রত্যক্ষ নয় কিংবা আরও জটিল, সেখানে ভালো কবি, ভালো কথা-সাহিত্যিক যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। আমরা যখন ভালোবাসি, তাঁরাই বলতে পারেন প্রেমে পড়লে কি হয়, কেমন লাগে। লজ্জায় পাপে আমরা যখন সঙ্কুচিত হই, তখন তাঁরাই সেই লজ্জা বা পাপবোধের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলেন। অনুকম্পা আর ঘৃণা, প্রশংসা এবং হিংসা, অনুরাগ ও বিরাগ—এই ধরনের জটিল ও বিরোধী ভাবের যুগপৎ ক্রিয়ায় আমরা কিভাবে চালিত হই, সে সম্বন্ধে আলোকপাত করেন তাঁরাই। এ সব অনুভবের সাহিত্যিক রূপায়ণ থেকে, পাঠক বুঝতে সাহায্য পান নিজের মধ্যে নানা সূক্ষ্ম ও অনুরূপ বোধগুলিকে—যে সব বোধ ও অনুভব ভাষার অন্তরালে বিধৃত ধারণা থেকে পৃথক হয়ে বিরাজ করে কিন্তু যাদের কথা উপন্যাসে কবিতায় না পড়লে অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যেত, তাদের সম্বন্ধে কোনো পরিষ্কার ধারণা অর্জন করাই সম্ভব হত না। আমাদের সত্তার চেতনার যেটা মূল জমি, সেই নির্ভাষ চিন্তার অ-ভাবের দিকে পথনির্দেশ করছে ঐ ভাব-বস্তুরই শব্দ-রূপ। এই ভাষাহীন ভূমি-চেতনাই আত্মজ্ঞান। কিন্তু নির্বাক্ সে জগতে পৌঁছুবার রাস্তাটা গিয়েছে শব্দের রাজ্যের বুক চিরে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে নিজে নিজ অভিজ্ঞতার স্বরূপ জানতে ও বুঝতে সাহিত্য আমাদের সাহায্য করে। ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা খানিকটা নির্ভর করে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দেহ ও মনের গঠনের ওপর আর খানিকটা পরিবেশ-প্রকৃতির ওপর। ফল্স্টাফের মতো যার শারীরিক গঠন আর হট্স্পারের মতো যার স্বাস্থ্যের অবস্থা—জগৎ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টি

বা অভিজ্ঞতা সমান হয় না। মিঃ পিকউইকের দেহের মধ্যে ক্যাসিয়াসের সত্তা—এটা প্রায় সম্ভাবনার বাইরে। জীবন সাহিত্যকে স্পর্শ করার আগে সেই সব ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে যাঁরা ঐ সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। আর তাঁদের বিচিত্র দেহমনের গঠন অনুযায়ী পরিবেশের চাপ ও প্রভাব নানাভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কারণেই আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক জীবন সম্পর্কে কোনো সাধারণ মন্তব্য, ব্যাপক উক্তি পুরোপুরি গ্রহণ করা চলে না। আদিম কৌম যুগের সংস্কৃতি-স্তরের ঊর্ধ্বে এমন কোনো সমাজ নেই যাকে একক ও সমগোত্র বলা চলে। অতএব এই বিচিত্রধর্মী সমাজ-পরিবেশে লালিত লেখকেরা দেহ-মনের বিকাশে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিপরীত হতে পারেন। সহজবোধ্য এই কথাগুলি মনে রেখে এখন কি ভাবে আমাদের দ্রুত ও আমূল পরিবর্তনশীল সমাজ আধুনিক জীবন ও সাম্প্রতিক সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করছে, তারই আলোচনায় সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া যাক্। বর্তমানে আমরা যে অ-ভূতপূর্ব পরিবেশে বাস করছি, তার প্রতিক্রিয়ায় কি ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হচ্ছে? অষ্টাদশ শতকের বদলে এই বিংশ শতাব্দীতে যে আমরা বেঁচে আছি, তার দরুন আমাদের মনোজগতে কি সব পরিবর্তন ঘটছে, তার কয়েকটি বিবেচনা করে দেখি।

প্রথমেই আসছে হাইড্রোজেন বোমা আর ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগে বাস করার ফলে আমাদের মানসিক বিপর্যয়। অনেকের মনেই এটা এক দীর্ঘস্থায়ী অর্ধস্ফুট দুশ্চিন্তার মতো লেগে আছে। পৃথিবী যে অনায়াসে যে কোনো মুহূর্তে বিনা দ্বিধায়, বিনা বিবেচনায় বা চেষ্টায় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সেই চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটা নিরুদ্দেশ্য অর্থহীন জীবনের ব্যর্থতাবোধ।

তারপর, উৎপাদন ও বণ্টনের আধুনিক উপায়পন্ধতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা। যন্ত্রশিল্পের প্রতিটি উন্নতির সঙ্গে সমান পদক্ষেপে সমাজের অগ্রগতি হওয়া দরকার। ক্রমশই বেশি লোক দেখতে পাচ্ছে, শিল্পসংস্থার স্বার্থ কিংবা আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলা ও সুবিধার জন্যই যে সংগঠনগুলির অস্তিত্ব এবং যাদের পরিচালনায় তাদের কোনো হাত নেই, সেই সব প্রতিষ্ঠানের কাছে তারা ক্রমশঃ পুরোপুরি অধীন হয়ে পড়ছে। সেই কারণেই মানুষের মনে একটা অসহায় ভাব ক্রমে বিস্তৃত ও গভীর হয়ে উঠছে। নিজের ভাগ্য-নির্ণয়ে কোনো অধিকার নেই বলেই এই নৈরাশ্যবোধ। ক্রমাগ্রসর যন্ত্রশিল্প-বিজ্ঞান একটু একটু করে স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত করে দেয়। আমরা তিনশ' কোটি মানুষ এখন দু চার কুড়ি সেনাপতি, শাসক আর রাজনৈতিক নেতার হাতের পুতুল মাত্র। তাঁদের কেউই হয়তো তেমন বিশেষ সাধু বা বিজ্ঞপুরুষ নন। তাঁরা এমন এক কঠোর রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বন্দী যার ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র-প্রতিমাপূজা, যার নিশ্চিত পরিণতি নিশ্চিহ্নকারী বিপর্যয়ে। তাই এই পুরোপুরি অসহায় ভাবের সঙ্গে একটা তিক্ত গভীর অনাস্থার মনোভঙ্গী যে প্রায়ই যুক্ত হয়ে থাকে, তা বিচিত্র নয়।

বর্তমান সময়ে জনসংখ্যার আকস্মিক বিপুল বৃদ্ধি ঐ ক্রমাগ্রসর যন্ত্রশিল্পের একটি আনুষঙ্গিক ফল বলে গণ্য করা যায়। যীশুখৃস্টের জন্মকালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে পঁচিশ কোটি ছিল বলে ধরা হয়। এই সংখ্যা দ্বিগুণিত হতে লেগেছিল ষোলশ' বছর। আর আমাদের এখনকার প্রায় তিনশ' কোটি জনসংখ্যা ছয়শ' কোটিতে পরিণত হতে সময় লাগবে মাত্র চল্লিশ বছর। পৃথিবীর লোক-সমাবেশের এই অভূতপূর্ব বিস্ফারের একটা ফল হয়েছে—বড় বড় শহরের বিস্ময়কর বৃদ্ধি। আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি লোক

এখন সম্পূর্ণভাবে মানুষের তৈরী আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছে। আমাদের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে জীবনে গোরু দেখে নি, ফলের গাছ কিংবা শস্যক্ষেত কি বস্তু, তা জানল না। এই পরিপার্শ্বে মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ধরনের হতে পারে? প্রথমতঃ আসছে—বঞ্চনাবোধ, অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতা। আধুনিক বড় শহরের বাসিন্দারা অবিমিশ্র কদর্যতার মধ্যে বাস করে, প্রকৃতি-জগতের যে রহস্য, যে সজীব অনন্যতা তার সঙ্গে তাদের কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। ফলে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাকে natural piety বলেছেন, সে জিনিসটা ওদের মধ্যে একেবারেই পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে এটা উল্লেখযোগ্য যে যদিও আধুনিক কবিরা নিসর্গ নিয়ে খুব কমই কবিতা লিখে থাকেন, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গদের জীবন নিয়ে লেখা অ-সাহিত্যিক কিংবা আধা-সাহিত্যিক বই আজকাল খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নগরবাসীর বঞ্চনা ও অভাব-বোধটাই যেন সাহিত্যে কেবল প্রতিফলিত হচ্ছে আর ঐ সব অভাবের ফলে আত্মার যে ক্ষুধা জাগছে, প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ব-বিদদের ওপর এখন সেই ক্ষুধা মেটানোর ভার। এ ছাড়া, পৃথিবীর এক বিশাল নগরপ্রধান অঞ্চলে শুধু নাগরিক জীবন যাপনের ফলাফলের কথাও ভাবতে হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, সাহিত্যিকরাও সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সেটা প্রকাশ করেছেন, যে নগরবাসীদের মনে একটা নিঃসম্পৃক্ত ভাব জাগে—তারা সমাজের একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, তারা সব সময়ে জনতার মধ্যে বাস করেও চিরটাকাল সঙ্গহীন।

আধুনিক প্রয়োগ-বিজ্ঞানের আর একটি ফল জন্মনিরোধ। মনের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া, সে কথা এখন বিবেচনা করা যাক। যন্ত্রশিল্পের বিস্তার এখন পৃথিবীর যে সব দেশকে উন্নত করেছে, কেবল সেখানেই জন্মনিরোধের উপায়গুলি প্রায় নিয়মিতভাবে অনুসৃত হচ্ছে। এ সব জায়গার নারী ও পুরুষদের পক্ষে এখন সন্তান-উৎপাদন থেকে যৌন জীবনকে স্বতন্ত্র করা সম্ভব হয়েছে। লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির দিক থেকে বিচার করলে, এ দুটি জিনিসকে তফাত রাখাই প্রায় সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় বলতে হবে। কিন্তু এই পৃথক্‌করণের মানসিক ফলাফলটা কি? সেটাও একরকম ভালো, বলতে পারি। পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন বজায় রাখতে হলে, জৈব সত্তা থেকে প্রেমকে যদি বিচ্ছিন্ন করা যায়, তা হলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক খাঁটি মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আবার হৃদয়ের কোমল বৃত্তির কথা ছেড়ে দিলে বলা যায় যে জৈব আনুষঙ্গিক থেকে যৌনতাকে মুক্ত করে নিলে, একটা মস্ত বড় অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাকে সস্তা ও খেলো করে ফেলা হয়। বিনা যন্ত্রণার যৌনজীবন, সরলীকৃত এবং সকলের আয়ত্তের মধ্যে যে যৌনজীবন, সেটা যদি প্রেমসম্পর্করহিত যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়, তা হলে আবার সেটা বন্ধ্যা ভূমিতে আত্মারই অবক্ষয় ছাড়া কিছু নয়। অবশ্য এটা এখন আর লজ্জাকর বস্তু নয়। কারণ জন্মদান থেকে যৌনবোধকে পৃথক করতে গিয়ে জন্মনিরোধের কার্যকরী উপায়গুলো এখন আর পাপ বলে গণ্য হয় না, যৌনসম্পর্ককে পাপবোধ থেকেও মুক্ত করেছে। তবু হৃদয়বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে, ঐ অতি-সহজ যৌনজীবন অর্থহীন এবং যথেচ্ছ ব্যবহারে মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের সমাজ-পরিবেশে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ফলে যে সব নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম হয়েছে, তাদের সন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে হয়েছে, এক একটি অভিধায় চিহ্নিত করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করতে হয়েছে। আধুনিক জীবন সেই হিসাবে আধুনিক সাহিত্য-স্রষ্টাদের প্রভাবিত করছে। আবার যারা বর্তমান জীবনের সম্মুখীন হয়ে তার চিন্তাভার, তার ব্যর্থতা ও অসহায়তা, তার তিক্ততা নিঃসম্পর্কতা এবং নির্জনতাকে বুঝতে চাইছে,—বলা যেতে

পারে, যে অতি-বন্ধ জনবাহুল্যময় ভীতিপ্রদ অতি-নাগরিক জীবন-পরিবেশ ঐ সব অভিজ্ঞতা অনুভব বা অর্জন করতে তাদের বাধ্য করেছে—তারাও আধুনিক সাহিত্যের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে।

এতক্ষণ আমি সৎ সাহিত্যের কথাই কেবল বলেছি। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের বেলায় যা, সাহিত্যের ব্যাপারেও তেমনি ভালো লেখকের চেয়ে খারাপ ও দায়ীত্বহীন লেখকের সংখ্যাই বেশি। এ কথাও ঠিক যে যারা ভালো সাহিত্য পড়ে উপভোগ করে, তাদের চাইতে কু-সাহিত্য অথবা যথেচ্ছ-লিখিত সাহিত্যের পাঠকসংখ্যাই বেশি। খারাপ সাহিত্যও অলংকারবহুল, নীতিবাগীশ হতে পারে, কিংবা ভালো সাহিত্যের মতোই সত্যের সন্ধান করে যা হওয়া উচিত তা ছেড়ে, যা আছে তাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা কখনো সার্থক হয় না। খারাপ সাহিত্য খারাপই, কারণ এর লেখকরা সত্য-অন্বেষণে কখনো বেশি দূর যান না। তাঁদের কাছে যেটা পাওয়া যায়, সেটা হল—যা বিদ্যমান সে সম্পর্কে খাঁটি কথা নয়। যা গতানুগতিক যা ছক-মাফিক তারই ছবি। ফ্লবেয়ারের নায়িকা মাদাম বোভারির বিপদ ঘটল এই কারণে, যে বাজে সাহিত্য পড়ে পড়ে সে ক্রমাগত কল্পনা করেছে—সে যা, তা থেকে সে অন্য জাতের মানুষ। তারই নাম থেকে ফরাসী দার্শনিক জুল দ্য গতিয়ে একটা ভাবার্থবাচক বাক্য সৃষ্টি করেছেন—'বোভারিজম'। তার অর্থ—নিজের সত্তা বা চরিত্র থেকে ভিন্ন এক চরিত্রের অভিনয়, আমি যেন অন্য ব্যক্তি এই রকম একটা ভাণ করার অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কখনো কখনো অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার মিল থাকে; সে ক্ষেত্রে 'বোভারিক' কোণটা হ্রস্ব। অন্যত্র দুয়ের মধ্যে ঘোরতর বৈষম্য থাকতে পারে। এই বোভারিক কোণগুলো ষাট নব্বুই, এমন কি একশ' আশী ডিগ্রীরও হতে পারে। ভালো আর মন্দ সাহিত্যের মধ্যে এই যে পার্থক্য, সেটা ঐ বোভারিক শব্দার্থ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। যে সাহিত্য বাজে, তা পাঠকের সামনে বাঁধা ছকে গতানুগতিক চরিত্র উপস্থাপিত করে, তাকে এমন এক পার্টের অভিনয়ে উৎসাহিত করে যা তার নিজস্ব প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। আর ভালো সাহিত্য বস্তু-সত্য সম্পর্কে সৎ ও আন্তরিক সন্ধানের ফলগুলি পাঠকের সামনে তুলে ধরে। তাতে করে কৃত্রিম জীবনের অভিনয় থেকে পাঠক বেরিয়ে আসতে শেখে। যে মুখোস সে পরে আছে, যা তাকে গ্রাস করেছে,—তার আড়ালে দৃষ্টি চিন্তা ও অনুভূতির যে সব গভীর সত্য রয়েছে—সেগুলো সে নিজেই আবিষ্কার করে।

অনুবাদ : **বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**

কবিতা

উপসংহার

আনন্দ বাগচী

প্রেমের ভনিতা রাখো, হে যুবক, মূর্খ পলাতক,
প্রমিথিউসের মত চূর্ণমুষ্টি কান্না ছোঁড়ো শিল্পের আগুনে
চারদেওয়ালে ফিরে আসে প্রবঞ্চক ছায়ার ঘাতক
নিষাদকলায় দক্ষ, অশরীরী, বিকৃত ফাল্গুনে
শূন্যচারণের নেশা, গ্রহমুখী আকর্ষণ, আর
সমস্ত ভূগোল জুড়ে রাজনীতি-বাণিজ্যের জাল
সোনার মৃগয়া, রুদ্ধ নিঃশ্বাসের মাঝখানে নগর পত্তন
কাষ্ঠ ও প্রস্তরে ঘেরা, লৌহলোষ্ট্রে; রাষ্ট্রের গণিত
একাঙ্কিকা গড়ে তোলে, সর্বঅঙ্গে আত্মার প্রহার,
যুগল সুখের সিঁড়ি বৃথা খোঁজ বন্যঅন্তরাল
হে যুবক, হে যুবতী, প্রেমের ভণিতা রাখো, হাতের কঙ্কন;
দেওয়ালে শিল্পের ছায়া, আত্মরতি লুব্ধ অন্ধকারে মনোনীত
বহ্নিমান চতুর্দিক, অগ্নিজ্বলে খবর-কাগজে
কলঙ্কিত সহবাস গড্ডলিকা কাগজে কলমে
সমস্ত নগরে গ্রামে মুদ্ররাক্ষসের অধিকার॥

হৃদয়ের পাপ

চিত্ত ঘোষ

টেলিফোনে কথা হয়। ম্যাঝে মাঝে দূরভাষী ছবি
পড়ন্ত রোদ্দুরে পোড়ে মুখ। নীরায় এস্‌প্রেসো কফি
ক্কচিৎ কখনো। তারপর নিরাশ্রিত। উলঙ্গ ভিখিরী
প্রমত্ত কি অপ্রমত্ত, চতুর্দিকে ব্যবহৃত সিঁড়ি
কোলাহল, কলরব, ম্যান্ডোলীন, বাঁশী। কী বিরক্ত বুকের নিঃশ্বাস!
অন্ধকারই অন্বেষণ। কেননা সেখানে যার বাস
চিরকাল সে আত্মীয় শুভানুধ্যায়ীর মত
আশ্রয় দিয়েছে যত্নে। বৃক্ষগুলি প্রহরী সতত।
হৃদয়ে আকীর্ণ উক্তি। প্রবৃত্তির নিম্ন মধ্য চাপ
পদ্ধতি প্রয়োগ বিনা অর্থহীন নিভৃত সংলাপ।
কেন কেন? কিবা অর্থ, বারবার কী?
কৈশোর প্রান্তর পটে একঝাঁক উজ্জ্বল জোনাকী।
আমাদের দ্বৈত ছায়া, স্পৃহা, সঙ্গ, দীর্ঘ অধিকার
ঘুরে ঘুরে থামা, চলা, দেখা আর সর্বত্র যাবার
পরিশ্রম আবর্তিত; কখনো দিয়েছ সেই ক্লেদজন্ম সুখ
বিস্মিত কী বিজয়িনী ক্ষণ-কম্প প্রতিচ্ছায়া মুখ
আমি তুমি অন্ধকার দগ্ধ দিবা তাপ
তোমাকে পেরেছি দিতে হৃদয়ের সর্বাধিক পরিণত পাপ।

অনাবিষ্কৃত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এমন অনেক ফুল, নাম জানি, কখনো দেখিনি
অনেক কবির মুখ প্রাচীন আকাশ কিংবা নক্ষত্রের শিবিরে অচেনা,
রক্তে এসে ঘুরে গেছে শব্দের প্রচণ্ড ক্ষোভ, যৌবনের চতুর্দিক গানে ;
এবং ঐতিহ্য এক দক্ষ দাবী আজন্ম প্রবীণ,
আমি কত দ্রুত যাবো সন্ধানী একা একা...
পৃথিবীর এত পাখি, পুষ্পদল, অনায়াস উচ্চতায় গাছের সংসার,
যাদের কখনো আমি জীবনে জানবোনা।

কে যে এই মানবিক স্পন্দনের সব প্রশ্ন একা ছুঁতে পারে!
অথচ মানুষ তবু, বিরক্ত রূপসী লিপ্সা কিছুক্ষণ ভুলে
শতাব্দীর অবিশ্বাস যেন শেষ প্রাচীন চেয়ারে ফেলে একা উঠে এলে
বাতাস, বাতাস এলো, নড়ে উঠল দেয়ালের চতুষ্কোণ দৃশ্যের জড়তা ;
বড় চেনা লাগে ঘর জ্ঞানের প্রচণ্ড দৈন্য যতক্ষণ ঢেকে রাখে ক্লান্ত আলমারি
—যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী কিনা, আজকাল বার্ট্রান্ড রাসেল
নতুন কি ভাবছেন মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ;
পাস্তেরনাক মারা গেলেন, কারা যেন খুব কুয়াসায়
শবাধার কাঁধে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পৃথিবীর শুদ্ধতম বিশ্বাসের দিকে—

কোন কোন বুক থেকে দুঃখ বড় শব্দ করে আর্তনাদ করে।

আমি কি তখনো ঋণী কোন প্রত্ন পুরুষ নারীর
অপ্রয়োজনীয় যৌন আবৃত্তির অপ্রেমের কাছে!
যে আমি সংশয়বিদ্ধ এখনো প্রধান পথ সুস্পষ্ট দেখিনা,
দেখিনা নীড়ের শোভা আরক্ত সিঁথির প্রান্তে সূর্য কার অসম্ভব জ্বালা
ক্রমে নেমে আসে বুকে, কামক্ষেত্রে, অভীক একাকী ধ্বনিরত...
যার অর্থ এই নয় কোনদিন গভীর নিশীথে
আমার জন্মের প্রশ্নে অকস্মাৎ দুটি চোখ জলে ভরে এলে
আকাশের দিকে চেয়ে জননী জননী বলে ডাকিনি, ডাকিনা।
আমার মায়ের মুখে কত দগ্ধ বছরের রৌদ্র লেগে ছিল
আমার পিতার দেহে অন্ধকার কতবার উৎস উদাসীন
সুখে থাকবো, ভাল থাকবো, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর অশ্লীল চীৎকার জানা নেই।

জানা নেই যে পাখিটি এইমাত্র মেঘের ওপারে উড়ে গেল
তার কোন দুঃখ ছিল কিনা। আজো কি জেনেছি কেন
একাকী মাতাল গন্ধে গভীর গভীরতর অরণ্যগহনে
কবিতার কোন স্মৃতি খুঁজতে এসে ভুলে যাই ; তীব্র কতবার
রক্তাক্ত ঝরেছি আমি চিহ্নহীন অক্ষরে লজ্জিত।
এত ফুল পৃথিবীতে ; এত গান কণ্ঠের অচেনা
প্রার্থনার মত ঘোরে জন্ম, মৃত্যু, বসন্তের ব্যগ্র পিপাসায়

যাদের কখনো আমি জীবনে জানবোনা॥

একটি মৃত্যুবার্ষিকী

শামসুর রহমান

হয়নি খুঁজতে বেশি, সেই অতদিনের অভ্যাস
কী ক'রে সহজে ভুলি? এখনো গলির মোড়ে একা
গাছ সাক্ষী অনেকদিনের লঘুগুরু ঘটনার,
আর এই কামারশালায় আগুনের ফুল্‌কি ওড়ে
রাত্রিদিন হাপরের টানে। কে জানতো স্মৃতি এত
অন্তরঙ্গ চিরদিন? জানতাম তুমি নেই, তবু

আঠারোর সাতে কড়া নেড়ে দাঁড়ালাম
দরজার পাশে। মনে হলো, হয়তো আসবে তুমি,
মৃদু হেসে তাকাবে আমার চোখে, মসৃণ কপালে
ছোঁয়াবে আলতো হাত, বলবে 'কী ভাগ্যি আরে
আপনি? আসুন। কী আশ্চর্য! ভেতরে আসুন।' দেখি

অন্ধকারে বন্ধ দরোজায় দু'টি চোখ আজো দেখি
উঠ্‌লো জ্ব'লে। কতদিনকার সেই চেনা মৃদু স্বর
আমার সত্তাকে ছুঁয়ে বাতাসে ছড়ালো
স্মৃতির আতর।

শূন্য ঘরে সোফাটার নিষ্প্রাণ হাতল
কী ক'রে জাগলো এই ক্ষণে? একটি হাতের নড়া
দেখলাম যেন, চা খেলাম যথারীতি
পুরানো সোনালি কাপে, ধরালাম সিগারেট, তবু
সবই ঘটলো যেন অলৌকিক
যুক্তি-অনুসারে।

মেঝের কার্পেটে দেখি পশমের চটি
চুপচাপ, তোমার পায়ের ছাপ খুঁজি
সবখানে, কৌচে শুনি আলস্যের মধুর রাগিণী
নিঃশব্দ সুরের ধ্যানে শিল্পিত তন্দ্রায়।

জানালায় সিল্ক নড়ে, ভাবি, কত সহজেই তারা
তোমাকে কীটের উপজীব্য করেছিলো,
সারাক্ষণ তোমার সান্নিধ্যে পেত যারা
অনন্তের স্বাদ।

বারান্দায় এলাম কী ভেবে অন্যমনে, পারবোনা
বল্‌তে আজ। জানতাম তুমি নেই, তবু

একটি চতুর্দশপদী

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর অস্ত্রগুলি সব থেকে হাস্যকর, ওদের ঘূর্ণনে
স্পর্ধায় গর্জনে দম্ভে হাসি পায় এমন কি শেফালি ফুলের!
অনেকেই অস্ত্র ভালবাসে; নম্র কোকিলের কণ্ঠস্বরে প্রীত
প্রেম, সে-ও চিরকাল ভাবে দৃঢ় হাতে সব কেড়ে নেয়া চলে...
একটি পলাশ মৃদু হাস্য করে বাতাসের গায়ে ভর দিয়ে!
অনেক বয়স হ'ল, মানুষের থেকে বেশি বয়স যাদের
সে সব বৃক্ষেরা জানে, রোদ্দুরের দেহে লক্ষ ঘা দিয়েও তবু
এক বিন্দু রক্ত তাও আজ অবধি কোন ক্রুদ্ধ ঝরাতে পারেনি!

বাহু প্রসারিত রেখে জেগে থাক জ্যোৎস্নায়, দিবসে।
যার পদধ্বনি মৃদু সে এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবে ঘরে।
আস্তে হেঁটো, রূঢ় পদক্ষেপে ক্ষোভে পিষ্ট ক'রে যেওনা শিশির
পাহাড়েও হেরে গেছে বহুবার ওর কাছে, সিক্ত পদতলে।
পৃথিবীর অস্ত্রগুলি সব থেকে হাস্যকর, ওদের ঘূর্ণনে
স্পর্ধায় গর্জনে দম্ভে হাসি পায় এমনকি শেফালি ফুলের!

ফানুসের উপমা

সুধাংশু ঘোষ

শেয়ালটা অকারণ ক্ষিপ্রতায় দৌড়ে পালাল। যেন দৌড়ের কসরত দেখিয়ে মুগ্ধ করার জন্যে ছুটে পালাল। একটু আগেই একটা পেয়ারাগাছের গভীরতর ছায়ার বৃত্তে এদিকেই মুখ তুলে দাঁড়িয়েছিল, আশঙ্কা ছিল না, বিস্ময় ছিল না, যেন আত্মপ্রত্যয়ের একটি নিপুণ মুদ্রা। অথচ কী যে হল, আচমকা এক পাক খেয়ে নিজের ছায়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে পালাল। কোন দুর্নিরীক্ষ্য দূরে যায় নি, কাছেই কোন কাঁটার জঙ্গলে শরীর ঢেকেছে, চোখ তুলে রেখেছে এই দিকে। শেয়াল আর হরিণের প্রায় সব ছবির, সব দৃশ্যের অনুষঙ্গ পলায়ন। কিন্তু শেয়াল সুন্দর নয়, হরিণের মত তীক্ষ্ম সুন্দর নয়, পালাবার সময় হরিণের মত ঢেউ হতে শেখে নি।

আমি কি পালিয়েছিলাম,—হরিণের সঙ্গে নয়, শেয়ালের সঙ্গে আমার তুলনা কি নিখুঁত হবে। ট্রেনের জানলায় বসে বিভাসের মনে হল, শেয়ালটার সঙ্গে তার উপমা কি নিখুঁত হবে।

ট্রেনের দুপাশের উধাও মাঠে ঝাঁঝাঁ দুপুর রাতের ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকার। নিরক্ত মুখের রঙের মত আলোয় সযত্নলালিত পেয়ারা বাগানটার ছায়ার সুডৌল বৃত্তগুলো অনেক পিছনে পড়ে রইল। সামনের স্টেশন নিশ্চয়ই এখনও দূর, নাহলে ট্রেনের গতি এত তীব্র হত না।

শেয়ালটা হয়ত আবার কাঁটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে। দুটো কঠিন ধাতব সমান্তরাল সরলরেখায় চোখ রেখে দাঁড়িয়েছে, নিজের ছায়ার দিকে দৃষ্টি নেই।

কয়েক শ' গজ দূরের উঁচু মাটির রাস্তায় দুটো উট যেন মরে ফোত হয়ে যাওয়ার পরও হাঁটছে। দুটোর পিঠেই বিপুল ভার, তাছাড়াও একটার পিঠে মানুষ একটি, বোধহয় এইমাত্র ট্রেনের গমকে ঘুম ভাঙল। সব মিলে বিভাসের নেহাত পরিচিত নিসর্গ।

সেই রাত্রেও এমন ধূলোরঙ জ্যোৎস্না অথবা তারার আলো ছিল। দীর্ঘ স্ট্রেচ রোড ধরে তারা শঙ্কিত ছায়া ফেলে ফেলে সেই একরত্তি অপরিণত নরম রক্তাক্ত শরীর তেলকাগজ আর কাপড়ে জড়িয়ে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ডাইনে যমুনার দিকে যায় নি, বাঁয়ে গিয়েছিল, গঙ্গায়। তীরের বালি খুঁড়ে সেই একরত্তি রক্তাক্ত শরীর কবর দেওয়ার সময় এমনই ধূলোরঙ জ্যোৎস্না অথবা তারার আলো ছিল। অনেক বালি খুঁড়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে বালি খুঁড়েছিল। তবু তারা গঙ্গার তীর থেকে সরে আসার পর কি কোন গভীরতর অন্ধকারের আড়াল ডিঙিয়ে একদল শেয়াল আসে নি, কিছু নিয়ে কি কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি হয় নি তাদের মধ্যে।

পাঁচটা কাঠি লাগল একটা সিগারেট ধরাতে। বিভাসের খুব হাত কাঁপছিল। অন্তত দুঘণ্টা আগে কোন্ এক স্টেশনে এক কুল্হাড় বিস্বাদ চা মিলেছিল। ভোরের আগে আর হয়ত চা পাওয়া যাবে না। সামনের স্টেশনে হয়ত শুধু সিগারেট পান বিড়ি, মোমফলি, গরম দুধ ক্লান্ত গলায় হেঁকে যাবে, চা মিলবে না।

মাঝের বেঞ্চে একটি বছর দশেকের ছেলে এক মহিলার মেদস্ফীত আধ-শোওয়া শরীরে কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে। সেই একরত্তি নরম শরীরকে পূর্ণ হবার সুযোগ দিলে, বেঁচে বেড়ে

ওঠার অবকাশ দিলে আজ কি ওই ছেলেটার মত এত বড় হত,—না কি সে ছেলেই ছিল না, মেয়ে ছিল।

জ্বলন্ত সিগারেটটা পায়ের কাছে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিল বিভাস। আমার হাত এত কাঁপছে কেন।

কামরাটার এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত অগুনতি যাত্রী কী কূটকৌশলে ঘুমের মহড়ায় মগ্ন! পাশের লোকটি ঘুমের মধ্যে একটু একটু করে পুরো দেহটাকে টানটান করে পাতছে। নোংরা জুতোপরা পা দুটো প্রায় উঠে এসেছে তার কোলের ওপর। বাঁ দিকে মাঝের বেঞ্চে একটি বয়স্ক ভদ্রলোক যেখানে মাথা রেখেছেন ঠিক সেখানে তাঁর কান ছুঁয়ে আর এক বেঞ্চ থেকে একজন তাঁর ড্যাক্রনের ট্রাউজারে ঢাকা একটি পা তুলে দিলেন। বিরক্ত গলায় বয়স্ক ভদ্রলোক আপত্তি জানালেন, 'এটা কী হচ্ছে?'

নিখাদ নির্লিপ্ত জবাব এল, 'ট্রেনে এমন হয়।'

বাইরে পাতলা অন্ধকার। শীর্ণ রুগ্ন নিরক্ত মুখের রঙের মত আলো মেশান অন্ধকার। গভীর নয়। কারও সারা পিঠ ঢাকা একরাশ কাল চুলের সঙ্গে—যেমন, ভাবা যায়, অন্তত পাঁচ বছর আগের ইন্দ্রাণীর চুলের সঙ্গে—এই অন্ধকারের তুলনা চলে না। এখন, এতদিন পরে, এই পানসে অন্ধকারের তেমন বনেদী উপমা হাস্যকর।

যদি একটু ঘুমোতে পারি, যদি জানলায় মাথা রেখে একটু ঘুম আসে, ভোরবেলা চাওয়ালার হাঁকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে চোখে আলো মেখে মনে হবে, এই পানসে অন্ধকার পেয়ারা-গাছের ছায়ার বৃত্ত থেকে দৌড়ে পালান শেয়ালটার নিপুণ উপমা। শেয়ালটার মত পালাবে, কোন দুর্নিরীক্ষ্য দূরে যাবে না, ফাটলে ফাটলে, কূপে কূপে, মাতৃজঠরের অন্ধকার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অন্ধকারে মিশে আত্মগোপন করবে। ক্লান্ত ফতুর হয়ে সূর্য ডুবলে গ্রাস করবে আবার।

ধ্যেৎ! আর একটা সিগারেট ধরাল বিভাস। এবার তিনটে কাঠি লাগল একটা সিগারেট ধরাতে। একটু নড়েচড়ে আরাম পাবার চেষ্টা করল। উত্তর তিরিশের ট্রেন সব কামরার দরজা খুলে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। আর এক পা এগোলেই অবলীলায় উঠতে পারবে। পিছিয়ে থাকবার আশঙ্কা নেই, উপায় নেই। এখন একটু আরাম ছাড়া আর কিছু চাই না। আর কিছু চাই না?

মাঝের বেঞ্চের বছর দশেকের ছেলেটি কাশল কয়েকবার। মেদের ভারে কাহিল মহিলাটি ছেলেটার আড়াল থেকে তাকে তির্যক একটি খোঁচা দিলেন, 'জানলাটা হাট করে খুলে রেখেছে। বল্ না জানলাটা বন্ধ করতে।'

উধাও মাঠ থেকে আসা ঝাঁঝাঁ রাতদুপুরের হাওয়ায় শেষ হেমন্তের হিম। বিভাস দুহাতে দুকোণ চেপে রেখে জানলার কাচের পাল্লাটা নামিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে বদলে গেল তার একান্ত পরিচিত নিসর্গ। কাচটা যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়, অনেক জলের দাগের ঢেউ এবং বড় অপরিচ্ছন্ন। জানলার বাইরে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের পিঠের মত অসমতল মাঠ, সযত্নলালিত ফলের বাগান, ছড়ান ছিটোন জঙ্গল, কাঁটাঝোপ সব গলে গলে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। জানলার ফ্রেমে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করল বিভাস, উথালপাতাল অন্ধকারে ডুবল, কৈশোর যৌবন, দৃশ্য দৃশ্যান্তর সব গলে গলে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে মিশে একাকার হল। ট্রেনের গমকের সঙ্গে মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণী, মিল খুঁজে পেল না।

সেই কালের সিভিল লাইন্সেও বিভাসদের বাড়িটা বেমানান ছিল। সারা শহরে মুঘল স্থাপত্যের যে অজস্র উদ্ধত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, তার বিনীত অনুকৃতি ছিল বাড়িটা। নোনাধরা একতলা বাড়ির ন্যাড়া ছাতে চারটি স্তম্ভের চূড়োয় ছিল এক বিচিত্র গম্বুজ। কেন ছিল তার ব্যাখ্যা মেলে নি। সেই বয়েসে মনে হত অনেক অনেক উঁচু। তার প্রায় আকাশছোঁয়া কোটরে কোটরে এক ঝাঁক অস্থির আবাবীল বাসা বেঁধেছিল। বাড়িটার ভিত নিশ্চয়ই অসাধারণ দৃঢ়, না হলে সব একদিন ধ্বসে পড়ত। তীরের ফলার মত তীক্ষ্ম ডানায় বাতাস কেটে পাখিগুলো এত তীব্র বেগে উড়ত যে মনে হত শূন্যে তাদের গায়ের রঙের রেখা পড়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কোন বয়েস থেকে মনে নেই, তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘ সময় কেটেছে বিভাসের। উঁচু কোটরে পাখিগুলোর বাসায় ফেরা দেখতে দেখতে ঘাড় টনটন করে উঠেছে, চোখে মুখে এসে পড়েছে খড়কুটোর চূর্ণ অংশ।

সিংরা যেদিন সকালে ওপাড়ায় এল তার পরদিনের বিকেলটা মনে পড়ছে। ছোটবেলার কথা, কৈশোরের প্রায় কোন কথাই আমি ভুলতে পারি না কেন। এমন অনেকে আছে যাদের মনের বয়েস এক একটি পর্যায়ে এসে থেমে যায়, আর বাড়ে না। আমি কি তাদের জাতের।

একতলা বাড়ির ন্যাড়া ছাতের শ্যাওলাধরা কার্নিসে একটা কৃষ্ণচূড়ার ডাল লুটোচ্ছিল। ডালটায় একটা হাত রেখে কার্নিসে বসেছিল বিভাস, ঊর্ধ্বমুখ। নিস্তেজ বিষণ্ণ রোদ মাখছিল পাখিগুলোর ডানা, গম্বুজের ফাটলের আগাছার পাতা।

নবাব খানের বাংলোর বাগানে ফলন্ত ডালিম গাছটার তলা থেকে ইন্দ্রাণী চড়া গলায় ডাকল, 'বিভাস।'

ঘাড় নিচু করে চোখ নামিয়ে বিভাস দেখল, অনেক কাঁচা ডালিম ছোট ছোট ঘণ্টার মত হাওয়ায় দুলছে, তার তলায় ইন্দ্রাণীর খুশীখুশী মুখ। বেল্‌স্ অ্যান্ড পমগ্রানেট্‌স্, কার যেন কবিতার বই। শুধু একটু হাসল। জানা ছিল, কিছু বলতে হবে না।

বাগানের ফটক খুলে এবাড়িতে ঢুকে ইন্দ্রাণী দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ছাতে উঠে এল। কার্নিসে বসে তর্জনী সংকেত করে বলল, 'ও বাড়িতে কাল সকালে যারা এসেছে তারা কারা জান?'

'কারা?'

'বাগানের ফটকে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি শুনতে পেলাম। ভদ্রলোকের নাম উদয়প্রতাপ সিং। ফরেস্ট অফিসার, রিটায়ার করেছেন, পেন্সন পান। ওই বাড়িটা কিনেছেন।'

কাল একটু বেলায় দুখানা টাঙা যখন ও বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, এই কার্নিসে বসে দেখছিল বিভাস। জিনিসপত্র খুব বেশি কিছু দেখতে পায় নি। একটি স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ আর একটি ছেলে। ছেলেটির তাদের বয়েস হবে। একটা বন্দুক হাতে করে উদয়-প্রতাপ সিং টাঙা থেকে নেমেছিলেন। মনে হয়েছিল, সেটাই তাঁর সব থেকে প্রিয়।

নবাব খান, সিং আর বিভাসদের বাড়ির ফটক থেকে তিনটি সরলরেখা টানলে একটি ত্রুটিহীন ত্রিভুজ হবে। এখন ভাবলে আমার হাসি পায়, যেন জলো গল্পের প্রাঞ্জল জ্যামিতি। নবাব খানের বাড়িটা বাংলো ধরনের। বিবর্ণ ইটের দেওয়ালের ওপর লাল টালি, সামনে অনেকটা জায়গায় ফুলের ফলের বাগান। সিংদের বাড়ির সামনে বাগান করবার প্রচুর জায়গা, বুনো লতা ঝোপে ভরতি। বিভাসদের বাড়ির সামনে বাগান নেই, রাস্তা ছাড়লেই

দালানে ওঠার সিঁড়ির চওড়া ধাপ। বাগান একটা আছে, বাড়ির পিছনে, সবাইকে দেখাবার মত নয়।

সেদিন বিকেলেই, সিংরা ওপাড়ায় আসার পরদিন, উদয়প্রতাপ সিংয়ের ছেলে বিজয়প্রতাপের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করতে, অল্প সময়ের আলাপে ঘনিষ্ঠ হতে বিজয়প্রতাপের বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না।

গম্বুজের চূড়োয় শেষ রদ্দুরের রঙ দেখছিল বিভাস, ইন্দ্রাণী কৃষ্ণচূড়ার চিকন পাতা নখ দিয়ে কুচিকুচি করে কাটছিল। সিংদের একতলা বাড়ির ছাতে মাউথ অর্গানের বাজনা শুনে দুজনে ফিরে তাকাল। তাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল বিজয়প্রতাপ সিং, অর্গানটা মুখ থেকে নামিয়ে পরিপাটি করে হাসল, সাগ্রহে চিৎকার করল, 'হ্যালো!

তিনজন পরস্পরকে পর্যবেক্ষণ করল একটুক্ষণ। বিজয়প্রতাপই আবার বলল, 'আসতে পারি?' বিভাসের মনে হয়নি হ্যাংলা, ইন্দ্রাণী কী ভেবেছিল জানে না।

বিভাসকে নিচে নেমে বিজয়প্রতাপকে পথ দেখিয়ে ছাতে নিয়ে আসতে হল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দেখল, ঠিক তখনই তার দাদা ওষুধের কারখানা থেকে ফিরছে।

রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় হল। ইন্দ্রাণী রায়, এবারে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছিল, সুবিধে হয় নি, আগামী বছরে হবে। বিভাসকুমার চট্টোপাধ্যায়, আগের বছর সগৌরবে কলেজে ঢুকেছে। বিজয়প্রতাপ সিং, এবারে আর হল না, সামনের বছরে লক্ষ্ণৌয়ে মেডিকেল কলেজে প্রবেশের পরিকল্পনা রয়েছে।

আসন্ন সন্ধ্যায় কার্নিসে বসে ইন্দ্রাণীর মুখে শরীরে নিবদ্ধ বিজয়প্রতাপের এক বিচিত্র দৃষ্টি কয়েকবার নিরীক্ষণ করে সেই প্রথম, এতদিনে সেই প্রথম, বিভাসের চোখে জীবন যৌবনের কী সব দুর্জ্ঞেয় রহস্য যেন উন্মোচিত হল। সেই রহস্যের সংজ্ঞা পেল না, অবয়ব না, শুধু মনে হল অপরিমেয়। সেই প্রথম বুঝলাম, আমাদের বয়েস বাড়ছে। ইন্দ্রাণী নিজের শাড়িতে, ধার করা নয়, সুপ্রতিষ্ঠিত; আমার আর বিজয়প্রতাপের চিবুকে, নাকের ছায়ায় রেশমের রোঁয়া।

রুমাল বিছিয়ে বিজয়প্রতাপ ট্রাউজারের পকেট থেকে মুঠোমুঠো আখরোট কিসমিস স্তূপ করে রাখল। নিয়মিত ব্যবধানে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে সেগুলো কাঠবেড়ালীর মত চিবোতে শুরু করল তিনজন। ইন্দ্রাণীর হাত যে আমাদের থাবার মত হাত থেকে এত আলাদা, আগে জানতাম না। ইন্দ্রাণীর হাতের রঙ যে এমন, আগে জানতাম না। আমাদের লজ্জা ছিল না; ইন্দ্রাণী কাঠবেড়ালীর মত আখরোট কিসমিস চিবোতে চিবোতে এমন লাজুক লাজুক হাসতে পারে, আগে জানতাম না।

তখন কোথাও আর রোদের চিহ্ন ছিল না। কখন যেন কৃষ্ণচূড়ার জালিকাটা চিকন পাতার মধ্য দিয়ে হাওয়ায়-ওড়া বরফের কুচির মত রোঁয়ারোঁয়া অন্ধকার ছাতে এসেছে। ঠিক কখন আসে দেখতে পাই না, তবু যেন ইন্দ্রিয়সংবেদ্য। গম্বুজের কোটরে কোটরে পাখিগুলোর বাসা অন্ধকার, নবাব খানের বাগানে ছোট ছোট ঘণ্টার মত ডালিম হারিয়ে গেছে। অবশ্য কোথাও, অন্য কোথাও, হয়ত রোদ ছিল। দূর দক্ষিণে যমুনা ব্রিজের সাদা শরীরে তখনও হয়ত শেষ রদ্দুরের রঙ ছিল।

আর নয়, ছাত থেকে সিঁড়ি বেয়ে তিনজন নিচে নেমে এল। সৌজন্যে ত্রুটি থাকে কেন। বারান্দা পার হয়ে বিভাস ওদের নিয়ে এল নিজের ছোট ঘরে, বাড়ির মধ্যে সব থেকে ছোট ঘরে। বই বোঝাই শেল্‌ফ্ নয়, বই উপচেপড়া টেবিল নয়, অপরূপ টেবিল ল্যাম্পটা

নয়, বিজয়প্রতাপ দেওয়ালে ঝোলান একটা জিনিসের দিকে তর্জনী তুলে দেখাল, 'তুমি বাজাও?'

সাদা ফুলতোলা নীল কাপড়ে ঢাকা বিরাট সেতারটা ঝুলছিল, কত বছর থেকে ঝুলছে। 'আমার মা বাজাতেন।'

'এখন বাজান না?'

'মা ত নেই। ছ'বছর হল মৃত্যু হয়েছে।'

'আমার মা মরেছেন আমার দু'বছর বয়সে।' বিজয়প্রতাপ সেতারটায় একটা টোকা দিয়ে সাদা ফুলতোলা নীল কাপড়ের ঢাকনা থেকে একটু ধুলো ওড়াল। 'প্রাচীন ভারতের বাজনা।'

'তার মানে?' বিভাস আর ইন্দ্রাণীর চোখ গোলগোল হয়ে এল।

আগের মতই ঠান্ডা গলায় বিজয়প্রতাপ বলল, 'প্রায় প্রাগৈতিহাসিক বাদ্যযন্ত্র।'

'ও, একালের বাদ্যযন্ত্র বুঝি মাউথ অর্গান?' কথায় একটু উত্তাপ মেশাতে চেয়েছিল বিভাস, তেমন জমল না।

'কথাটা মিথ্যে নয়, আমি মাউথ অর্গান বাজাই বলেই কথাটা মিথ্যে না।' একফালি ভূয়োদর্শীর হাসি উপহার দিল বিজয়প্রতাপ। 'তখন ছাতে দাঁড়িয়ে কী বাজাচ্ছিলাম বল ত?'

বিভাস বলতে পারল না, ইন্দ্রাণীও না।

ওদের মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বিজয়প্রতাপ টেনেটেনে বলল, 'দি লং হট্ সামার।'

বিভাস কিছু বুঝতে পারল না, ইন্দ্রাণীও না।

আর ঠিক তখন বিভাসের একটু হিংসে হওয়া বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়েছে ঈর্ষা মহতী। তবু সেই মহতী অনুভব তেমন তীব্র হল না। অথচ বিজয়প্রতাপ ঘরের প্রায় সব কিছু উপেক্ষা করে বারে বারে দুরন্ত পিঙ্গল চোখ রাখছিল ইন্দ্রাণীর মুখে এবং ইন্দ্রাণীর শরীরে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে, ইন্দ্রাণীর মৃদু অস্বস্তি দেখে, সেদিন প্রথম বুঝেছিলাম, কৈশোর আর নেই, থাকবে না। আমাদের বয়েসের তখন এক নতুন ঋতু।

বেরিয়ে সামনের সরু রাস্তাটা পার হয়ে সিংদের বাড়ি যেতে হল। বিজয়প্রতাপের ঘরখানা একটু বড়, বাড়ির বাইরের দিকে, প্রায় রাস্তার পাশে। বিছানায় দু-তিনখানা হিন্দী ইংরেজী সিনেমার পত্রিকা ছড়ান। এসব এমন প্রকাশ্যে পড়া যায়, নাড়াচাড়া করা যায়, জানতাম না।

ভিতরের দিকে গিয়ে বিজয়প্রতাপ চায়ের জন্যে হাঁক দিল। এ কাজটা আমিও করতে পারতাম, আমিও ত চা খাওয়াতে পারতাম। তখন ঠিক মনে হয়নি। কেন যে মনে হয়নি!

ঘরের মধ্যে বেশি কিছু নেই, যা আছে তাও গুছোন হয়নি, এলোমেলো ছড়ান। একটা টেবিল ঘরের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল; সেটাকে এককোণে জানলার পাশে টেনে এনে বিজয়প্রতাপ অন্য কোন ঘর থেকে দুখানা চেয়ার আনল, একখানা চেয়ার সেই ঘরেই ছিল। টেবিলটা যেখানে টেনে আনা হল তার কাছেই মেঝেয় চার-পাঁচখানা বাঁধান ছবি পরপর সাজান ছিল, এখনও দেওয়ালে টাঙান হয়নি। ওপরের উজ্জ্বল রঙের ছবিখানা দেখে উৎসাহিত হল বিভাস। এ ছবি আগে কয়েকবার দেখেছে তার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রেভারেন্ড আয়ারের ঘরে। চড়া মৃদু রঙে আঁকা যীশুর হাতে একটি আলো, পথের পাশে আপেল

ছড়ান, ডান হাত বন্ধ দ্বার-লগ্ন। ছবিখানা বিভাস টেবিলের ওপর নিয়ে এল। চিত্রকলার সমঝদারের মেজাজে বলল, 'জান কার আঁকা?'

বিজয়প্রতাপ বলতে পারল না, ইন্দ্রাণীও না।

'হলম্যান হান্ট। অজস্র প্রতীকের ব্যবহার ছবিখানার বৈশিষ্ট্য। এই বন্ধদ্বার হৃদয়ের প্রতীক।' রেভারেন্ড আয়ারের কথা নিজের মত করে নিয়ে বিভাস একটা চমকপ্রদ বক্তৃতা ফাঁদছিল গাল ফুলিয়ে। কিন্তু বিজয়প্রতাপ এমন একটা ভাব দেখাল যেন বিষয়টি নেহাত অপ্রাসঙ্গিক। আর তখনই চা এল। নামিয়ে রেখে আসতে হল ছবিখানা।

উদয়প্রতাপ সিং একবার কী কারণে যেন এই ঘরে এসে তাদের দেখে বেরিয়ে গেলেন। তিনি ঘরে এলে বিভাস উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর দুজন তেমন কিছু করছে না দেখে বসেই রইল।

চায়ে প্রথম চুমুক দিয়ে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'এই শহরে কোনদিন বাস করিনি, শুধু কয়েকবার বেড়াতে এসেছি। আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। তবে এখন খুব ভাল লাগছে। তোমাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় এত আনন্দ পেলাম, তোমাদের এত ভাল লাগছে!'

দুটো পিঙ্গল চোখ দুঃসহ হওয়ায় বোধহয় ইন্দ্রাণী মুখ নিচু করে চায়ের গরম কাপে ঠোঁট চেপে রইল। এসব কথা এমন করে বলতে হয় বিভাস জানত না। কাউকে খুব ভাল লাগলে এমন স্পষ্ট করে গুছিয়ে বলতে হয়, বলা যায়, জানত না।

চা শেষ করে সবার আগে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। 'এবার যেতে হবে। চলি।' বিজয়প্রতাপের দিকে একবার তাকিয়ে বিভাসের দিকে ফিরল। 'চল বিভাস।'

অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে একটু দাঁড়াল তিনজন। একটি-দুটি হাসি কথার পর বিজয়প্রতাপ ফিরে গেলে, ইন্দ্রাণী ডালিম গাছের তলায় অন্ধকারে ডুবলে, বিভাস নিজের ঘরে এসে আলো না জেলেই বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। কেন যেন ইচ্ছে হল, সকালবেলার আলোয় নবাব খানের বাগানে ডালিমগুলোকে নতুন করে দেখবে। আমি কি কখনও সকালের আলোয় ডালিমগাছটার দিকে তাকাইনি, তাকাতে শিখিনি বিজয়প্রতাপের মত। সকালটা তাড়াতাড়ি আসুক।

দুই

সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় এসে দাঁড়াল তিনজন, তখনও সন্ধ্যে হতে অনেক দেরি। রাস্তার দু'পাশে চওড়া পেভমেন্টে ছড়ানো শুকনো হলুদ পাতা, অজস্র নয়, তবে মাত্র একটি-দুটিও নয়। গাড়ির চাকায় চাকায় প্রচুর ধুলো উড়ছে, একটু পরে নাক জ্বালা করবে। একটা সাইকেলরিক্স মেরামতির দোকানে কয়েকটা তীক্ষ্ণ কর্কশ মিশ্র শব্দ, কানে লাগছে। দোকানটার সামনে থেকে অনেক সরে দাঁড়াল।

একটা মৃত ঘোড়ায় টানা এক্কায় আস্ত তিনটে অ্যামেরিকান সৈন্য প্রচণ্ড উল্লাসে ঢলে ঢলে পড়ছে পরস্পরের গায়। ঘোড়াটা অবশ্যই মরে গেছে, না হলে ক্রমাগত চাবুকের ঘায়ে এমন নির্লিপ্ত থাকা অসম্ভব। একবার এমন একটা ঘোড়ায় টানা এক টাঙায় উঠেছিল বিভাস বাবার সঙ্গে। টাঙার মালিককে জিজ্ঞেস করেছিল, ঘোড়াটা আর কতদিন বাঁচবে? লোকটা বলেছিল, দানাপানি পেলে আরও পাঁচ বছর। তার কথা শুনে স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলেছিল। বুঝেছিল, সেই লোকটা পাঁচ বছরের আগেই মরবে। সেই লোকটা নির্ঘাৎ পাঁচ বছরের আগেই মরেছে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ঘোড়াটা কি শেষ দিন পর্যন্ত দানাপানি পেয়েছিল।

এই শহরে প্রাইভেট মোটরের সংখ্যা নগণ্য। তবে এখন ফাফামাও এয়ার স্ট্রিপ থেকে কার্জন ব্রিজ পার হয়ে, ক্যান্টনমেন্ট থেকে ম্যাক্‌ফার্সন লেক ছুঁয়ে মিলিটারি ট্রাক আর জীপ প্রায় অবিরাম আসছে। সিভিল লাইন্সে সব'সময় বৃটিশ আর অ্যামেরিকান সৈন্যদের ভিড়।

তাদের পাশ দিয়ে একখানা জীপ গেল। পিছনের সিটে দুটো সৈন্যের মাঝখানে বসে সামরিক পোশাক পরা একটি ভারতীয় মেয়ে যেন স্যান্ডউইচের পুর হয়ে হাসছে। বিজয়প্রতাপ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'লাকি ডগ!' কথাটা শোনাল বিলাপের মত।

ইন্দ্রাণীকে নিয়ে এর আগে সদরমহল্লায় এসেছে বিভাস। আজ প্রথম ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে ভাবল, সৈন্যদের থেকে দূরে থাকাই ভাল, বিশেষ করে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে সন্ধ্যের মুখে এখান থেকে দূরে থাকাই ভাল। অথচ, লক্ষ্য করল, বিজয়প্রতাপ উৎসাহে অস্থির।

একঝাঁক গ্যাসবেলুনের সুতো ধরে একটি লোক হাঁটছিল। একটা ট্রাক যেতে যেতে হঠাৎ থামল তার কাছে। ছ'-সাতটি উল্লসিত সৈন্য লাফিয়ে নামল, ঘিরে ধরল তাকে। জ্বলন্ত সিগারেট চেপে চেপে প্রত্যেকটি বেলুন ফাটাল, প্রায় যুদ্ধজয়ের জিগির তুলে আবার লাফিয়ে উঠল ট্রাকে। লোকটি প্রার্থনার ভঙ্গীতে দু'হাত জুড়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল, কেঁদে ওঠার অবকাশ পায়নি। চলন্ত ট্রাক থেকে একখানা নোট উড়ে এল, দশটাকার নোট হবে। আর তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। একজন নোটখানা লুফে নিয়ে পকেটে রেখেছিল, হয়ত একটুক্ষণের জন্যে সরে পড়ার অসম্ভব আশাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। অন্য সবাই ঘিরে ধরল তাকে। যার ক্ষতি হয়েছে, যার প্রাপ্য, নোটখানা তাকেই দিতে হবে। দেখা গেল, কারও নীতিবোধে কমতি নেই।

ক্যাথিড্রাল পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে ছিল, যাওয়া হল না। একটা মোড় ঘুরল তিনজন। সামনেই বড় বড় হরফে লেখা 'রামাজ বার অ্যান্ড রেস্টরান্ট।' সেদিকে একবার তাকিয়েই প্রায় দৌড়ে রাস্তার ওপারে যেতে হল। ভারী কিছু ছুঁড়ে কেউ রেস্টরান্টের ঘষা কাচের দেওয়াল ভাঙল খানিকটা। চার-পাঁচটি খাকি শাড়ি পরা মেয়ে নিয়ে একদল সৈন্য ধস্তাধস্তি করতে করতে বেরিয়ে এল রেস্টরান্ট থেকে। মদ গিলে সবাই বেসামাল। মনে হল, কিছু ইংরেজ, কিছু ইয়াঙ্কী। বাইরে এসে দুটো দল থাবা উঁচিয়ে আক্রমণ করল পরস্পরকে। পেটে লাথি খেয়ে একজন পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার করে উঠল মেয়ে ক'টি। কয়েক মিনিটের মধ্যে নিরাপদ দূরত্বে কয়েক শ' লোকের ভিড় জমে গেল। ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইল তিনজন। খেয়োখেয়ি জমল না, কান সিরসির করা বাঁশি বাজিয়ে মিলিটারি পুলিস এসে গেল।

ইন্দ্রাণী আর বিভাস প্রায় একসঙ্গে বলল, 'ফিরি চল।'

'কেন?' বিজয়প্রতাপ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'সন্ধ্যে হয়ে এল। আলোগুলোয় ত কাল রঙ লেপেছে। এখন ফিরে যাওয়াই ভাল।' বিভাস এখনই ফেরার সঙ্গত কারণ দেখাতে চাইল।

'ভয় করছে?' বিভাসের মুখে চোখ রেখে পরিপাটি করে হাসল বিজয়প্রতাপ।

না, ঠিক ভয় না। আতঙ্ক নয়। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে। বিভাস শুধু বলল, 'ভাল লাগছে না।'

'চল।' একটু করুণার হাসি লেগে রইল বিজয়প্রতাপের ঠোঁটে।

সন্ধ্যে হল, আলো জ্বলল, রাস্তা আলোকিত হল না।

ফেরার পথে একটা গলির মুখে আবার লালমুখ। অন্তত পনেরটি। আট দশখানা সাইকেলরিক্সয় ছড়িয়ে বসে গলিতে ঢুকছে।

বিজয়প্রতাপ ফিসফিস করে বিভাসকে বলল, 'কোথায় সব যাচ্ছে জান?'

বিভাস ঠিক জানে না, হয়ত জানে, পরিচ্ছন্ন ধারণা নেই। কিছু বলল না। নোংরা গলিটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল না। ভাবল, বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে সেই বইখানা, সেই কবিতার বইখানা, যার প্রায় কিছুই বোঝে না, আবার পড়বে। যদি আবার পড়ি, অনেকক্ষণ ধরে পড়ি, তাহলে মনের এই তেতো তেতো স্বাদ হয়ত মরবে।

তিন

সেই যুদ্ধ। বিভাসের মনে আজ শুধু তিক্ত স্মৃতি। বিজয়প্রতাপ তাকে ছেলেমানুষ বলত। সেই ছেলেমানুষ আর নেই, মরে বেঁচেছে। বয়েস বেড়েছে, একটি একটি করে মরেছে ছেলেমানুষি ইচ্ছেগুলো। হয়ত চতুর কুটিল হয়েছে। ঠিক ঠিক বুঝেছে, শুদ্ধতা সুরুচি বেদনাবোধ—এইসব অশ্লীল কথা শুনলে যে-কোন মানুষের কান লজ্জায় লাল হবে, যুক্তিসঙ্গত কারণেই হবে। একেবারে মুক্তপুরুষ হতে পারত, যদি শূন্যতায় মন ভরে যেত। এখানেই মুশকিল। শুধু সেই যুদ্ধের নয়, আরও অনেকগুলো বছরের দিনরাত্রির শীত গ্রীষ্মের স্মৃতির, ভাবনার ভার মনে।

নবাব খানকে দেখেছে, তাঁর বেগমকে দেখেছে, আজন্ম। এতকাল তাঁদের যে ওপরের চেহারা দেখেছে সেটাই যথেষ্ট নোংরা। বস্তুত ওবাড়ির আবহাওয়া তার পক্ষে দুঃসহ ছিল বলেই বাগানটা পার হয়ে বাড়ির মধ্যে খুব কমই গিয়েছে। একটু বড় হবার পর কখনও ঘরে গিয়ে বসেছে মনে পড়ে না। ফলে ইন্দ্রাণীই আসত, তার ঘরে, ছাতে গম্বুজের ছায়ায়।

নবাব খান আর তাঁর বেগমের ছেঁড়া ফুটো আভিজাত্যের নোংরা আস্তরণের তলায় আরও যে এত বিষ সঞ্চিত ছিল, বিজয়প্রতাপ না এলে বোধহয় কোনদিন জানতে পারত না। বিজয়প্রতাপ না এলে সেই বিষ এমন করে উৎসারিত হত না।

বিভাস জানত, ইন্দ্রাণীর বাবা নবাব খানের নাম নবাব খান নয়, কীর্তীশচন্দ্র রায়। সিভিল লাইন্স থেকে অনেকটা দূরে অন্য পাড়ায় এক নবাব খান ছিল, তার এক বেগম ছিল, তাদের একটি মেয়ে ছিল। আফগানিস্থানের রাজপরিবারভুক্ত ছিল তারা। প্রাসাদ-বিপ্লবে রাজত্ব হারিয়ে তারা এদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে মাসোহারা পেত। তাদের সঙ্গে কী করে যেন মিল খুঁজে পেয়ে কীর্তীশ রায়কে পাড়ার লোক নবাব খান বলত, তাঁর স্ত্রীকে বলত বেগম।

বিভাস শুনেছিল, কীর্তীশ রায় আসলে কীর্তিনাশা। রায়দের এই শহরে, শহরতলীতে অনেক বাড়ি জমি ছিল। মিঅরাবাদে রসুলাবাদে বাড়ি ছিল, টেগোর টাউনে জমি ছিল অনেক। কীর্তীশ রায় সব বেচে দিয়ে এখন ফতুর। অথচ নবাবী দম্ভটি আছে। ঢোলা পাজামার ওপর চিকনের সূক্ষ্ম কাজ করা মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী পরেন। সোল্লাসে বেসামাল পান করেন এবং প্রায় অবিরাম পান খাওয়ার ফলে এখন পানের লাল রসে ঠোঁট আর দাঁতের রঙ ঘন কাল। ভদ্রলোকের দুটো চোখ ঘিরে অনেকখানি করে গভীর অন্ধকার।

গায়ের রঙ মাখনের মত। বিভাসের চিরকাল মনে হয়েছে, সোনা রঙ আর কাল রঙের এমন বিচিত্র ঘনিষ্ঠতা আর কোথাও কোনদিন দেখবে না।

বেগমের আসল নাম বিভাস কখনও শোনেনি, শুনবার বাসনাও কখনও হয়নি। তাঁর তেলহীন চুলের চতুর বিন্যাসে, তীক্ষ্ণাগ্র রক্ত রঙ নখে, আচ্ছাদনের স্বল্পতায় আর ঠোঁট গাল ভুরুর রঙের প্রাচুর্যে এমন কিছু ছিল যার ফলে তাঁকে মাতৃস্থানীয়া ভাববার অবকাশ মেলে নি।

সেই বাড়ির মেয়ে ইন্দ্রাণী। বিভাসের বিস্ময়ের অন্ত থাকত না। অবশ্য তখন তার বিস্ময়বোধের বয়েস।

সেই বাড়ির গ্লানিকীর্ণ বাইরের চেহারায়ই বিভাস যথেষ্ট আহত হত, সুতরাং ইদানীং তার আন্তরালের প্রতি কোনই আগ্রহ ছিল না। আর মাত্র ছ'মাসের মধ্যে বিজয়প্রতাপ সেই বাড়ির অন্তঃপুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হল, স্বীকৃত হল সানন্দে। ছুটির দিন দুপুরে এবং অন্য সব দিন বিকেলে তাকে নবাব খানের বাড়ি আনাগোনা করতে দেখেছে। দুপুরে ছাতে গম্বুজের ছায়ায়, বিকেলে রোদ পড়লে খোলা কার্নিসে বসে দেখেছে।

নবাববাড়ির অন্তঃপুর মাড়াত না, কিন্তু সেখানকার হাওয়ার বিষ নিশ্বাসে টেনে নিয়েছিল। আগে আগে কথা বলার কেউ না থাকলে এক-একখানি বই কোলে নিয়ে ছাতে বসে থাকত দীর্ঘ সময়, সিভিল লাইন্সের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে লক্ষ মাইল দূরে কোথায় উধাও হত, রোদ মুছে গিয়ে ছায়া প্রসারিত হত, এক সময় চোখের অস্বস্তিতে বই থেকে মুখ তুলে আশপাশের কিছুই আর চিনতে পারত না একটুক্ষণ। নিশ্বাসে বিষ টেনে নিয়ে সেই ছেলেমানুষটিকে মেরেছিল বিভাস। তখন বারে বারে নবাববাড়ির দিকে, বিশেষ করে নবাববাড়ির বাগানটার দিকে চোখ পড়েছিল। মনে হত, দুর্লক্ষ্য অন্ধকারে বসে কে যেন সুতো টানছে, আর নানা রঙের পুতুলের বিচিত্র নৃত্যভঙ্গিমায় তার বিস্ময়ের অন্ত নেই।

বিজয়প্রতাপ এক-একটা বেলা কাটিয়ে দিত নবাববাড়ির অন্তঃপুরে। অথচ নিশ্চয়ই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কথা বলতে যেত না। ইন্দ্রাণী তো সেই সব সময় বিভাসদের বাড়িতে কাটাত। এতক্ষণ ধরে বিজয়প্রতাপ কার সঙ্গে গল্প করে জানতে চাইলে, ইন্দ্রাণী শুধু বলত, সে কিছু জানে না। এবং এ প্রসঙ্গ তুললেই ইন্দ্রাণীর মুখের রঙ কেমন অবিশ্বাস্যভাবে বদলে যেত। কপাল, নাসাগ্র স্বেদাক্ত হত, এমনকি কী এক কঠোর সংকল্পে চাপা ঠোঁট যেন কাঁপত তিরতির করে।

ইন্দ্রাণীকে নতুন করে দেখতে চেয়েছিল বিভাস। হয়ত দেখেছিল, তবে নিজের মত করেই, বিজয়প্রতাপের চোখে নয়। 'এইখানটা জোরে জোরে পড়ছি শোন,'—'আর এক মাস পরে কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলো লাল হয়ে যাবে,'—'চল না নিচে যাই, সেই রেকর্ডটা বাজাব', অথবা খুব বেশি হলে 'শাড়িটা নতুন বুঝি, তোমাকে মানায়'—এই ধরনের কথাই বলত বিভাস, এতকাল যেমন বলত। আর এসব কথা যখন বলত তখনও হয়ত ভাবত, আকাশে মেঘ যে বারে বারে নতুন নতুন মূর্তি গড়ে ভেঙে ফেলে তার ওপর একখানা বিখ্যাত বই আছে, বইখানা পেলে একবার পড়ে দেখবার চেষ্টা করতে হবে।

বিজয়প্রতাপ তাদের এড়িয়ে চলছিল। ছাতে আসত না, বিভাসদের ছাতে না, সিংদের না। কোন কোন দিন সারা দুপুর নবাববাড়িতে কাটিয়ে বিকেলে যখন মাতালের মত বাগানটা পার হয়ে যেত, একবারের জন্যও ওপরে ছাতের দিকে তাকাত না পর্যন্ত।

বিভাস বরং ব্যস্ত থাকত, তার কলেজ ছিল, ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপের কোন কাজ

ছিল না, তবু ভাবত সিংদের বাড়ি গিয়ে বিজয়প্রতাপের সঙ্গে কথা বলবে, তাদের এড়িয়ে চলার কারণ জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু যেতে পারে নি, একদিনও বিজয়প্রতাপের সামনে যেতে পারে নি। না যেতে পারার কারণ তার কাছে স্পষ্ট ছিল না, তবু তখন সিংদের বাড়ি যেতে মন সায় দেয় নি। শুধু কেন যেন ভেবেছে, এর মধ্যে ক্লিন্ন রহস্য কিছু আছে, যা উন্মোচিত হলে তার মন আরও তেতো হবে।

একটা ছুটির দিন দুপুর একটু গড়িয়ে গেলে নবাব খানের বাংলোর বারান্দায় যে নাটক হল তা দেখে বিভাস ভাবল, তার পিঠে ক্রমাগত চাবুক পড়ছে, তাকে একটা এক্কার সঙ্গে যুতে দেওয়া হয়েছে যার ওপর তিনটে আস্ত অ্যামেরিকান সৈন্য উল্লাসে ঢলে-ঢলে পড়ছে পরস্পরের গায়। আগে বিজয়প্রতাপ, পিছনে নবাব খান আর তাঁর বেগম ঘর থেকে বারান্দায় এলেন। তিনজনকেই মনে হল, হিংস্র জানোয়ার। বিজয়প্রতাপ মাতালের মত কিন্তু দ্রুত পায়ে বাগানটা পার হয়ে ফুসতে ফুসতে চলে গেল। তখন নবাব খান তাঁর বেগমের চুল মুঠো করে ধরলেন, বেগম আক্রোশে হন্যে হয়ে নবাব খানের বুকের কাছ থেকে পাঞ্জাবী টেনে ছিঁড়ে ফালা করে দিলেন। জড়াজড়ি করতে করতে তাঁরা বারান্দা থেকে ঘরে চলে গেলেন। ঘরে ঢোকার সময় দরজার দুটো কপাট দেওয়ালে আছড়ে পড়ার শব্দ হল। পরস্পরের উদ্দেশে যে সব কথা তাঁরা বলছিলেন তার প্রায় সবই অশ্রাব্য।

ইন্দ্রাণী গম্বুজের ছায়া থেকে উঠে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। একটু পরে বিভাস নিচে এসে দেখল, তার ঘরে ইন্দ্রাণী মুখ নামিয়ে বসে আছে। কোন কথা বলল না, তার দিকে তাকাল না। কপাল আর নাসাগ্র স্বেদাক্ত, কী এক কঠোর প্রত্যয়ে চাপা ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে।

সবকিছু বড় জটিল মনে হল বিভাসের। জটিল সন্দেহ নেই, তবে ঠিক দুর্বোধ্য নয়। তার বিস্ময়বোধ তীব্রতার একটা পর্যায়ে উঠে যেন শিথিল হয়ে গেল। চুপচাপ একটুক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে এল পায়ে পায়ে। রাস্তায় নেমে বাঁয়ে নবাব খানের আর ডাইনে সিংদের বাড়ি রেখে সোজা হাঁটতে শুরু করল।

নিজের মাকে বিভাস কখনও সুস্থ দেখে নি। শেষের দিকে তাঁর একটা চাকা-লাগান চেয়ার ছিল। দিনের বেশির ভাগ সময় আর খানিকটা রাত পর্যন্ত সেই চেয়ারে বসে থাকতেন। তারা চেয়ারখানাকে ঠেলে ঠেলে এঘরে-ওঘরে নিয়ে যেত। সুর করে কবিতা পড়ার অভ্যেস ছিল। কম বয়েসে কাকে কবিতা পড়ে শোনাতেন বিভাস আন্দাজ করতে পারে। শেষের দিকে শ্রোতা ছিল বিভাস, মাঝে মাঝে ইন্দ্রাণী। রোগের যন্ত্রণা ছিল, তবু পাতলা ঠোঁটে শুধু হাসতেন। বিভাস তাঁকে কখনও রেগে চিৎকার করতে শোনে নি, কখনও যন্ত্রণায় বিকৃত দেখেনি মুখ। বারান্দায় চাকা-লাগান চেয়ারে বসে সুর করে কবিতা পড়তে পড়তে, ঘড়ির দিকে না তাকিয়েও নির্ভুলভাবে বুঝতে পারতেন ঠিক কখন বিভাসের বাবা ডিসপেনসারী থেকে ফিরবেন। বইখানা তার হাতে দিয়ে বলতেন, 'পরে আবার পড়ব। তোমরা ঘরে যাও। আমি এখানে একটু বসি।'

শেষ কয়েক মাস যখন বুঝলেন, সব রেখে চলে যেতে হবে, পাতলা ঠোঁটে একটু হাসি জড়িয়ে থাকত, কিন্তু দৃষ্টি কী দুঃসহ করুণ হয়েছিল! তাঁর মৃত্যুর পর বিভাসের বাবা, জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বেঁচে রইলেন, বেঁচে আছেন। কিন্তু সব ছাড়লেন, নিজেকে প্রায় নির্বাসন দিলেন বাড়ির পিছনের দিকের একটা ঘরে আর সেই ঘর সংলগ্ন বাগানে। এখন বাইরের কেউ তাঁকে দেখলে বিশ্বাস করবে না ইনি ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। টেনিস

র‍্যাকেট হাতে মেডিকেল কলেজের এক তরুণ ছাত্রের যে ছবি দেওয়ালে টাঙান আছে তার সঙ্গে তাঁকে মেলান অসম্ভব। বলা যায়, এই বয়েসেও একজনের মৃত্যুতে আর একজনের জীবন্মৃত্যু নিতান্ত যুক্তিহীন। কিন্তু এমন কঠোর যুক্তি দিয়ে বিচার করতে বিভাস তখনও শেখেনি। বরং মা'র মুখ মনে এলে, বাবাকে পিছনের নির্জন বাগানে বসে থাকতে দেখলে, স্বর্গের বৈভবে আস্থা না থাকলেও, রেভারেন্ড আয়ারের একটা কথা কানে বাজত, 'বিভাস, ঈশ্বরের, জিসাস ক্রাইস্টের আর এক নাম ভালবাসা!'

আজ বাংলোর বারান্দায় ইন্দ্রাণীর মা-বাবাকে দেখার পর থেকে মনে হচ্ছিল, হাওয়ায় শুধু বিষ।

একটা শুকনো হলুদ ইউক্যালিপ্‌টাসের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে হাতের মুঠোয় ঘষে ঘষে গুঁড়ো করল, নিশ্বাসে গন্ধ টেনে নিল। পাতার কুচি নাকের মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় হাঁচল কয়েকবার।

রাস্তায় বিজয়প্রতাপের সঙ্গে মুখোমুখি। পরিপাটি করে হেসে বিজয়প্রতাপ বলল, 'হাঁ করে দেখছিস কী?'

'কিছু না। গিয়েছিলি কোথায়?'

'বেড়াচ্ছিলাম সদর মহল্লায়। বাড়ি ফিরছি।' একটু থেমে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তখন দেখেছিস কিছু? কিছু শুনেছিস?'

বিভাস চুপ।

'নবাব খান আমাকে অপমান করতে চেয়েছিল। চেয়ার তুলেছিল মারবে বলে। আমার দিকে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আর এগোল না, চেয়ার নামিয়ে রেখে দিল। শুধু অক্ষম গর্জন।'

দুজনেই চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তবে মনে হল, প্রশ্ন না করলেও বিজয়প্রতাপ আরও কথা বলবে। বস্তুত কথা বলার জন্যে সে উৎসুক। তার অভিজ্ঞতার রসরঞ্জিত বিবরণ দেবার জন্যে সে ফানুসের মত ফেঁপে উঠেছে। অথচ, মুশকিল এই, বিভাস উপযুক্ত শ্রোতা নয়।

বিভাস প্রায় নিজের মনে ফিসফিস করে বলল, 'এন্‌জিবিশনিস্ট।'

'কী বললি?'

'কিছু না।'

ক্ষুব্ধ উত্তেজিত দেখাল বিজয়প্রতাপকে। 'আমি কী করব? আমি তো ইন্দ্রাণীর কাছে যেতাম। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে গল্প করব বলে যেতাম। কিন্তু বেগম, দ্যাট হাঙরি উইচ, ফাঁদ পেতে আমাকে আটকাল। যাক্‌, তোকে বলে কী হবে, তুই বুঝবি না, তুই ছেলেমানুষ।'

ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি আনকোরা যুবকের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বিজয়-প্রতাপ আবার বলল, 'তবে এই শেষ নয়। এ শুধু শুরু। নবাব খান একদিন আমার হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদবে।'

বিভাস নিজের মনের প্রত্যন্ত পর্যন্ত খুঁজছিল। ঘৃণা খুঁজছিল, বিজয়প্রতাপের প্রতি ঘৃণা। অথচ এই মুহূর্তে তার ঘৃণার অনুভব তীব্র হল না। আমি ওকে দারুণ ঘৃণা করতে পারছি না কেন, কেন? বিভাসের বিস্ময়বোধ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। অথচ তখন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে, বিজয়প্রতাপের প্রতি তীব্র ঘৃণা খুঁজে না পেয়ে, তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

চার

সেবার বৃষ্টির কয়েকটা মাস বড় বিষণ্ণ কেটেছিল। সবুজ শ্যাওলায় ছেয়ে গিয়েছিল পুরনো ন্যাড়া ছাত। রোদ দেখা যেত না, আকাশ ঢেকে থাকত শেয়ালের গায়ের রঙের মেঘে। গম্বুজের ফাটলে আগাছার পাতাগুলো তেজী আর বড় হয়ে উঠেছিল। বিভাসের তবু একটা আশ্রয় ছিল। তার বই ছিল, অজস্র। এমনকি অ্যালফ্রেড পার্কের কতকালের পুরনো লাইব্রেরীটা থেকে পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভিজেও বই আনত।

ইন্দ্রাণী বাড়ি থেকে প্রায় বেরোত না। বিজয়প্রতাপ সপ্তাহে একবার দুবার মাত্র এসেছে। ওদের সময় কেমন করে কাটত বিভাস জানে না।

বিজয়প্রতাপ মাঝে মাঝে আসত নিজের তাগিদে। তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে আসত, বিভাস উপযুক্ত শ্রোতা নয় জেনেও। কারণ এসব কথা বলার মত আর কেউ ছিল না। কতবার কত কূটকৌশলে বেগম তাকে ডেকেছে আর সে কতবার ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার বিবরণ। ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে ছাতে অথবা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেশ জোর গলায় এসব কথা বলত। ঘরের মধ্যে হলেও বসত না, দাঁড়িয়ে থাকত, পায়চারি করত উত্তেজনায়। চিৎকার করতে ভয় পেত না, জানত এ বাড়িতে শুনবার মত কেউ নেই। বিভাসের কেমিস্ট দাদা সকাল থেকে প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ওষুধের কারখানায় কাটাত, আর তার বাবা সবকিছু থেকে নির্বাসিত ছিলেন, তাঁর ঘরখানাও ছিল একেবারে বাড়ির পিছনে অনেকটা দূরে।

বৃষ্টির কয়েকটা মাস যতবার বিজয়প্রতাপ এসেছে, যাবার সময় তার একটি অনিবার্য প্রশ্ন ছিল, 'তোর এখানে ইন্দ্রাণী আসে না কেন? কোথায় যায়, বাড়ির মধ্যে কী করে?'

'আমার বুকে ইন্দ্রাণীর গতিবিধির নক্‌শা আঁকা নেই।' বিভাস বিরক্তি দেখাতে চাইত।

'আসবে, আসবে, ঠিক আসবে দেখিস।' পরিপাটি করে হাসত বিজয়প্রতাপ। যেন কবে ইন্দ্রাণী আসবে তার নির্ভুল হিসেব রেখেছে আর সেই দিনটির উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় আছে। কিছু একটা ঘটবে যেন সেই দিন, এমন একটা ইঙ্গিত ছিল বিজয়প্রতাপের হাসির রহস্যময়তায়।

ইন্দ্রাণী একেবারেই আসত না ঠিক নয়। খুব কম আসত। সেও যেন এই উপলব্ধিতে প্রায় নিথর হয়ে গিয়েছিল যে তার কৈশোর আর নেই। তার আসা-যাওয়ায়, কথায়, আচরণে সেই স্বচ্ছন্দবিহার আর ছিল না। আগের থেকে তাকে এত আলাদা মনে হত যে বিভাস ভাবত, বাড়ি থেকে খোলস থেকে সে প্রায় বেরোয় না। তখন যদি নিজের খোলস ছিঁড়ে, দ্বিধার পরিশীলিত রুচির জঞ্জাল সরিয়ে, বেরিয়ে আসতে পারতাম, বেরিয়ে এসে ইন্দ্রাণীর সামনে দাঁড়াতে পারতাম!

অথচ বৃষ্টির কয়েকটা মাস কেটে গেলে, পরিচ্ছন্ন আকাশে যখন অনেক দলছুট মেঘ, ইন্দ্রাণীর আসাযাওয়া আবার প্রায় স্বাভাবিক হল। এবং দেখা গেল, বিভাসের ঘরে, ন্যাড়া ছাতে বিজয়প্রতাপ তাদের প্রতিদিনের সঙ্গী। একটু একটু করে সব যেন সয়ে গেল। যেন কোন বিষাক্ত স্মৃতি নেই, সবার মন যেন আশ্বিনের আকাশ।

বিজয়প্রতাপ একদিন বলল, 'চল একটু অ্যালফ্রেড পার্ক থেকে বেড়িয়ে আসি।'

ইন্দ্রাণী বলল, 'না।' তখনও হয়ত একটা চোরকাঁটা ছিল তার মনে।

আবার একদিন বিজয়প্রতাপ প্রস্তাব করল, 'চল একটু বেড়িয়ে আসি। আজ বিকেলটা সুন্দর।'

ইন্দ্রাণী বলল, 'না।'

'তাহলে আমাদের বাড়ি, আমার ঘরে এস। তোমাদের চায়ের নেমন্তন্ন।'

'বেশ তো আছি এখানে, এই ছাতে।'

'এখানে আবার না হয় ফিরে আসব। আমার ওপর তোমাদের এই ঘৃণা অসহ্য। বিভাসকে আমি কান ধরে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু ইন্দ্রাণী, তুমি একবার এস আমার ঘরে!'

বিজয়প্রতাপ কথায় এমন আবেগ মেশাতে পারে কেউ জানত না।

বিভাস ভাবল—হয়ত ইন্দ্রাণীও—এরপরও 'না' বললে মনে হবে আমাদের ব্যক্তিত্ব নেই। মনে হবে, বিজয়প্রতাপ এক নিপুণ শিকারী আর আমরা হরিণশিশু, ভয়ে কাঁপছি।

'চা খেয়ে চলে আসব, শুধু চা।' বলে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বারান্দা, বিভাসের ঘর, দালান পার হয়ে, রাস্তায় নেমে নবাব খানের বাগানের ফটকের সামনে আসতেই ডালিম গাছের ছায়া থেকে বেগম ডাকলেন, 'ইন্দ্রাণী।'

থামল তিনজন।

কয়েক পা এগিয়ে এসে রঙ-করা ভুরু কুঁচকে বেগম বললেন, 'তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না, মিশবে না, ওর সঙ্গে কোথাও যাবে না।' আঙুল তুলে বিজয়প্রতাপকে দেখালেন।

গম্ভীর গলায় ইন্দ্রাণী বলল, 'তুমি ঘরে যাও মা।'

'তুমিও বাড়ি এস। যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরোবে না। আমার অনুমতি না নিয়ে কোথাও যাবে না।'

'কী পাগলের মত আজেবাজে বকছ! ঘরে যাও।'

'যা মুখে আসে তাই বলতে শিখেছ!' বেগম ক্ষিপ্ত হয়ে ইন্দ্রাণীর চুল টেনে ধরতে হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাণী ছিটকে কয়েক পা সরে গেল।

'আমাকে শাসন করতে এসেছেন, লজ্জা হয় না!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

বিভাসের মনে হল, সে আর বিজয়প্রতাপ সার্কাসের দুটি ক্লাউন। এই দৃশ্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে হল। তার কিছু করবার নেই। শুধু অস্বস্তিতে মন ভরে গেল।

তাদের হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে ইন্দ্রাণী সিংদের বাগানে ঢুকল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'এস।'

নিরুপায় অপমানিত বেগম বিকৃত কর্কশ গলায় মেয়েকে শায়েস্তা করার সঙ্কল্প ঘোষণা করে বাড়ির দিকে ফিরলেন।

বিজয়প্রতাপের ঘরে ইন্দ্রাণী একটিও কথা না বললেও অন্তত আধ ঘণ্টা রইল। কিন্তু চায়ের আসর, বলা বাহুল্য, জমল না। ইন্দ্রাণী যতক্ষণ ছিল বিভাসও একটিও কথা বলেনি। বিজয়প্রতাপ একাই হাসল, সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে অনেক কথা বলল, তার বাবার এক রোমাঞ্চকর শিকারকাহিনী শোনাল, তবু আবহাওয়া সহজ হল না।

চা শেষ করে ইন্দ্রাণী যেতে চাইলে বিভাস জানাল, সে আরও একটু বসবে। ইন্দ্রাণীকে তাদের বাগানের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেল বিজয়প্রতাপ। এবং ফিরতে অনেকটা সময় নিল। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার কী কথা হল, কোন কথা হল কিনা, বিভাস জানে না।

বাগানেও তখন আর রোদ নেই, অন্ধকার হতে সামান্য দেরি। বিজয়প্রতাপ সেই ছায়া

ছায়া ঘরে ফিরে এসে বসলে তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মুখ কী এক দুর্জ্ঞেয় সফলতার আনন্দে উদ্ভাসিত দেখাল।

'ইন্দ্রাণী তোকে পছন্দ করে না বুঝতে পারছিস। তবু এমন হ্যাংলামি করিস কেন?' একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করার মেজাজে বলল বিভাস।

বিজয়প্রতাপ এবার শব্দ করে হাসল। 'আমাকে পছন্দ করে না? আমাকে পছন্দ না করে উপায় কী? এই শহরে, নিদেনপক্ষে সিভিল লাইন্সে আমার মত আর ছেলে কোথায়?'

'উন্মাদ আশ্রমে তোর চিকিৎসা হওয়া দরকার।'

'আমার মত উন্মাদদের প্রতিই যে মেয়েদের পক্ষপাতিত্ব! কথাটা মেনে রাখ, আখেরে কাজ দেবে।'

'তোর জিভটা আক্ষরিক অর্থে বড় বেশি লালায়িত। টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।' টেবিলের তলা দিয়ে বিজয়প্রতাপের পায়ে বিভাস একটা লাথি মারল।

প্রায় লাফিয়ে উঠে বিজয়প্রতাপ টেবিল, চেয়ার, বিভাসের চারদিকে ঘুরল কয়েকবার, যেন খুন করবে। আবার মুখোমুখি চেয়ারে বসল, হাসিতে বিকশিত হল দু'সারি সুবিন্যস্ত দাঁত। 'আমাকে ইন্দ্রাণী পছন্দ করে না তোর বিশ্বাস। তোর বিশ্বাস তোর নিজস্ব। কিন্তু আমি যে ইন্দ্রাণীকে পছন্দ করি এটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবার বিষয়।'

বিভাস এক মিনিট চুপ করে থেকে বলল, 'তোর পছন্দ করার অধিকার তোর নিজস্ব। কিন্তু তোর পছন্দের প্রদর্শনীটা বেহায়ার মত। আজ যা ঘটল তার ফলে ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে কী অশান্তি হবে জানিস, ওকে কী যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে!'

'এমন একটু-আধটু অশান্তি হওয়া ভাল। তোদের মত কচিকাচাদের বয়েস বাড়ে, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ পায়।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ ইন্দ্রাণী তার মা-বাবাকে আরও ভাল করে চিনবে। কোন্ মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে বুঝবে। একটি ব্যক্তি হিসেবে তার অস্তিত্ব, তার পরিবেশ, তার নিজের কাছে স্পষ্ট হবে। তা ছাড়া আজ যা ঘটল তার জন্যে আমি দায়ী নই, তবে এমন একটা দিনের জন্যে, এমন একটা কিছু ঘটবার জন্যে আমি এতগুলো মাস অপেক্ষা করছিলাম।'

'একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।'

'বেগম আমার প্রতি ক্ষোভে আর ইন্দ্রাণীর ওপর হিংসেয় জ্বলছেন। আজ তাঁর জ্বালা অনেক বাড়ল। আমি আয়ত্তের বাইরে, সুতরাং ইন্দ্রাণীকে শায়েস্তা করতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। শাস্তি যত কঠোর হবে, ইন্দ্রাণীর বিদ্রোহ তত বেপরোয়া হবে। মা এবং মেয়ের সম্পর্ক তীব্র রেষারেষি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আদল নেবে।'

বিভাস বলার মত কোন কথা খুঁজে পেল না।

'চোখ দুটো লাড্ডুর মত করে আনছিস কেন? কেমন করে তোকে বোঝাই যে মেয়েদের কোন বয়েস নেই, অন্তত বেগমের মত মেয়েদের নেই। আর তুই বোধহয় ভুলে যাচ্ছিস যে ইন্দ্রাণী বেগমেরই কন্যা।'

হয়ত কিছু বলা যায়, তর্ক করা যায়, হয়ত বিজয়প্রতাপকে খুন করা যায়, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরা যায়, নখাগ্রে বিদ্ধ করা যায় হাসিতে উজ্জ্বল চোখ। কিন্তু কী হবে। বিভাস শুধু বসে রইল সাদা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে, আর কিছু করল না। কোনদিনই চরম কিছু দর্শনীয় কিছু করেনি।

মনে পড়ল, রঘুরঞ্জন মালব্য—যাকে সবাই মালবিয়াজী বলে ডাকে—একদিন এক আলোচনা বৈঠকে বলেছিলেন, এই এতটুকু শহরেই পরতে পরতে মানুষের সম্পর্কের কী কুৎসিত নোংরা জটিল জাল ছড়ান। চোখ খোলা রাখলে দেখতে পাবে।

আমি কি দেখতে শিখেছি। আমি কি এখনও ছেলেমানুষ, নাকি আমার যৌবনও চলে গিয়ে বার্ধক্য এসেছে।

জওলাপ্রসাদের বাড়ির মধ্যে রোজ রোজ একঝাঁক সৈন্য আসে কেন, পণ্ডিত ঝা-র পনের বছরের মেয়েটা রাতারাতি কোথায় উধাও হল, পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে উপাধ্যায়জী কী বিপদে পড়েছেন যে তার বাবার কাছ থেকে দশটা টাকা পেয়ে অমন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাগচীবাড়ির একটি বিয়ের বয়সী মেয়ে তিন সপ্তাহের অসুখে মারা গেলে তার আত্মীয়স্বজনরা দুদিন মাত্র কেঁদে শান্ত স্বাভাবিক হয়ে গেল কেন, কেন মনে হল—তাদের চোখে মুখে এক বিচিত্র স্বস্তির মুক্তির আভাস।

অবশ্য যদি কিছু করবার না থাকে, যদি তর্কের জন্যে জিভ ঠোঁট নেচে না ওঠে, যদি প্রতিবাদে হাত উদ্যত না হয়, তবে এই ন্যাকা-ন্যাকা ভাবনার সুতো ছেড়ে কী হবে।

ঘরে আলো জ্বলতে বিভাস উঠল।

পাঁচ

ক্রিসমাসের আগে ক্যারল প্র্যাকটিস হচ্ছিল রেভারেণ্ড আয়ারের ঘরে। কীডগঞ্জে রেভারেণ্ড আয়ারের বাড়ি। তাঁর বাড়ির বারান্দায় বেশ বড় একটি ক্যারল পার্টি অনেকক্ষণ ধরে গান করল। প্র্যাকটিস যখন শেষ হল, বাইরে এসে একে একে বিদায় নিল সবাই, ওরা তিনজন এসে দাঁড়াল চৌরাস্তায়, তখন রাত প্রায় আটটা। বিভাসের মনে হল কনকনে শীত। সবার শীতের পোশাক ছিল, তবু সেই শীতের রাত্রে বিজয়প্রতাপ অ্যালফ্রেড পার্কে যাবার প্রস্তাব করলে বিভাসের ভাল লাগে নি। অথচ ইন্দ্রাণী তেমন আপত্তি করল না।

বিভাস বলল, 'আমি বাড়ি ফিরব। তোমরা বেড়িয়ে আসতে পার।'

'চালাকি রাখ।' বিভাসের কব্জি চেপে ধরে বিজয়প্রতাপ একটা টাঙাওয়ালাকে ডাকল।

টাঙায় বসে আধমরা ঘোড়াটার খুরের শব্দের সঙ্গে তাল রেখে বিজয়প্রতাপ শিস দিল সারা রাস্তা। বিভাস ভাবছিল, আমি না এলে ইন্দ্রাণী কি আসত না, সোজা ফিরে যেত সিভিল লাইন্সে?

পার্ক থেকে অনেকটা দূরেই টাঙা ছেড়ে দিল। এত শব্দ করে পার্কে ঢোকা যাবে না। এত রাত্রে অ্যালফ্রেড পার্কে ঢোকা হয়ত আইনসঙ্গত নয়। তেমনই একটা কিছু শুনেছিল।

পার্কের মধ্যে গ্রীণহাউসে এসে একটা বেঞ্চে বসল তিনজন, মাঝখানে ইন্দ্রাণী। আশেপাশে কোথাও আর কেউ আছে মনে হয় না। ছায়া ছায়া অন্ধকার, মাঝে মাঝে ওপর থেকে কুয়াশার গায় চুইয়ে-পড়া কৃপণ আলো।

ক্যানিং রোডের সি-এ-বি স্কুল সৈন্যরা দখল করায় পার্কের মধ্যে অস্থায়ী ঘর বেঁধে ক্লাস চলছে। সেই ঘরগুলো আর পুরনো লাইব্রেরীটার চার্চের মত বাড়ি ডুবে গেছে অন্ধকারে। রাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তিটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বেয়াল্লিশ সালের আন্দোলনের সময় কারা যেন মূর্তিটার নাক ভেঙে দিয়েছিল। ঠিক কোথায় যে ছিল মূর্তিটা এই

অন্ধকারে গ্রীণহাউসে বসে বুঝতে পারা কঠিন। পঞ্চম জর্জেরও একটা মূর্তি ছিল, এখন নেই।

কোথাও একটা বকুলগাছ আছে নাকি, অথবা হয়ত ইন্দ্রাণীর চুলের গন্ধ। কারও মুখ কারও হাত স্পষ্ট দেখা যায় না, শুধু ঢেউয়ের মত মুখের হাতের প্রান্তরেখার ডৌল। কেমন যেন ষড়যন্ত্র করার মত মনে হয়, তবু বিভাস ভাবল, বেশ তো—এখানে এসে ভালই করেছি, না এলে কিছু যেন হারাতাম।

ইন্দ্রাণী হঠাৎ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক কথা নিয়ে এল : 'এবারে আশা করছি পাশ করব। কিন্তু লজ্জা করে, আমার থেকে কম বয়েসের মেয়েরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।'

বিজয়প্রতাপ পায়ের ওপর পা তুলে বলল, 'লজ্জার কী আছে, কী এমন বয়েস হয়েছে? আর যারা সুন্দর তাদের আবার বয়েস আছে নাকি!'

বিভাসের মনে হল, বেহায়ার মত কথা বলে বিজয়প্রতাপ। কেউ যদি সত্যি সুন্দর হয়, সে কথা কি এমন করে সামনাসামনি কখনও বলা যায়! তা ছাড়া এই এক কথা আজকাল ও বারেবারে বলছে।

বিজয়প্রতাপ আবার বলল, 'আমাকেও বোধহয় বিভাসদের কলেজে ভর্তি হতে হবে। লক্ষ্ণৌ-এর মেডিকেল কলেজের আশা ছাড়তে হবে। বাবার অসুখ।'

গা সিরসির করা হাওয়া। ইন্দ্রাণী শুধু একটা স্কার্ফ জড়িয়েছে, পায়ে স্লিপার। বিজয়প্রতাপ টাই বেঁধেছে, আমার টাই না থাকলেও কোটটা খুব গরম, পায়ে পশমের মোজার ওপর জুতো। ইন্দ্রাণীর শীতের পোশাক এই কনকনে রাতের পক্ষে যথেষ্ট কিনা সন্দেহ হয়। অবশ্য মেয়েদের নাকি শীত কম। আর ইন্দ্রাণী যেন সত্যি খুশী। যেন বাড়িতে দুঃসহ নোংরামি নেই, কয়েক মাস পরেই পরীক্ষার দুশ্চিন্তা নেই। যেন অতীত নেই, কোথাও কিছু রেখে আসে নি, কোথাও কখনও ফিরে যেতে হবে না, যেন এই আবছায়া অন্ধকারে অনন্তকাল বিচিত্রগন্ধী চুলের সুদীর্ঘ বেণীটা এক-একবার অকারণে অস্থির হাতে পিঠের ওপর ছুড়ে দেবে, আবার মাথা ঝেঁকে নিয়ে আসবে বুকের মাঝখানে। তবু, শীতে কাঁপুনি না ধরলেও, ইন্দ্রাণী কি উত্তাপ চায় না, আমরা কি আর একটু ঘন হয়ে বসতে পারি না।

গ্রীণহাউসের মধ্যে বসে আকাশ দেখা যায় না। পত্রহীন লতার জটিল জালের আস্তরণ। সিমেন্ট-করা মেঝেয় জুতো ঠুকে বিজয়প্রতাপ মৃদু শব্দ তুলছে।

ইন্দ্রাণী বলল, 'দিনের বেলায় এখানে কতবার এসেছি। কখনও এমন মনে হয়নি।'

কতকাল থেকে, সেই একেবারে ছোটবেলা থেকে ইন্দ্রাণীকে প্রায় প্রতিদিন দেখছে বিভাস। বাগানে, তার ছোটঘরে, তাদের ন্যাড়া ছাতে অথবা বাইরে রাস্তায় ইন্দ্রাণীর ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি কোনদিন কোন বিশেষ ভাবনা, বিশেষ অনুভব আনে নি। আজ এই শীতের হাওয়ায়, কুয়াশা আর কৃপণ আলো-মেশান অন্ধকারে মনে হল, ইন্দ্রাণী যেন অনেক দূর, প্রায় দুর্লক্ষ্য। তবু ভাল লাগছে। নিষেধ না মেনে এখানে এখন এই অন্ধকারে পাশাপাশি বসে থাকায়, মুহূর্তজীবী কথা আর হাসি থেকে সুখ কুড়িয়ে নেওয়ায় কেমন এক বেপরোয়া দায়িত্ববোধহীন অস্থির বয়েসের স্বাদ আছে।

এতক্ষণ কথা বলতে, হাসতে কেউ উচ্চকণ্ঠ হয়নি। যেন গোপনে ফিসফিস করছিল। এখন হঠাৎ ইন্দ্রাণী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হচ্ছে? হাত সরিয়ে নাও।' গলায় যথেষ্ট বিরক্তি আর প্রতিবাদের সুর, অথচ ঠোঁটে হাসি লেপ্টে ছিল বললে মিথ্যে বলা হয় না।

বিভাস মুখ ফিরিয়ে দেখল, বিজয়প্রতাপ একটা হাত ইন্দ্রাণীর পিঠে তুলে দিয়ে কঠিন আঙুলে কাঁধে চাপ দিচ্ছে। বিজয়প্রতাপকে ডান হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ইন্দ্রাণী প্রায় বিভাসের গায়ের ওপর এসে বসল। বিজয়প্রতাপ উঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণীর দু'হাত ধরে টেনে তুলল, নিজের দিকে সামান্য একটু টেনে নিয়েই ছেড়ে দিল আবার। চোখে সয়ে-যাওয়া পাতলা অন্ধকারে সোচ্চার হাসির রহস্যময়তায় বিজয়প্রতাপের সুবিন্যস্ত দাঁতের সারি, চোখ, সারা মুখ কেমন আশ্চর্য মনে হল। হয়ত সুন্দরও মনে হল। বলিষ্ঠ, সুন্দর। এবং হয়ত সেই কারণে বিভাস কোন প্রতিবাদের কথা খুঁজে পেল না। আর, কী আশ্চর্য, মনে হল তারও ঠোঁটে এক বিচিত্র মৃদু হাসি জড়িয়ে আছে।

'চল, ফিরে যাই।' ইন্দ্রাণী হাঁটতে শুরু করল।

পার্কের বাইরে এসে টাঙা পাওয়া গেল না। খানিক দূর এগিয়ে সাইকেলরিক্স মিলল দু'খানা। বিজয়প্রতাপ একখানা রিক্সর পাশে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ইন্দ্রাণী তার দিকে একবার তাকিয়ে বিভাসের রিক্সয় উঠে বসল।

আর এতক্ষণে এবং এই প্রথম রিক্স চলতে শুরু করলে বিভাসের মনে সেই অস্থির বয়েস যেন স্পষ্ট অবয়ব পেল। শরীর, শরীর, শরীরের স্বাদ। তার সঙ্গে এক রিক্সয় চেপে বসা ইন্দ্রাণীর শরীর দুঃসহ, দুঃসহ মনে হল। পায়ে পা ঘষল, আকাশে কুয়াশায় আলোয় অন্ধকারে চোখ রাখল, চোখ ফিরিয়ে নিল। ইচ্ছে হল, ইন্দ্রাণীর কাঁধে একটা হাত তুলে দেয়। কিন্তু দিল না।

সারা রাস্তা চোখে মুখে কুয়াশা মেখে সেই রাত্রের একান্ত ইচ্ছেগুলোকে গলা টিপে টিপে মারল বিভাস।

ছয়

গতি মন্থর হতে হতে ট্রেনটা এক সময় থেমে গেল। কোন স্টেশন নয়, মাঝপথে থেমেছে। বোধহয় অন্য কোন ট্রেন পথ জুড়ে রয়েছে। রাত দুটো বেজে গেছে বহুক্ষণ। সামনের স্টেশন হাজারিবাগ রোড হবার কথা। সেখানে পেঁছলে হয়ত চা মিলতে পারে, অবশ্য ঠিক করে কিছু বলা যায় না।

ট্রেনটা থামতে কামরার কেউ কেউ নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। সামনের বেঞ্চের বছর দশেকের ছেলেটা চমকে উঠে বসে দু'হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ঘষে ঘষে আবার কাত হল।

জানলাটা ওপরে ঠেলে তুলে বিভাস মুখ বাড়িয়ে দেখল, ট্রেনের পাশে ঘাসের জঙ্গলে বুনো লতার ঝোপে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁকাচোরা আলোর রেখা, দীর্ঘ, প্রসারিত। জানলা দিয়ে এলেও নিখুঁত চৌকো আলো কোথাও চোখে পড়ে না। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, আর পোকা। মুখ ভিতরে টেনে এনে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিল।

পোকাগুলো উড়ে এসে, লাফিয়ে এসে আলোকিত জানলার কাচে ঘা খেয়ে খেয়ে পড়ছে। নাম জানা-না-জানা অজস্র পোকা। দেখে দেখে এক ইংরেজ কবির একটা প্রিয় উপমা মনে এল। সেই এক উপমা অনেকবার দেখেছে তাঁর কবিতায়, যখন কবিতা পড়ার অভ্যেস ছিল। ভাবতে হাসি পায়, একসময় কবিতা ভালবাসতাম। তাঁর সেই কবিতাগুলো নিশ্চয়ই কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা নয়, অথচ উপমাটি কিশোরোচিত, নিখাদ

ছেলেমানুষি। এমন পাখিদের উপমা যাদের ডানা শক্তিমান, যারা বিলাসী, যারা ঋতুতে ঋতুতে দেশ-মহাদেশ উড়ে পার হয়ে যায়। দূরদেশগামী এমন এক ঝাঁক পাখি সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে অন্ধকারে উড়ছে একটা বাতিঘর লক্ষ্য করে। কাছে এল, অবশেষে তাদের ক্লান্ত ডানা ভাঙল বাতিঘরের আলোকিত কঠিন কাচের দেওয়ালে ঘা খেয়ে। ডানা ভেঙে পড়তেই অব্যর্থ ছোবল মারল সমুদ্রের ঢেউ। বুঝতে হবে—তাদের এক রুগ্ন অধ্যাপক মিথ্যেই ঠোঁটে হাসি টেনে রাখবার চেষ্টা করে বলতেন—এখানে পাখিগুলো কবির নায়িকার হৃদয়ের উপমা। বলা বাহুল্য—বিভাস মনে মনে হাসল, একটিমাত্র কাঠি দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল—কবির বিষাদান্তিক প্রেমের কাহিনীর নায়িকার হৃদয় তীব্র আঘাতে বিক্ষত। মনে রাখতে হবে হৃদয়, হৃৎপিণ্ড নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় হৃৎপিণ্ড আর হৃৎপিণ্ড থাকে না, হৃদয় হয়ে যায়।

নিজের প্রাক্তন কৈশোরকে খুঁচিয়ে একচোট হাসতে পেরে খুব যেন খুশী হল বিভাস। ইতিমধ্যে ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করেছে।

ইন্দ্রাণী কি তেমন কোন কাহিনীর নায়িকা ছিল। তার কি হৃদয় ছিল। ওই দেশান্তরী পাখিরা কেন তার হৃদয়ের নিপুণ উপমা হল না। তার ত তখন মনে মনে উড়ে যাবার বয়েস ছিল। তবু কেন কাছের একটা বাধা ডিঙিয়ে ওই পাখিদের মত উড়তে পারল না। না হয় তার হৃদয় ওই পাখিদের ডানার মত বিক্ষত হত, রক্তাক্ত হত! এত কাছের বাধায় ঘা খেল কেন।

জানলার কাঠে মাথা রাখল। একটু ঝিম ধরল ট্রেনের দুলুনিতে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তির্যক হাসি মিলিয়ে গিয়ে আধবোজা চোখ করুণ বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

তখন সবে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে বিভাস। ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপ তার কলেজেই পড়ছিল একটু নিচুতে। বিজয়প্রতাপের লক্ষ্ণৌ যাওয়া হয়নি, ডাক্তার হওয়া হল না। উদয়প্রতাপ সিংয়ের অসুখ দিন দিন বাড়ছিল।

বিজয়প্রতাপ তাকে সগর্বে জানিয়েছিল, তার সঙ্গে ইন্দ্রাণী একবার রামাজ রেস্টরান্টে গিয়েছিল, আর একদিন ম্যাক্‌ফার্সন লেকে। শুনে বিস্ময়বোধ করেছিল বিভাস। বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'তোর সঙ্গে একা যেতে রাজী হল? আমার কথা কিছু বলল না?'

বিজয়প্রতাপ শুধু বলেছিল, 'তুই এখনও ছেলেমানুষ, বিভাস।'

তারপর একদিন সন্ধ্যায় দীর্ঘ পথ হাঁটার পর সেই চূড়ান্ত, অতিনাটকীয় দৃশ্যের সরস বিবরণ দিয়েছিল বিজয়প্রতাপ। বিবরণ না দিয়ে তার উপায় ছিল না, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝাঁজ অন্য কারও মনে সঞ্চারিত না করে নিজের অস্থিরতা থেকে অব্যাহতি পেত না। সে যে সাধারণ ছিল না, একই বয়েসের আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে তার যে মৌল অমিল ছিল—এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা না করে সে কেমন করে স্বস্তি পাবে।

সেই সন্ধ্যায় যমুনা ব্রিজের ধার থেকে হাঁটতে শুরু করেছিল দুজন। নদীর তীর ছুঁয়ে হাঁটছিল পূব দিকে। অনেকক্ষণ হেঁটে ক্লান্তিতে পা ভারী মনে হলে একটা সাইকেল রিক্সয় উঠে পড়েছিল। বাকী পথটা পার হয়ে রিক্স ছেড়ে দিয়ে পাড় থেকে নেমে এসেছিল নরম মাটিতে। সাবধানে পা চেপে-চেপে প্রায় ফোর্টের কাছে এসে, ডাঙায় টেনে-তোলা একখানা ভাঙা পরিত্যক্ত নৌকোয় উঠে বসেছিল দুজন।

তখন বাঁয়ে গঙ্গা আর সামনে যমুনার স্রোত অন্ধকারে অবসিত। তখনই বিভাসের

কাঁধে হাত রেখে বিজয়প্রতাপ শুরু করেছিল আর এক উত্তীর্ণসন্ধ্যার চূড়ান্ত অতিনাটকীয় দৃশ্যের বর্ণনা।

সেই সন্ধ্যেটা বিভাস বাড়ি ছিল না। মালবিয়াজীর আলোচনা বৈঠকে গিয়ে জমেছিল। ইন্দ্রাণী ডালিমগাছের গভীরতর ছায়াটা পার হয়ে আসতেই বিজয়প্রতাপ তাকে ডাকল। সিংদের বাগান বারান্দার পাশ দিয়ে বিজয়প্রতাপের ঘরে এসে বসল দুজন। বিজয়প্রতাপের চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী শুধু একবার জানতে চেয়েছিল, বিভাস কোথায়। বিভাস বাড়ি নেই শুনে আর একবার বিজয়প্রতাপের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল টেবিলের ওপর ছড়ান পত্রিকার ছবিতে।

একটু পরে চা এল, এক রাশ আখরোট কিসমিস এল। চা দিয়ে লোকটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয়প্রতাপ দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তীক্ষ্ন প্রশ্ন করল ইন্দ্রাণী, 'দরজা বন্ধ করলে কেন?' কথা বলতে একটু যেন গলা কাঁপল।

'এমনিতেই আমার ঘরে কেউ আসবে না। তবু পুরোপুরি নিরাপদ হলাম।'

'কী পাগলের মত কথা বলছ! দরজা খুলে রাখ।'

'এমন পাগলামি স্বাভাবিক।'

'কেন?'

'কারণ, নির্জনতা আমার ভাল লাগে।'

'কিন্তু আমার ভাল লাগে না।'

'সত্যি কথা বলছ না, অথবা তুমি নিজেকে বুঝতে পার না। তোমাকে আজ অনেক কথা বলব। এর মধ্যে কেউ এসে পড়ুক আমি চাই না। তাই দরজা বন্ধ করেছি।'

একই প্লেট থেকে আখরোট কিসমিস তুলে নিতে গিয়ে ইন্দ্রাণীর হাতের চারটে আঙুল শক্ত মুঠোয় ধরে বিজয়প্রতাপ আবার বলল, 'ইন্দ্রাণী, আমার ভাল লাগা বড় যন্ত্রণা দেয়! তোমাকে অসহ্য ভাল লাগে। এ এমন ভাল লাগা যা গোপন করা যায় না, শুধু মনে মনে লালন করা যায় না।'

চারটি নরম আঙুল এক ঝাঁকানিতে ছাড়িয়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। হাতের ঝাঁকানিতে কয়েকটা আখরোট কিসমিস ছিটকে ছড়িয়ে গেল মেঝেয়।

চোখ দিয়ে যেন ইন্দ্রাণীর চোখ বিদ্ধ করে বিজয়প্রতাপ চেয়ার থেকে উঠল। টেবিলটা ঘুরে এসে ইন্দ্রাণীর দুটো হাতই ধরে টানল নিজের দিকে। হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হতে হাঁপিয়ে উঠল ইন্দ্রাণী, কব্জিতে একটু লাগল, পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দেওয়ালে পিঠ দিয়ে। হয়ত চাপা গলায় বলল, 'না!' কথা স্পষ্ট হল না।

বিজয়প্রতাপের কপাল নাসাগ্র স্বেদাক্ত, ধারাল দৃষ্টি আশ্চর্য করুণ, ঈষৎ স্ফীত ঠোঁট একটু একটু কাঁপছে ভেবে নেওয়া যায়। বোধহয় প্রার্থনার মত করে কিছু বলেছিল, হয়ত আবার বলেছিল—'এই অসহ্য ভাল লাগা আমি লুকোতে পারি না'—কথা স্পষ্ট হয় নি।

তারপরই সেই অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য—এমনকি এক অর্থে হাস্যকর এবং বীভৎস—অতিনাটকীয় দৃশ্যটি ইন্দ্রাণীকে দেখিয়েছিল বিজয়প্রতাপ।

টেবিলের ওপর কাচের গ্লাস ছিল। একটা গ্লাস বিজয়প্রতাপ মেঝেয় আছড়ে ভাঙল। জলে-ভেজা একটা কাচের টুকরো তুলে নিল হাতে। সেই ধারাল টুকরোটা দিয়ে নিজের বাঁ হাতের কব্জি থেকে কনুইয়ের ভাঁজ পর্যন্ত চামড়ার একটা পরত কেটে কেটে হিংস্র

ক্ষিপ্রতায় অনেকগুলো বাঁকা আর সরল দাগ টানল ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে রেখে। হাতের তালু বেয়ে রক্তের কয়েকটা চিকন ছড় নেমে আঙুলের ডগা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় মেঝেয় পড়ল।

হন্যে হয়ে এত সব করতে বিজয়প্রতাপ খুব সামান্যই সময় নিয়েছিল। সেই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু আতঙ্কিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে দেওয়ালের গায়ে নিজেকে চেপে মারবার চেষ্টা করছিল ইন্দ্রাণী। কিন্তু যখন বিজয়প্রতাপ কাচের ধারাল টুকরোটা ঘরের এককোণে ছুড়ে ফেলল, রক্তের চিকন ছড় হাতের তালু আর আঙুল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরল, শব্দহীন কান্নার ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়ল ইন্দ্রাণী, চোখ নামিয়ে আনল মেঝেয়।

আর ঠিক তখনই, ঠিক সেই মুহূর্তে, বিজয়প্রতাপের প্রসারিত বলিষ্ঠ বাহু সানন্দে গ্রহণ করেছিল ইন্দ্রাণীর পাখির মত শরীর। পাখির মত, পাখির সঙ্গে কি ইন্দ্রাণীর তুলনা চলে? অন্তত নিপুণ উপমা হয় না।

শাড়িতে, জামায় এবং মুখেও রক্তের দাগ লেগেছিল। সেই রাত্রিতে বিজয়প্রতাপের অন্ধকার ঘর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে, স্বল্পালোকিত বারান্দা পার হয়ে, নবাব খানের বাগানের গভীর অন্ধকারে চোরের মত ডুব দিয়েছিল ইন্দ্রাণী। ঘর থেকে বেরোবার আগে আঁচল দিয়ে মুখ মুছেছিল, শাড়িতে নতুন ভাঁজ দিয়ে রক্তের দাগ ঢেকেছিল। সবার চোখ এড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় উপুড় হয়ে ছিল অনেক রাত পর্যন্ত।

বিভাসের কাঁধ জোরে নেড়ে দিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তুই যেন কাঁপছিস! কাঁপছিস নাকি?'

বিভাস চুপ।

হাওয়ায় ভিজে মাটির গন্ধ। আকাশে যেন একটিও আলোর বিন্দু নেই। অন্ধকার, অন্ধকার। আকবর বাদশা'র দুর্গের পাথুরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে যেন আদিম পৃথিবীর অন্ধকার পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছিল। ক্রমেই আরও ছোট হয়ে আসছিল চারপাশের সঙ্কীর্ণ স্বচ্ছতার বৃত্ত।

বিভাসের কাঁধ জোরে নেড়ে দিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তুই আমাকে কী ভাবিস? পশু ভাবিস আমাকে?'

বিভাস তখনও চুপ।

'আমার আচরণ বীভৎস মনে হচ্ছে? এমন নৃশংসতা ভাবতে পারিস না?'

বিভাস কথা বলল না।

'বড় বেশি নাটুকে মনে হচ্ছে আমাকে? লুকিয়ে হাসছিস না তো?'

বিভাস বলল, 'ওঠ, এখন ফিরতে হবে।'

'বস না একটু। কী এমন করেছি আমি! চোখে দিগন্ত-দৃষ্টি, মনে জ্বলুনি নিয়ে প্রতীক্ষা আমার পোষায় না বলে চামড়ার পাতলা পরতে কয়েকটা আঁচড় কেটেছিলাম। ছড়ে যাওয়ার মত অস্পষ্ট দাগ আছে, কিছুদিন পরে একেবারে মিলিয়ে যাবে। এই নিয়ে তুই এত বাহানা করছিস কেন? কথা বলতে যেন তোর জিভের মান যাচ্ছে।'

বিভাস উঠে দাঁড়াল। 'চল, ফিরে যাই। কেমন শীত শীত করছে।'

সাত

দেওয়ালের সঙ্গে চেপে রাখা একখানা বনেদী অথচ নড়বড়ে চেয়ারে বসেছিলেন ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। একদিন যে ডাক্তার ছিলেন, তাঁর যে প্রচুর পসার ছিল, এখন বিশ্বাস করা কঠিন। প্রায় বৃদ্ধ, শীর্ণ দীর্ঘ তামাটে শরীর। খাকি ট্রাউজারটা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে এসেছেন, একটা আধময়লা শার্ট ঝুলছে, গেঞ্জীটা আরও ময়লা, মুখে দাড়ি, কানের পাশে ঘাড়ে আগাছার মত চুল। হাতে কার একখানা চিঠি নিয়ে সামনের আমরুল গাছের একটা ডালে চোখ রেখেছেন, অথচ দৃষ্টি অবশ্যই সেখানে নেই। বিভাস কয়েকবার আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে ফিরে তাকালেন। এবং, যা প্রায় অভাবনীয়, বিভাসকে ডাকলেন।

বিভাস অনিশ্চিত পা ফেলে কাছে এসে দাঁড়াল। তার বাবার ডাক শুনবার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বস্তুত তিনি আজকাল বিতোষ বিভাস কারও সঙ্গেই বিশেষ কথা বলেন না। শুধু বছরে দু'একবার বেশ সাজগোজ করে গীর্জার কোন উৎসব থেকে ফিরে দুই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান। মুখে দাড়ির খোঁচা লাগে। মনে হয়, অবাঞ্ছনীয় অভিজ্ঞতা। আজ এখন, অন্য সব দিনের মত, বাগানের দিকে মুখ করে বসে-ছিলেন। হাতে কার একখানা চিঠি।

এমন বিচিত্র বাগান আর কোথাও দেখেনি বিভাস। সবার চোখের সামনে নয়, বাড়ির পিছনে এবং উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা—সেটাই সান্ত্বনা। দক্ষিণে গোলাপের আর উত্তর প্রান্তে অনেকটা জমিতে ভুট্টার চাষ। গোলাপ আর ভুট্টা—সুন্দর মিল! গোলাপের ঝাড়ের কাছে কিছু রজনীগন্ধা। আমরুল গাছের গোড়ায় লাউকির মাচা। দক্ষিণ-পূব কোণে একটা পেঁপে গাছ আর উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্তে একটি বাবলা। বারান্দা থেকে নামলেই বাগানের খানিকটা জমি সিমেণ্ট করা। সিমেণ্ট করা চত্বরে একসারিতে তিনটে চৌবাচ্চায় নানারঙের মাছ। চৌবাচ্চায় শ্যাওলার চিকন পাতার ফাঁক দিয়ে জলের মৃদু স্রোত বয়ে যাওয়া দেখলে বোঝা যায়, কোথাও কিছু কিশোরোচিত কূটকৌশল আছে। কিন্তু বিভাস কখনও, এমন কি কৈশোরেও, এসবে হাত দেয় নি। এসবই তার বাবার কীর্তি।

প্রায় সারাদিন দেওয়ালের সঙ্গে চেপে রাখা চেয়ারটায় বসে আছেন। মাথার কাছে পেরেকে একটা শোলার টুপি ঝুলছে। রোদের সময় বাগানে কাজ করতে হলে মাথায় দিতে হয়। টুপির ওপরের খাকি কাপড়ে নিজের হাতে উজ্জ্বল রূপোলী রঙ মাখিয়েছেন।

বিভাসকে বললেন, 'একটা চেয়ার নিয়ে আয়।'

নিজের ঘর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে এসে বিভাস বসল।

হাতের চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখ।'

এই চিঠি যিনি লিখেছেন তাঁর আঙুল কাঁপে। তবে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে লিখেছেন। ওপরে যেখানে তারিখ আর কলকাতার একটা ঠিকানা লেখা, সেখানে পাঁচ আনার ডাকটিকিট আলতো করে লাগান। রীতিমত কৌতূহল নিয়ে বিভাস মনে মনে পড়ল :

প্রিয় জিতেন্দ্র,

জানি আমার এই পত্র পাইয়া তুমি অত্যন্ত বিস্মিত হইবে এবং প্রথমে হয়ত আমাকে চিনিতে পারিবে না। আমার নাম বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, আমার দাদার নাম হীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। আমার ডাক নাম বীরু, আমার দাদার ডাক নাম হীরু। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তালতলায় তোমাদের আর

আমাদের বাড়ি খুব কাছাকাছি ছিল। তোমরা কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবার পর দীর্ঘকাল তোমাদের সহিত আর তেমন যোগাযোগ নাই। অবশ্য তুমি দুই তিনবার কলিকাতায় আসিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তবে তাহাও বহু বৎসর পূর্বের কথা।

আমি কিছুদিন হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবী হইতেও বিদায় লইবার সময় আসিল। আজ আমার সমগ্র জীবনের সঞ্চয় পরিমাপ করিতে গিয়া দেখিতেছি, আমি যাহা ভাবিতাম তাহা সত্য নয়। আমি সানন্দে ভাবিতাম, জ্ঞাতসারে কোন পাপ করি নাই। এখন দেখিতেছি, আমার পাপের সঞ্চয়ও কিছু নগণ্য নয়। তাই যীশুর কাছে যাইবার পূর্বে পাপের ভার হইতে যতটা সম্ভব মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি।

তোমার হয়ত মনে নাই, কিন্তু আমার মনে পড়িতেছে, সেই শৈশবে তোমার নিকট হইতে একখানি বই লইয়াছিলাম। নানা জিনিস নাড়াচাড়া করিতে করিতে সেই বইখানি এতকাল পরে আবার আমার হাতে আসিয়াছে। দেখিলাম, তাহার অবস্থা বড় মলিন। বইখানির দাম ছিল পাঁচ আনা। তোমরা কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে বলিয়াই হয়ত বইখানি ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, এই পত্রের সহিত পাঁচ আনার ডাকটিকিট পাঠাইলাম। তুমি অনুগ্রহপূর্বক তাহা গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিও।

কাহার মুখে যেন তোমার পত্নীবিয়োগের সংবাদ শুনিয়াছিলাম। সমবেদনা জানাইয়া একখানি পত্র দিয়াছিলাম, পাইয়া থাকিবে। আশা করি যীশুর কৃপায় তুমি কুশলে আছ এবং তোমার সন্তানেরা তোমার সুখের কারণ হইয়াছে।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করিও। ইতি—

তোমার বীরেন্দ্র।

কয়েক মিনিট মুখে কথা এল না বিভাসের। এই চিঠি যিনি লিখেছেন, বাবার শৈশবের বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, তাঁকে কোনদিন দেখে নি। তবু তাঁর মুখের আদল যেন চেনা, যেন দেখতে পেল, তাঁর বয়েসের ভারে ক্লান্ত চোখ বিষণ্ণ হাসিতে উদ্ভাসিত।

বিভাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার বাবা বুঝলেন চিঠি পড়া শেষ। সাগ্রহে বললেন, 'পড়া হয়েছে তো? কী মনে হল, চিঠিখানা পড়ে?'

সত্যি বলতে কি, চিঠি পড়ে বিভাস মুগ্ধ। কেমন লাগল, কেমন ক'রে বোঝাবে। বলল, 'ছোটবেলায় তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বুঝি! এমন সরল সৎ লোক আজকাল আছেন বিশ্বাস করা কঠিন।'

'আমার যে একটা সন্দেহ হচ্ছে।' তার বাবা একবার কাশলেন।

'সন্দেহ, কিসের সন্দেহ?'

'জীবনের বাকী ক'টা বছর আমার এখানে এসে থাকবার মতলব করেছে হয়ত।'

বিভাস সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল : 'না না, চিঠিতে তেমন কোন ইঙ্গিত নেই।'

বিভাসের মন তেতো হয়ে গেল। চারপাশের সবকিছু বড় নোংরা। তার মধ্যে এই চিঠিখানায় যেন অন্য এক সরল গ্লানিহীন জীবনের একটু স্বাদ ছিল। তার বাবার স্বার্থগন্ধী আশঙ্কার কথায় সেই স্বাদ একেবারে তেতো হয়ে গেল। একজন এতকাল পরে শৈশবের প্রিয় বন্ধুকে এক চিঠি লিখেছেন, আর বন্ধুটি মিথ্যে সন্দেহের ভাবনায় মগ্ন। এবং যিনি এই চিঠি লিখেছেন তাঁর মনও কি সত্যিই সরল উদার। এত বছর পরে পাঁচ আনার ডাকটিকিট ফেরত পাঠানর মধ্যে মনের প্রসারতার লক্ষণ কোথায়। কোন্ স্বার্থে বন্ধুর এই সামান্য ঋণ পরিশোধের তাগিদ পেলেন। বস্তুত এ এক ধরনের সঙ্কীর্ণতা। স্বর্গের বৈভবে আস্থা রাখেন, সেখানকার ছাড়পত্র অবশ্যই চাই, তাই এতকাল পরে যে-বই হাতে পেয়ে শুধু একজনের মুখ, একজনের কথা সানন্দে স্মরণ করা স্বাভাবিক, সেই বইয়ের

দাম পাঠিয়ে দিয়ে অনুল্লেখ্য ঋণ থেকে মুক্ত হতে এত উৎসাহী।

বাইরের দিনরজনীর রঙ বদলের পালা চলছিল তখন। ইন্দ্রাণী আর এবাড়িতে আসে না। বাইরে কোথাও দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে সরে যায়, থামে না, কথা বলে না। বিভাস সহজ হতে চেয়েছে, ইন্দ্রাণী সহজ হবে না। গম্বুজের আবাবীল পাখির ঝাঁক মিথ্যেই উড়ে উড়ে তীরের ফলার মত ডানার কসরত দেখায়, বিভাসের ঘনপক্ষ্ম চোখ বিস্ময়ে কাঁপে না। আসলে এই সব কারণে, বাইরে কোথাও নোঙর ফেলার মাটি না পেয়ে, বিভাস বাড়ির মধ্যে এখানে ওখানে, বাগানে বারান্দায়, মা'র বন্ধ ঘরের জানলায়, নিজের ছোট ঘরে, কী যেন খুঁজছিল। এখন মনে হল, কিছু নেই, কোথাও কিছু নেই। এই পুরনো একতলা বাড়িটার ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি, কুলুঙ্গি, দেওয়ালের ফাটলে শুধু ছিবড়ের মত শুকনো অন্ধকার।

একটা বয়েস ছিল যখন কোন গায়ক রীডের দিকে মোটেই না তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে হারমনিঅম বাজিয়ে গান করতে পারলেই তাকে ওস্তাদ শিল্পী মনে হত। আজ তার বাবার সঙ্গে একটু কথা বলে, তাঁর বন্ধুর লেখা চিঠি পড়ে, বুঝল, সেই বয়েসটা আর নেই।

পাশে একটা টিপয় ছিল। তার ওপর দু'কাপ চা রেখে বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণি টিপয়টা একটু এগিয়ে দিলেন। এতক্ষণ বিতোষের ঘর থেকে মাঝে মাঝে তাঁর মৃদু কথা ভেসে আসছিল। তাঁর সঙ্গে নাকি বিতোষের বিয়ে হবে। কবে হবে বিভাস জানে না। তবে অনেকদিন থেকে নানাভাবে কথাটা কানে আসছিল।

ইতিমধ্যে বিকেলের আলো আরও কমে গিয়ে বাগানে আমরুল গাছের ছায়াটা দীর্ঘতর হল। তার বাবা যেন পুত্রবধূর তৈরি চা সস্নেহে হাতে তুলে নিলেন।

সেবার তিনমাসের জেল হয়েছিল বিভাসের। উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় মাত্র তিনমাসের জেল হয়েছিল। এর ফলে কিছুই ওলটপালট হয়ে যায় নি, শুধু পড়াশুনোর ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর।

তখন যুদ্ধ শেষ। শহরে সৈন্যদের আনাগোনা কমেছে, তবে একেবারে বন্ধ হয় নি। শিবির গুটোতে সময় লাগছিল।

বোম্বাইয়ের সমুদ্র উপকূলে কী সব ঘটে যাবার পরই এই শহরে একটা ট্রাক আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিল বিভাসরা।

মালবিয়াজীর বৈঠকে এই ধরনের কাজে উৎসাহ দেওয়া হত না। তবু তাঁর বৈঠকে গিয়ে একটু বেশি গরম কথা বলত এমন একদল ছেলে বিভাসকে গোপনে ডাকল। সেই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হল বিভাস, যা আগে তার পক্ষে প্রায় অভাবনীয় ছিল।

একদিন সন্ধ্যের একটু পরে সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় সুবিধে পেয়ে একখানা ট্রাক ঘিরে ফেলল তারা। ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল না সেই ট্রাকে। ড্রাইভারকে নামিয়ে প্রথমেই তার সিটটা ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কেটে পেট্রল ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর ট্রাকটার আরও নানা অঙ্গে পেট্রল ছড়িয়ে আগুন লাগাল। দূরে গিয়ে ইট, পাথরের টুকরো ছুড়ে হেডলাইট, গ্লাসস্ক্রীন ভাঙল। আরও নানাবিধ রণনৈতিক কূটকৌশল দেখিয়ে পালাল সেখান থেকে।

পরদিন পুলিস এল, জেল হল, প্রমাণাভাবে মাত্র তিনমাস।

মার্লবিয়াজী অবশ্যই বিরক্ত হয়েছিলেন। অথচ যেদিন খালাস পেল বিভাস, তিনিই সবার আগে এসে হাত ধরলেন।

রাত জেগে পড়ছিল বিভাস। সেটা তার পরীক্ষার বছর। তার ছোট ঘরে টেবিল ল্যাম্পটার উজ্জ্বল আলোয় খোলা বইয়ের পাতায় একটা পোকা লাফিয়ে এসে বসল। বই থেকে মুখ তুলে একটু এদিক-ওদিক তাকাল বিভাস। দেওয়ালে নানা বিচিত্র ছায়া পড়েছে, যা খুশী মানে করা যায়। যদিও রাত এমন কিছু গভীর হয় নি, এ বাড়ির এবং কাছাকাছি অন্য কোন বাড়ির কেউ আর জেগে নেই। শুনেছে, কলকাতা নাকি সারা রাত জেগে থাকে। এ শহর তেমন না, প্রতিদিন একটু রাত হলেই তার একবার করে মৃত্যু হবে।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, বাইরে চাপ-চাপ অন্ধকার। ডালিম আর কৃষ্ণচূড়ার চিকন পাতার ফাঁক দিয়ে অন্ধকারের আঁশগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে আসছে। হায়রে কী সব অতিকাব্যিক ভাবনা! নিজেকে মনে মনে একটা চিমটি কাটল। ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করার জন্যে চেয়ারটা ঠেলে উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে এল শব্দটা। বেড়াল। দুটো বেড়ালের কলহের তীক্ষ্ম কর্কশ ধ্বনি একবার উঠেই থেমে গেল। টেবিলের ওপর রাখা বাঁ হাতে দেহের ঊর্ধ্বাংশের ভার দিয়ে, বেঁকে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিভাস। কিন্তু বাইরে থেকে আর কোন শব্দ এল না। অনেকক্ষণ সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার বসতে হল, বেড়াল দুটোর ঝগড়া বোধহয় মিটে গেছে।

ডান দিকের ঘরে বিতোষের আর পিছনের একটা ঘরে তার বাবার কোন সাড়া নেই। বাবার কথা ভাবলেই কী এক রহস্যজনক কারণে এই শহরের পরিত্যক্ত গভর্নমেণ্ট হাউসটার জংলা চেহারা তার মনে স্পষ্ট হয়। গভর্নমেণ্ট হাউসের ক্যানিং রোডের দিকের আগাছা আর বুনো লতায় ছাওয়া নিচু পাচিলের পাশের একটা দেড় শতকের পুরনো ইঁদারা পরিচ্ছন্ন অথচ আদুড় গায়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়, কঙ্কালের মত। তখন আর যেন ঘন সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ থাকে না, ইটের বিন্যাস দেখা যায়। ছোট পাতলা ইট, বিস্কুটের মত। ঠিক বিস্কুটের মত নয়, বিস্কুটের উপমা নিখুঁত হয় না। ওদিকে কখনও চোখ গেলে —যদিও না যাবার সম্ভাবনাই বেশি—এই শহরের ইংরেজিনবিসরা বলবে, 'বিস্কিট ব্রিক্‌স্‌।' আসলে, কথাটা মুখরোচক না হলেও, ইটগুলো ঠিক তাসের প্যাকেটের মত।

আবার হঠাৎ বাইরে থেকে এল সেই শব্দটা। দুটোর মধ্যে একটা নিশ্চয়ই তাদেরই বেড়াল। একটানে দরজা খুলে বিভাস ছুটে বেরিয়ে গেল। তার এমন হয়, বেড়ালের ঝগড়ার তীক্ষ্ম কর্কশ ধ্বনি শুনলে এমন হন্যে হয়ে ছুটতে হয়। খুব ছোটবেলা থেকে তার এই এক আশ্চর্য স্বভাব।

বারান্দা পার হয়ে লাফিয়ে রাস্তায় নামল। আন্দাজে নিজেদের মনে করে ক্ষিপ্র হাতে জাপটে ধরল সাদা বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বেড়ালকে। ধরে রাখতে পারল না। হাত আঁচড়ে দিয়ে দুটো বেড়ালই ছুটে পালাল সিংদের বাগানে, অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

খানিকটা এগিয়ে ফিরল বিভাস। হাত জ্বলছে, উত্তেজনায় লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আকাশে অজস্র তারা, কেউ কোথাও নেই, সিভিল লাইন্স আজ রাত্রের মত মরে গেছে। এখনই দুটো বেড়ালের কলহের তীব্র তীক্ষ্ম কর্কশ ধ্বনি কুচিকুচি করে অন্ধকারের প্রসারিত শরীর কাটছিল, বিশ্বাস করা মুশকিল।

বাড়ির দিকে আর এক পা এগিয়ে মনে হল, বিজয়প্রতাপের ঘরে কেউ কথা বলছে।

দাঁড়িয়ে শুনল। বিজয়প্রতাপ আর ইন্দ্রাণীর গলা। খুব মৃদুকণ্ঠ, কিছু বোঝা যায় না। এই এখন এত রাত্রে ওই ঘরে ইন্দ্রাণী কেমন করে যেতে পারে, কেমন করে যেতে পারে!

তখনই, ঠিক তখনই, অনেকগুলো মাস আগেকার কয়েকটা কথা যেন কানে এল— 'তুই যেন কাঁপছিস! কাঁপছিস নাকি?' কার যেন থাবার মত হাত তার কাঁধ জোরে নেড়ে দিল। কে যেন কানের সঙ্গে ঠোঁট চেপে ধরে এতগুলো মাস পরে ওই কথা আবার বলল।

আট

সেদিনও তখন এমন কিছু বেশি রাত হয় নি। তবু মনে হল, কাছাকাছি বাড়িগুলোর সবাই নিথর মরানদীতে ডুব দিয়েছে। তখন বাইরে শীতের হাওয়া। সামনের জানলাটা বন্ধ করে বিভাস টেবিল ল্যাম্পের আলোয় খোলা বই রেখে বসেছিল। বইয়ের পাতায় চোখ ছিল এবং মনও অনেকখানিই ছিল বইয়ের পাতায়। ছোটবেলা থেকে বই সামনে নিয়ে বসার অভ্যেস যথেষ্ট ছিল, সেই কারণে নানাবিধ ভাবনা জমে জমে ভারী হলেও মন আর চোখকে এক পথে নিয়ে যেতে বিশেষ কসরত করতে হত না।

বন্ধ জানলার ওপাশ থেকে কেউ চাপা গলায় ডাকল। বই থেকে মুখ তুলল বিভাস। সঙ্গে সঙ্গে জানলায় দুটো টোকা পড়ল। বিজয়প্রতাপের গলা শোনা গেল: 'বিভাস, আবে মারহুম!' উত্তেজিত, অস্থির অথচ অনুচ্চ কণ্ঠ।

চাদরটা জড়িয়ে বিভাস বেরিয়ে এল। অন্ধকার বারান্দায় জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে চুইয়ে আসা আলোয় সযত্নে গায়ে শাল জড়িয়ে বিজয়প্রতাপ দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ভাল করে দেখা না গেলেও মনে হল, মুখ গম্ভীর, দাঁড়ানর ভঙ্গি অস্বাভাবিক। তাছাড়া বিজয়প্রতাপকে শাল গায়ে দিতে দেখার সৌভাগ্য এর আগে বিশেষ হয় নি। বিভাস কাছে আসতে বলল, 'তোকে আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'একবার গঙ্গার ধারে যেতে হবে।' বিজয়প্রতাপের গলা কেমন অচেনা মনে হল।

কিছু বুঝতে না পেরে বিভাস বলল, 'এত রাত্তিরে গঙ্গার ধারে কেন?'

'একটু আয় না আমার সঙ্গে। যেতে যেতে বলছি।'

জানলার একটা পাল্লা খুলে ভিতরে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল বিভাস। বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে এল বিজয়প্রতাপের সঙ্গে। স্ট্রেচি রোডে এসে পড়তেই রাস্তার কাল অ্যাসফল্‌টে দুজনের দুটো অস্পষ্ট ছায়া প্রসারিত হল। উত্তর দিকে হাঁটতে হাঁটতে সব বলল বিজয়প্রতাপ। এমন সব বীভৎস কথা অবলীলায় বলল যা সহজে গ্রহণ করার মত কলজের জোর বিভাসের ছিল না। দুঃখ, যন্ত্রণা, ঘৃণা কোনটাই হয়ত না, তবু কী দুঃসহ অনুভব প্রচণ্ড ঘা দিল। শাল দিয়ে বিজয়প্রতাপ শুধু নিজেকেই জড়ায় নি, সযত্নে ঢেকেছে তার আর ইন্দ্রাণীর সেই দুরন্ত ঋতুর অযাচিত বীজাঙ্কুরের বিচ্ছিন্ন রক্তাক্ত সংক্ষিপ্ত শরীর।

বিজয়প্রতাপের মুখটা ভাল করে দেখতে ইচ্ছে হল বিভাসের। ভাল করে দেখা যায় না এই অন্ধকারে, অথবা ঠিক দেখাতে চায় না। মিথ্যেই কয়েকবার একটু একটু জ্বালা-করা চোখ রাখল বিজয়প্রতাপের মুখের আদলে। কাছে কোথাও একটা কুকুর আচমকা ডেকে উঠল। বিভাসের ছায়াটা একটা ঢেউ হয়ে ভেঙে গিয়েই আবার স্বাভাবিক অবয়ব পেয়ে

প্রসারিত হল।

রাজাপুর কবরখানার পাশ ঘেঁষে এসে বাঁ দিকে মিন্টো রোডে বাঁক নিয়ে বিভাস বলল, 'ইন্দ্রাণী কোথায়?'

'ওদের বাড়িতে।'

'কেমন আছে?'

'কেমন আবার থাকবে! ভালই আছে।'

বিভাসের মুখে আর কোন প্রশ্ন এল না। ভাবল, আরও প্রশ্ন মনে ভিড় করে আসাটা হয়ত বাড়াবাড়ি। যা ঘটেছে তা অসহ্য মনে হওয়া হয়ত বোকামি, হয়ত ছেলেমানুষি। চুপ করে রইল।

বিজয়প্রতাপ নিজে থেকেই আবার বলল, 'ডাক্তারটা আমাকে ফতুর করেছে। ঘড়ি বেচেছি, আংটি বেচেছি, বাবার ঘর থেকে চুরি করেছি, তবু নাকি তার পাওনা মেটে নি, পরে আরও দিতে হবে। নবাব খান অল্প কিছুও ধার দিতে রাজী হল না। হয়ত দিত, বেগম দিতে দিল না। একবার ভেবেছিলাম, অন্য ডাক্তারের কাছে না গিয়ে তোর বাবার কাছে যাব, চেষ্টা করব অবস্থাটা বোঝাতে। শেষ পর্যন্ত যেতে পারলাম না।'

বাইরের দিনরজনীর রঙ বদলে যাওয়ায় বিভাস অন্য কোথাও অন্য কিছু খুঁজতে গিয়ে বাবাকে নতুন করে দেখেছে। তাঁর একটা মিথ্যে আশঙ্কার কথা শুনে মনে হয়েছে, জীবন থেকে নির্বাসিত তাঁর ধুলোমাখা ছাইমাখা অনীহার অন্তরালে একটা সত্যির দরজা খুলে গেল। সেই সত্যি তখন কঠোর মনে হয়েছিল, এখন চোখে সয়ে গেছে। অথচ আজ ভাবল, ইন্দ্রাণী বিজয়প্রতাপ বেগম নবাব খান সবাই জাহান্নমে যাক, তবু তার বাবার কাছে যেন এসব কথা না বলা হয়।

একটা খালি সাইকেল রিক্স প্রচুর শব্দ করে সামনে থেকে এসে পিছনে চলে গেল। রাস্তায় লোকজন নেই। ক্লাইভ রোডে নেমে শঙ্কিত ছায়া ফেলে ফেলে উত্তরমুখো হাঁটতে শীত গায়ে কাঁটা দিল। চুপচাপ আরও কতদূর পা চালিয়ে মিওর রোড পার হয়ে সামনে সব্জিক্ষেত। দুপাশে কপির সারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে অস্বস্তি হলে লজ্জা পাবার কারণ নেই। মাঝে মাঝে ওরা রাত্রে ক্ষেত পাহারা দেয়। অবশ্য আশপাশে দেখা গেল না কাউকে।

সব্জিক্ষেত পার হয়ে একটু ঢালে নামলে বালির বিস্তার, তারপর স্রোতস্বতী গঙ্গা। বেশ খানিকটা দূরে। স্রোত আছে কি না ভাল করে জানা নেই, এখান থেকে তাকিয়ে ঠিক বোঝা যায় না। শুধু চারদিকে বড় শীত। এখানে, সিভিল লাইন্সে, এই শহরে, আরও সব জায়গায় সব কিছুতে বড় শীত! বিজয়প্রতাপের সঙ্গে উবু হয়ে বসে বালি খুঁড়তে খুঁড়তে আঙুলের ডগা জ্বালা করছে। অনেক বালি খোঁড়া হয়ে গেলে একটা অন্ধকার গুহা তৈরি হল। শালের তলা থেকে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ান সেই সামান্য ভার তার মধ্যে নামিয়ে দিল বিজয়প্রতাপ। ছেঁড়া কাপড় এক পাশে একটু সরে গিয়ে রক্তাক্ত তেলকাগজ বেরিয়ে পড়ায় চোখে ধারাল কিছুর খোঁচা খাওয়ার মত যন্ত্রণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম বলতে পারলে খুশী হতাম। এবং আমার দিক থেকে সেটাই শোভন হত। কিন্তু কী যে হল, মুখ ফেরাতে পারি নি।

আবার বালি চাপা দিয়ে সব নিশ্চিহ্ন করে উঠে দাঁড়ালাম, ফিরলাম সিভিল লাইন্সের দিকে। প্রায় নিঃসন্দেহ হলাম, আমরা দুই প্রিয়বন্ধু ছাড়া চরাচরে আর কেউ আর কিছু বেঁচে নেই।

বিজয়প্রতাপ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোকে ক্রশ চিহ্ন আঁকতে হবে না! ড্যাম্ ইট। এসব আইনসম্মত হয়ে যাওয়া উচিত।'

কে বলল আমি ক্রশচিহ্ন আঁকছি। আমি শুধু হাত দিয়ে দেখছিলাম, আমার কি দুটো কানই কাটা!

নয়

আবার পাঁচ মাসের জেল হয়েছিল বিভাসের। পরীক্ষার পরে ব্যাপারটা ঘটেছিল, না হলে খুব ক্ষতি হত। এবারে আগের মত কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না, তবু তার জেল হওয়া অযৌক্তিকও ছিল না। নির্ভার প্রাত্যহিকতা থেকে এই নির্বাসন একেবারে অসহ্য লাগে নি, কিন্তু মনে হয়েছে, সাংঘাতিক অসুখে শরীরের প্রতিদিনের ক্ষয়ের মত কী যেন হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে, তাদের পুরনো বাড়িটার ঘর বারান্দা সিঁড়ি কুলুঙ্গি দেওয়ালের ফাটলের মত তার মনেও জমছে ছিবড়ের মত শুকনো অন্ধকার।

পাঁচ মাস পরে বাইরে এসে একটা বিকেলে ক্যানিং রোড দিয়ে শুধুশুধুই একলা হাঁটছিল। কোন কাজ ছিল না। পেভমেণ্টে হাওয়ায় উড়ছিল একটা দুটো হলুদ পাতা। বেগমের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা। তেলহীন চুলের চতুর বিন্যাস, তীক্ষ্ণাগ্র রক্তরঙ নখ, আচ্ছাদন স্বল্প, ঠোঁট গাল ভুরুতে রঙের প্রাচুর্য। কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চেয়েছিল বিভাস। বেগম ডাকলেন, 'বিভাস শোন।'

ফিরতে হল, যথেষ্ট অস্বস্তি নিয়ে অনিচ্ছায় ফিরতে হল।

কাছের একটা বনেদী রেস্টরাণ্টে বেগম তাকে নিয়ে গেলেন। একটা ছোট কিউবিক্লে বেগমের সামনের চেয়ারটায় বসতে হল। চা দিয়ে গেল দু'কাপ।

পিওনো বাজানর ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর বেগমের একহাতের পাঁচটি আঙুলের অস্থির সঞ্চরণ, জিভ ঠোঁট দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে এক মুখ হাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে ওয়েটারকে চায়ের নির্দেশ দেওয়ার অননুকরণীয় শিল্পকর্ম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল বিভাস। বোঝা গেল—এমন কিছু বক্তব্য আছে বেগমের যা গুছিয়ে বলা তাঁর পক্ষেও সহজ নয়। বেগমের এত কাছে এমন একান্তে আগে কখনও বসে নি। কপাল নাসাগ্র বোধহয় ঘেমে গেছে, কিন্তু ও'র চোখের সামনে বসে এখন পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকে ঘষা কি শোভন হবে।

'ইন্দ্রাণী আজকাল তোমাদের বাড়ি যায় না?' আচমকা প্রশ্ন করলেন বেগম।

'না।'

'তোমার সঙ্গে দেখা হয় না।'

'বিশেষ না।' সবটুকু সত্যি বলল না বিভাস। এই দেখা হওয়া মানে দেখা হলে একটু কথাও বলা। ইদানীং ইন্দ্রাণী নেহাত সামনে পড়ে গেলেও মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। 'বিশেষ না' বললে বোঝাতে পারে—আগের মত না হলেও, মাঝে মাঝে দেখা হয় এবং সামান্য কথাও হয়।

বেগম আবার বললেন, 'এখন তুমি কী করবে ভাবছ?'

'মালবিয়াজী সেণ্ট জোসেফ্স্ কলেজিয়েট স্কুলে আমার জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছেন। চাকরিটা পাব আশা হচ্ছে। পেলে এম. এ. পরীক্ষাটা প্রাইভেট দেব।'

'ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তোমার আগের মত ঘনিষ্ঠতা নেই কেন?'

এই জেরার কোন জবাব বিভাস খুঁজে পেল না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বেগম বললেন, 'আমি জানি তুমি ইন্দ্রাণীকে পছন্দ কর।'

এটা প্রশ্ন নয়, অতএব উত্তর দিতে হবে না। অথচ কিছু না বললে বেগমের মন্তব্য মেনে নেওয়া হয়। তবু চুপ করেই রইল।

'তোমার সঙ্গেই ইন্দ্রাণীর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল।' টেবিলের ওপর বেগমের অস্থির আঙুলের সঞ্চরণ দ্রুত হল। 'আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি এমন করে হার স্বীকার করবে না, একটু বলিষ্ঠতা দেখাবে, অধিকার অর্জনের একটু চেষ্টা করবে।'

এতক্ষণের অস্বস্থি এবার অসহ্য হল। একটানে চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল বিভাস। 'আপনার সঙ্গে আমি এসব বিষয় আলোচনা করতে পারব না, পারছি না। আমাকে যেতে দিন। আমাকে মাপ করবেন।' এক নিশ্বাসে কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে কথা ক'টি বলে রেস্টরান্ট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল। আর পিছন দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। আমার কাপুরুষতা আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন বেগম। কিন্তু কেন? আমাকে এমন করে জ্বালিয়ে তাঁর কী লাভ হবে!

একটা দুপুরে, দুপুর গড়িয়ে গেলে, তুমুল চিৎকারে বিভাসের ঘুম ভেঙে গেল। দুপুরে ঘুমনোর অভ্যেস তার কোনদিন ছিল না, সম্প্রতি একটু চেষ্টা করছে। উঠে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। পড়ন্ত রোদে সিংদের বাগানে দু'জন প্রবীণ ব্যক্তি পরস্পরকে ছিঁড়ে খেতে চাইছেন। একজন নবাব খান, আর একজন উদয়প্রতাপ সিং। বিজয়প্রতাপ তার বাবাকে জাপটে ধরেছে, তাঁর হাতে বন্দুক। ছুটির দিন নয়, বিতোষ বাড়ি ছিল না। বিভাস ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দেখল, নবাব খানের বাংলোর বারান্দায় দাঁড়ান বেগম। ইন্দ্রাণী সেখানে কোথাও নেই।

নবাব খান ঢোলা পাজামা আর গিলে-করা পাঞ্জাবীতে মেদের ভার ঢেকে হাত-পা ছুড়ে শাসাচ্ছেন, এবং, আন্দাজ করা যায়, তাঁর শাসানিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উদয়প্রতাপ সিং বন্দুক হাতে বাগানে নেমে এসেছেন।

এই কলহের উৎস যে ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপ তা বুঝতে কোন কষ্ট নেই। একবার ইচ্ছে হল এগিয়ে যাবে, আবার তখনই ইচ্ছেটা উবে গেল। কী হবে ওখানে গিয়ে। একটু পরে দু'জনেই ক্লান্ত হবেন, ঝগড়া থেমে যাবে। ওখানে, সিংদের বাগানে, যুদ্ধ হবে না, কিছুক্ষণ শুধু যুদ্ধের মহড়া হবে। যেটুকু হতে পারত, বিজয়প্রতাপ তা হতে দেবে না। বারান্দায় দাঁড়িয়েই রইল বিভাস।

নবাব খান এবং উদয়প্রতাপ সিংয়ের গর্জন থেকে কয়েকটি কথা বোধগম্য হল। দুজনেই বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে, বংশমর্যাদায়, বিত্তে সম্পদে একজনের স্থান অপরের থেকে অনেক উঁচুতে। নবাব খান বলছেন—বিজয়প্রতাপের মত ছেলেকে সিং যদি এখনও না সামলান, যদি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দেন, তাহলে একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। এবং খুনখরাবি তিনি নিজেই করবেন, কোন পেশাদার খুনীর দরকার হবে না, কারণ জল্লাদের রক্ত তাঁর শরীরে প্রচুর।

উদয়প্রতাপ সিং বোঝাতে চাইছেন—তাঁর ভবিষ্যতে আস্থা নেই। বন্দুকের কুঁদোটা বিজয়প্রতাপের হাত থেকে ছাড়াতে পারলে তিনি এখনই নবাব খানকে এক গুলীতে শেষ

করবেন। তাছাড়া তাঁর ছেলে বিজয়প্রতাপ যদি ভাল শিকারী হয়ে থাকে, সে তো গৌরবের কথা। একটা বুনো হরিণ আর একটা এই বয়েসের মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য তাঁর কাছে নেই।

উদয়প্রতাপ সিং ঠিক একটি মাংসাশী জীবের মত গর্জাচ্ছেন। অথচ তাঁর নিজের শরীর এতটা দূর থেকেও অত্যন্ত অসুস্থ মনে হয়। এখনই রক্তের চাপে বাগানের মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লে অথবা বিজয়প্রতাপের গায়ে ঢলে পড়লে অবাক হবার কিছু নেই।

আহা, এমন একটি দৃশ্যে ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অনুপস্থিত! এত সব ধ্বনি হয়ত তাঁর কানে যাচ্ছে না। কানে পৌঁছলেও নড়বেন না, দেওয়ালের সঙ্গে চেপে রাখা চেয়ারটা থেকে উঠে বাইরে আসবেন না।

সন্ধ্যের পরে বিজয়প্রতাপ এল। একমুখ হাসি নিয়ে ঘরে এসে বিছানায় বসল, তারপরই শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে। দুপুরের পরের দৃশ্যের কোন ছায়া নেই মুখে। একটু পরে উঠে বসে বলল, 'তোর সঙ্গে কথা আছ বিভাস।'

'বল।'

'আমরা বিয়ে করছি।' কোন ভূমিকা নেই বিজয়প্রতাপের।

বিভাস জোর করে ঠোঁটে হাসি টেনে এনে শুধু তাকিয়ে রইল।

'আবার শুরু হল, তোর চোখ লাড্ডু হয়ে আসছে। শোন, আইনের বিয়ে, তোকে একজন সাক্ষী হতে হবে।'

বিজয়প্রতাপ উঠে ভিতরের দিকের দরজাটা ভেজিয়ে ফিরে এসে বসল। পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। প্যাকেটটা ছুড়ে দিল বিভাসের টেবিলে। বিভাস তুলে নিল না, তখনও সিগারেট খেতে শেখেনি।

'আমি ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি চাইনি। কিন্তু ইন্দ্রাণী খুব ব্যস্ত। এতদিন আইনের বিয়ের বয়েসে পৌঁছতে একটু বাকী ছিল, তাই চুপ করে ছিল ইন্দ্রাণী, এখন ক্ষেপে গেছে।' একটু থেমে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তাছাড়া আবার সেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া সম্ভব না, ইন্দ্রাণীও রাজী না।'

'কেন, আবার সেই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কেন?'

'তোর মত নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব! ইন্দ্রাণী এবার তাকে বাঁচাবে। নিজের প্রাণ থাকতে এবার তাকে মারতে দেবে না।'

বিভাসের মনে হল, বুঝতে পারছে, জীবন যৌবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য সরল হয়ে আসছে একটু।

'আমি হয়ত পারতাম না, কিন্তু অন্য পন্থা আছে, ডাক্তারের কাছে না গিয়ে অন্য পথ নেওয়া যায়। উপযুক্ত স্থানে একটি আচমকা আঘাত পেলে সব মিটে যায়। ভয় পাবার মত কিছু না, শুধু সব পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।'

বিভাস চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে বিজয়প্রতাপের গালে কঠিন একটি চড় মারল, জ্বালা করে উঠল হাত। সেই হাতটা মুচড়ে দিল বিজয়প্রতাপ, একেবারে ভেঙে দিতে গিয়েও দিল না, ছেড়ে দিল। তারপর সুবিন্যস্ত দু'সারি দাঁত উদ্ভাসিত করে হেসে বলল, 'এমন বাঁদরের মত লাফালাফি করছিস কেন? এই সিভিল লাইন্সেই এমন ঘটেছে, আমার কাছে নজির আছে।'

আবার চেয়ারে এসে বসল বিভাস। মনে হল, দুপুরের পরের দৃশ্য এতটা নাটকীয় হয়নি। সেই প্রথম প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল। কাশতে কাশতে জল এসে গেল চোখে।

বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'বেগমটা বড় জ্বালাচ্ছে ইন্দ্রাণীকে। যখন তখন চুলের মুঠি ধরে মাথা ঠুকে দিচ্ছে দেওয়ালে। নিখাদ ডাইনি।'

'তুই নিজেই তো জানোয়ারের মত নানাবিধ পন্থার কথা বলছিস। এটা হয়ত বেগমের মেয়েকে শাসন করার একটা পন্থা।'

'এটা শাসন নয়। হিংসে, হিংসে। হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে বেগম। আমি ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে ইন্দ্রাণীর এধরনের কিছু হলে বেগম খুশীই হত।'

বেগমের রেস্টরান্টের কথাগুলো মনে পড়ল বিভাসের। আরও মনে পড়ল, একটা সময় ছিল যখন বেগমের অন্তঃপুরে উধাও হত বিজয়প্রতাপ। কিন্তু সে তো কতকাল আগের কথা। এখনও জ্বলছেন বেগম! এমন হয় নাকি? আর জ্বলে পুড়ে ছাই হতে কতদিন লাগে!

দশ

একটা স্টেশনে ট্রেন থামল। হাজারিবাগ রোড। রাত তিনটে বাজতে মাত্র মিনিট পনের বাকী। এই স্টেশনে চারপাঁচ মিনিট দাঁড়াবে ট্রেন। বিভাস কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। মাথার ওপরে, স্টেশনের আলোর পরিধির বাইরে ঝাঁঝাঁ করছে অন্ধকার রাত। হাওয়ায় হেমন্তের হিম। কী আশ্চর্য, একটা চা-ওয়ালা এল, আশীর্বাদের মত।

পাশের কামরাটি প্রথম শ্রেণীর। কলকাতার একটা কলেজের এক ঝাঁক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আর বিদেশী মেয়ে এবং তাদের দু'জন অধ্যাপিকা আর একজন অধ্যাপকের জন্যে রিজার্ভ করা কামরা। তার পাশের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটায় তাদের দলের ছেলেরা রয়েছে। উত্তরপ্রদেশের কোন শহরে কিছু খেলতে যাচ্ছে তারা। প্রায় প্রত্যেক স্টেশনে মেয়েদের কামরার দরজায় এসে ছেলেরা দাঁড়াচ্ছে আর তাদের হাত ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে মেয়েরা। ছেলেদের এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অঙ্গে যথেষ্ট পোশাক আছে, কিন্তু এই মেয়েদের প্রত্যেকের জুতোর ওপর থেকে শুরু করে পায়ের ঊর্ধ্ব প্রত্যন্ত পর্যন্ত একেবারে আদুড়। এদের শীত নেই। বস্তুত পনের থেকে পঁচিশ বছরের মেয়েদের মোটেই শীত থাকে না! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তারা প্ল্যাটফর্মে নামলে তাদের হাসি, ঢলেঢলে পড়া এবং আদুড় পা দেখবার জন্যে স্টেশনে স্টেশনে নীল শার্ট-প্যাণ্ট পরা কনিষ্ঠতম রেলকর্মীরা কাজ ফেলেও সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ছে। আগের একটা স্টেশনে এক ভদ্রলোক তাদের দিকে চেয়ে ঘৃণার সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—'কী বেহায়ার মত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছে!' এখন এই স্টেশনের নীল শার্ট-প্যাণ্ট পরা লোক ক'টিকে দেখে বিভাসের মনে হল, তাদের চোখেমুখে বেহায়াপনা থেকে, হ্যাংলামি থেকে বিস্ময় বেশি। এবং মনে হল, এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এর জন্যে তাদের ঘৃণা করার অধিকার সেই ভদ্রলোকের, যিনি সামনের বেঞ্চের একজনের কানের পাশে পা তুলে দিয়েছেন, ছিল না।

ট্রেন ছাড়বে। ছেলেরা-মেয়েরা তাদের কামরায় উঠে গেছে। বিভাস দেখল, মেয়েদের কামরার গায়ে খড়ি দিয়ে বড়বড় অক্ষরে লিখেছে—'ওন্‌লি ফর্‌ দি লোন্‌লি।' আর এক

কুল্‌হাড় চা নিয়ে নিজের কামরায় উঠল বিভাস। হঠাৎ মনে পড়ল, জওলাপ্রসাদের ছোট মেয়ে বিনীতাকে একদা এমন সংক্ষিপ্ত পোশাকে দেখেছিল।

এর পর আরও অনেকগুলো স্টেশন—কোডার্মা, গয়া, ডেহরি-অন-সোন, সাসারাম, মোগলসরাই, মীর্জাপুর, তারপর সেই শহর যা তাকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করেছে, ছাই করে ছড়িয়ে দিয়েছ হাওয়ায়।

জানলার কাঠে মাথা রেখে আর একটা সিগারেট ধরাল বিভাস।

উদয়প্রতাপ সিং ছেলের বউ ঘরে এনে বেশি দিন বাঁচেন নি, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মরেছিলেন। তার আগেই কলেজ ছেড়েছিল বিজয়প্রতাপ আর ইন্দ্রাণী। তাঁর মৃত্যুর পরে বাবার যা কিছু ছিল কয়েক মাসে উড়িয়ে দিয়েছিল বিজয়প্রতাপ। তখন সারা শহর তোলপাড় করে খুঁজেছিল যে কোন একটা চাকরি। অবশেষে পেয়েওছিল একটা, ফোর্টের আর্সেনালে। দক্ষিণা কম ছিল, অত্যন্ত কম। অথচ বিজয়প্রতাপ নিজেকে খুব বেশি দামী ভেবেছিল, অসাধারণ ভেবেছিল। এখন দক্ষিণার বহর দেখে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে তার ঔদ্ধত্য আরও অনেক বেড়ে গেল।

অনেক টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি করে এক বছর ছিল চাকরিটা; তারপর আর থাকল না। সেই একটা বছর বিভাস মাঝে মাঝেই ওদের বাড়িতে গিয়েছে, সহজ হতে চেয়েছে ওদের সঙ্গে। ইন্দ্রাণীর দ্বিধার, সঙ্কোচের বালাই দূর করার জন্যে তার সব আচরণে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে—ইন্দ্রাণী, তোমাকে আমি ঘৃণা করি না, এতটুকু ঘৃণা করি না। ওদের সংসারে অসচ্ছলতা চরমে উঠলে তার আচরণে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে—ইন্দ্রাণী, তোমাকে আমি করুণা করি না, এতটুকু করুণা করি না। বিজয়প্রতাপকে লুকিয়ে টাকা দিয়েছে, নানা ছুতোয় নানাবিধ উপহার দিয়েছে প্রতি মাসে। মাঝে মাঝেই চা, আখরোট কিসমিস নিয়ে গেছে। বলেছে, 'এই চা একটা দোকান থেকে একমাত্র আমি পাই। এমন ব্লেণ্ড আর কারও জন্যে করে না। এই আখরোট কিসমিস আমি নিয়ে আসি আমাদের কৈশোর আর প্রথম যৌবনকে সম্মান দেবার জন্যে, হয়ত কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেও।'

সেই এক বছর ইন্দ্রাণীর মুখ প্রায় সব সময় বিষণ্ণ দেখেছে। তার একটা স্পষ্ট কারণ ছিল। উদয়প্রতাপ সিংয়ের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে ইন্দ্রাণী ডাফরিন হাসপাতাল থেকে শূন্য হাতে ফিরে এসেছিল। বিভাস এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল যে, তার শিশুর জন্মের আগের মৃত্যু তার বিষণ্ণতার একমাত্র কারণ। অন্য কারণ থাকা, বস্তুত অন্য কারণ দেখা দেওয়া, অসম্ভব নয় ভেবে এই স্পষ্ট কারণটা পেয়ে গিয়ে বিভাস বরং শান্তিতে ছিল। বিজয়প্রতাপ সরল সংসারে মগ্ন হবে এমন বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না বলে অন্য কারণ দেখা দেওয়া অসম্ভব নয় মনে হয়েছে।

সে খুব দামী অথচ উপযুক্ত দাম দেবার মত উপযুক্ত মানুষ নেই—এই অহঙ্কার সেই সময়টায় ক্ষেপিয়ে তুলেছিল বিজয়প্রতাপকে। কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না। সব কিছুকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল, সব কিছুর নিন্দে করতে তার জিভ প্রতিদিন তীক্ষ্ণতর হচ্ছিল।

তিন মাসের বিস্ময়কর সাধনায় জুটিয়েছিল আর একটা চাকরি। কিন্তু সেই একই কাহিনী, উপযুক্ত দাম না পাওয়ার সেই পুরনো কিস্‌সা। চাকরিটা ছিল রেল স্টেশনে, ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের অফিসে। মাঝেমাঝেই যেত না, গেলেও ঠিক সময়ে যেত না, নিজের সমান স্তরের কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অসম্মানজনক মনে করত, নিজেকে

তাদের থেকে অনেক উঁচু স্তরের জীব হিসেবে উপস্থাপনার পদ্ধতিটা স্থূল ছিল, করণীয় কাজ না করার অভিযোগ আনলে মারমুখো হয়ে উঠত। ফলে এক সময় এই চাকরিটাও গেল।

এতদিনে একবার বেঁকে বসল ইন্দ্রাণী, যেন কতকাল পরে খোলস ছিঁড়ে বাইরে এল। একটা সকালে ঝগড়া করে, বিজয়প্রতাপের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ উপেক্ষা করে দেখা করতে গেল ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে। বলে গেল, বিজয়প্রতাপকে যেমন করে হোক আবার চাকরিতে বহালের ব্যবস্থা করে ফিরবে।

দুপুর পার হয়ে গেলেও ইন্দ্রাণী যখন ফিরল না, বিভাসের খোঁজে এল বিজয়প্রতাপ। বাড়িতে না পেয়ে স্কুলে এসে ধরল। যেন সব অপরাধ বিভাসের এমন একটা ভাব দেখিয়ে জানাল, তাকে একবার স্টেশনে যেতে হবে, ইন্দ্রাণীকে তখনই বাড়ি ফিরিয়ে আনতে হবে। একটা নোংরা চাকরির জন্যে এত অপমান অসহ্য। বিজয়প্রতাপ নিজে সেখানে যেতে পারছে না, কারণ সে তার অফিসারের মুখ দেখতেও নারাজ।

সেদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে কুইন্স রোড দিয়ে স্টেশনে বিজয়প্রতাপের অফিসে এসে বিভাস চমকে উঠেছিল। ইন্দ্রাণীকে এমন ভাবে দেখবে কোনদিন কল্পনায় ছিল না। বিজয়প্রতাপের অফিসারের ঘরের সুইংডোরের সামনে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে মেঝেয় বসেছিল ইন্দ্রাণী, একটা স্লিপারের একটি অত্যাবশ্যক স্ট্র্যাপ ছেঁড়া, পায়ে প্রচুর ধুলো, মুখ শুকনো, চোখে দুঃসহ ধার। আশপাশে চার-পাঁচটি বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল।

তাকে দেখেই যেন ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রাণী। বিদ্রূপের হাসিতে মুখের পেশী বিকৃত করে বলল, 'আমাকে অপমান করতে এলে, বিভাস?'

'ছিঃ!' বিভাস সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে মুখোমুখি হল। 'এমন কুৎসিত কথা কেন বলছ?'

শুকনো ঠোঁট একপাশে টেনে রেখে ইন্দ্রাণী বলল, 'আমাকে এখানে এই অবস্থায় দেখতে আসা অপমান করা ছাড়া আর কী?'

আহত গলায় বলল বিভাস—'আমি তোমাকে দেখতে আসিনি। তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'তুমি এত নির্বোধ নও যে আমাকে করুণা করলে অপমান করা হয় সেটাও বোঝ না।'

'তোমাকে আমি করুণা করি না ইন্দ্রাণী, এতটুকু করুণা করি না! চল, এখনই বাড়ি ফিরে চল আমার সঙ্গে, এভাবে এই চাকরি ফিরে পেতে বিজয়প্রতাপ চায় না।'

'তুমি এখান থেকে যাও বিভাস, আমার সামনে থেকে সরে যাও।' ইন্দ্রাণীর বাগভঙ্গি আরও কঠোর হল। 'তোমার বোঝা উচিত তুমি এখন এখানে থাকলে আমার অপমানবোধ সব থেকে তীব্র হয়।'

'কেন তা হবে? আমি তোমার বন্ধু, ছোটবেলা থেকে তোমার বন্ধু, কষ্টের সময় আমি কাছে এলে তোমার তো একটু স্বস্তি পাবার কথা।'

'তোমাকে বোঝান যাবে না। তুমি বুঝতে না চাইলে আমি কেমন করে তোমাকে বোঝাব? কিন্তু তুমি এখান থেকে যাও বিভাস, আমার সামনে থেকে সরে যাও।'

'আমি তোমাকে নিয়ে যাব।' বিভাস এমন কি হাত বাড়াল ইন্দ্রাণীর হাত ধরে টানবার জন্যে।

'এটা নাটক করবার জায়গা নয়।' এক পা পিছিয়ে গেল ইন্দ্রাণী। 'অফিসের বারান্দা

নাটকের সংলাপের মত করে কথা বলার জায়গা নয়। তুমি এখনই চলে যাও এখান থেকে, না হলে আমি চিৎকার করে লোক জড় করব, বলব—তুমি আমাকে অপমান করছ।'

একটা বড়ঘরের খোলা দরজায় বেশ কয়েকজনকে উঁকি দিতে দেখা গেল। বিবর্ণ মুখে নিচে নামার সিঁড়িতে পা বাড়াল বিভাস। এর পরও জোর করবার অধিকার তার নেই। বিজয়প্রতাপ নিজে আসুক। একটি বেয়ারা তার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িতে নেমে এল, জানাল—তাদের বড় সাহেব ইন্দ্রাণীর কথা একবার শুনেছেন, আর শুনতে চান না, কিন্তু ইন্দ্রাণী আর একবার তার বক্তব্য পেশ না করে যাবে না, অফিসারটি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ওখানে বসে থাকবে।

চাকরিটা বিজয়প্রতাপ আবার পেয়েছিল, কিন্তু পুরো দুমাসও রইল না। একই অফিসে তার দ্বিতীয়বার কাজ পাওয়াটা বিভাসের বিস্ময়কর মনে হয়েছিল, দ্বিতীয়বার চাকরি যাওয়াটা বিস্ময়কর মনে হয়নি।

ঠিক সেই সময়ে বিজয়প্রতাপকে জওলাপ্রসাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখেছিল। সেই সময়ে একদিন সন্ধ্যায় জওলাপ্রসাদের ছোটমেয়ে বিনীতাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পোশাকে টেনিস র‍্যাকেট হাতে সিং বাড়ির ফটকে গাড়ি থেকে বিজয়প্রতাপের সঙ্গে নামতে দেখেছিল। বিভাস শুনেছিল, যুদ্ধের শেষের দু'তিন বছরে জওলাপ্রসাদ টাকার পাহাড় করেছে।

জওলাপ্রসাদের সঙ্গে রাস্তা বাড়ি ব্রিজ তৈরির ব্যবসায় নামবার পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের বাড়িটা বেচে দিয়েছিল বিজয়প্রতাপ। তারপর একদিন কৈশোর আর প্রথম যৌবনকে অল্পক্ষণের জন্যও বাঁচিয়ে রাখার সব অনুষঙ্গ হাতছাড়া করে সিভিল লাইন্সের অন্য পাড়ায় উঠে গিয়েছিল একটা ভাড়া-করা ছোট বাড়িতে।

প্রথম বছরটা নাকি নিদারুণ পরিশ্রম করেছিল বিজয়প্রতাপ, একটা ভয়ঙ্কর শক্তিমান জন্তুর মত খেটেছিল। আর পুরোপুরি বছরটা ঘুরে আসবার আগেই সোনার সিন্ধুকের রহস্যময় চাবিটা তার হাতে এসে গিয়েছিল। তখন বোধহয় তার নতুন কাজের অলিগলি নখদর্পণে এসে গেলে বিশেষ করে শীতকালে বিকেলের দিকে বিজয়প্রতাপ একটু অবসর করে নিয়েছিল। কারণ বেশ কয়েকবার টেনিস লন্ থেকে বিনীতার সঙ্গে ফেরার পথে বিভাসকে তুলে নিতে এসেছে, নিজের গাড়িতে চেপে এসেছে। মোটরে বসে বিভাসের প্রায় প্রত্যেকটি সাধারণ কথায় বিনীতা হাসিতে ফেটে পড়েছে। এত অকারণে হাসি কেন আসে কেমন করে আসে বিভাস বোঝে নি।

জওলাপ্রসাদের বাড়িতে বিনীতাকে নামিয়ে দিয়ে বিজয়প্রতাপদের বাড়ি যাবার পথে বিভাস একদিন বলেছিল—'ইন্দ্রাণী তোর সঙ্গে যায় না কেন?'

অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বিজয়প্রতাপ বলেছিল—'বাড়ি থেকে বেরোতেই চায় না। বড় ঘরকুণো।'

বিভাসের মনে হয়েছিল, এমন অবিশ্বাস্য কথা জীবনে কম শুনেছে। যে মেয়ে কয়েক বছর আগেও সারা সিভিল লাইন্সে সংক্রামক গুজবের, সরস গুঞ্জনের উৎস ছিল সে এখন ঘর থেকে বেরোতে চায় না এমন কথা সহজে বিশ্বাস করা মুশকিল। মনে হয়েছিল, তার জানার পরিধির বাইরে এমন গভীর কিছু আছে যা জানবার অধিকার তার সত্যিই নেই। অবশ্য খুব গভীর কিছু রহস্য রয়েছে ভাববারও আসলে বিশেষ যুক্তি ছিল না। বিজয়-

প্রতাপ নিজেক লুকিয়ে রাখতে জানত না। তাকে আর বিনীতাকে ঘিরে একটা সম্ভাবনা যে ক্রমান্বয়ে অবয়ব পাচ্ছিল তা তেমন প্রচ্ছন্ন ছিল না।

বিভাস বুঝেছিল, সবার সুখের চেহারা এক নয়। যে সুখে মদের মত ঝাঁজ নেই তা বিজয়প্রতাপের জন্যে নয়। বেহালার সুর যে সুখের উপমা তা বিজয়প্রতাপকে টানে না। নতুন নতুন সুখের উল্লাসে উন্মাদ হতে না পারলে সে বাঁচবে না।

এইসব বুঝেছিল বিভাস, বুঝতে পেরেছিল—জীবন থেকে বিস্ময়বোধ একেবারেই চলে যাচ্ছে। আর যেন অচেনা কিছু নেই, নতুন কিছু নেই, যা দেখে অবাক হতে পারে। অথচ যুদ্ধ গেছে, দাঙ্গা গেছে, রঙ বদলে গেছে দেশের। তার বয়েসী আর প্রায় সবাই হন্যে হয়ে পোশাকে আচরণে কথায় ছিঁড়েছিঁড়ে খেতে চাইছে ঝাঁজাল সুখের শরীর। প্রতিদিন আরও আরও হন্যে হয়ে উঠছে এই দেখে যে, সব সুখের শরীর প্ল্যাস্টিকের মত। আসলে সব ফুলের সব পাঁপড়ি প্ল্যাস্টিকের। এত সব বুঝেছিল বিভাস, তার নিজের বয়েসটা যেন বেড়ে গিয়েছিল একটু বেশি তাড়াতাড়ি। তাদের শ্যাওলাধরা একতলা বাড়িটার আশপাশে নির্জনতা যত বাড়ছিল তত বেশি ডুবছিল বিস্ময়বোধহীন বিবর্ণ শূন্যতায়।

ইন্দ্রাণী যখন ফিরে এসেছিল নবাব খানের বাঙলোয়, যখন ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপ পরস্পরের সম্মতিতে আইনের সাহায্য প্রার্থনা করেছিল এবং যখন আইন তাদের সব সম্পর্ক চুকিয়ে মুক্ত নির্ভার করে দিয়েছিল, সেই দিনগুলোয় বিভাস তেমন বিস্মিত হয় নি। খুব একটা আকস্মিক তীব্র আঘাত লাগেনি মনে। আসলে মন হয়ত আর তেমন তীক্ষ্ম ছিল না। শুধু ইন্দ্রাণী যখন সব ফেলে আবার ফিরে এল, বেশ একটু বেসামাল হয়েছিলেন নবাব খান। তাঁকে নেশায় চুর হয়ে বেলেল্লাপনা করতে বিভাস এর আগে কখনও দেখেনি।

যে সকালবেলাটায় ইন্দ্রাণী সব ফেলে নবাব খানের বাঙলোয় চলে এসেছিল সেদিন দুপুরে বেগম ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিভাসকে। বিভাস যায়নি। নবাব খানের বাঙলোর অন্দরে প্রবেশের অভ্যেস তার ছিল না। ভেবেছিল, কী হবে ওখানে গিয়ে। এবিষয়ে কারও সঙ্গে কোন আলোচনা করার রুচি ছিল না। বেগম হয়ত জানতে চাইবেন, ইন্দ্রাণী আর বিজয়প্রতাপ পরস্পরের কাছে এমন দুঃসহ হল কেন। এই সম্ভাব্য প্রশ্নের কোন সঙ্গত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করার উৎসাহও তখন অবসিত। তাছাড়া এসবের সঙ্গে বিভাসের নিজেকে জড়ানরও কোন যুক্তি ছিল না। এমন হবার আগে এমন যে হবে বিভাস বুঝেছিল, বিজয়প্রতাপের কথায় আচরণে বুঝেছিল, ইন্দ্রাণী তাকে কিছু আন্দাজ করবার অবকাশ দেয়নি। ইন্দ্রাণী তখন তাকে একবারও ডাকেনি, তার যন্ত্রণার দিনগুলোয় ডাকেনি। এখন সব চুকে গেলে নবাব খানের বাঙলোয় গিয়ে বেগমের সঙ্গে বিলাপ করে কী হবে। ইন্দ্রাণীর বিষয়ে উৎসাহিত হবার অধিকার ইন্দ্রাণী তাকে দেয়নি।

শূন্য উধাও মাঠে বৈশাখের কড়া রোদের মত তার ছোটঘরে শূন্যতা কাঁপতে থাকলে বিভাস মাঝে মাঝে ভেবেছে, এত সব তো না-ও হতে পারত। ন্যাড়াছাতের কার্নিসে বসে আবাবীল পাখিদের উড়ে উড়ে খড়কুটো বয়ে আনা দেখার মত জীবনটা সহজ হয় না কেন। অবশ্য নখ দিয়ে বালি খোঁড়ার মত করে নির্জন ঘরে নিজের মনকে খুঁচিয়ে জ্বালা ধরানর বিলাস তেমন প্রশ্রয় পায়নি। এত কিছুর মধ্যেও নিজেকে নিরুত্তাপ রাখার নিপুণ সাধনায় মগ্ন ছিল বিভাস।

কয়েক মাসের মধ্যে জওলাপ্রসাদের ছোটমেয়ে বিনীতা যখন বিজয়প্রতাপের ঘরে

প্রতিষ্ঠিত হল, বিভাস অবাক হয়নি। সব যেন আগে থেকে জানাই ছিল, খড়ি দিয়ে টানাই ছিল সরলরেখা।

এগার

আগে আগে, যখন প্রতিদিন একাধিকবার ইন্দ্রাণী এবাড়িতে আসত, বাংলো থেকে বেরিয়ে নবাব খানের বাগানের ডালিমগাছের ছায়া দিয়ে আসতে আসতে বিভাসকে জোর গলায় ডাকত একবার-দুবার। বিভাসের সাড়া পাবার জন্যে অপেক্ষা করত না। বাড়ির মধ্যে সব থেকে ছোটঘরে এবং সেখান থেকে ছাতে উঠে আসত। বিভাস বাড়ি থাকলে ইন্দ্রাণী এসে বারান্দায় উঠবার আগেই বুঝতে পারত ইন্দ্রাণী আসছে। কিন্তু সেদিন কখন নিঃশব্দে ইন্দ্রাণী এসেছে বুঝতে পারেনি। ইন্দ্রাণী আবার সহজে নিজে থেকে এবাড়ি আসবে এমন সম্ভাবনা কল্পনায় ছিল না, অন্তত নবাব খানের বাড়ি ফিরে আসবার তিন-চার মাসের মধ্যেই আসবে ভাবতে পারেনি।

একটুও জানতে না দিয়ে বাগান রাস্তা বারান্দা পার হয়ে এসে ছোটঘরের দরজায় একটা হাত রেখে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী বলেছিল, 'আসব?' ইন্দ্রাণীর কথা এত মৃদু হতে পারে আগে জানত না, একেবারে নতুন লেগেছিল। টেবিলের কাছে রাখা ঘরের একটিমাত্র চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছিল, ইন্দ্রাণীকে সেখানে বসতে বলে সরে গিয়েছিল খাটের দিকে। যেন বিশিষ্ট অতিথি কেউ এসেছেন, যাঁকে সযত্নে আপ্যায়ন করা দরকার।

প্রায় একসঙ্গে ইন্দ্রাণী চেয়ারটায় আর বিভাস খাটের পাশে বসেছিল। যদি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী বিলম্বিত নিঃশ্বাস ফেলে বলত—'কতকাল পরে এবাড়িতে এলাম! তুমি কেমন আছ, বিভাস?'—এবং বিভাস যদি যৌবনবাউলের গভীর গলায় বলত—'এই আছি, আমার দিন কাটছে, শুধু দিন কাটছে।'—তাহলে বেশ মধুর মধুর হত ঘরের হাওয়া।

ইন্দ্রাণী অবশ্য চেয়ারটায় চুপ করেই বসে রইল, একটু বেশিক্ষণ চুপ করে রইল। ঘরে এসেই একবার তাকিয়েছিল বিভাসের মুখোমুখি, তারপরই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। ইন্দ্রাণীকে এমন দেখতে খুব আশ্চর্য লাগে। চোখ তুলে, এমনকি বিভাসের দিকেও চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। অথচ এর কোন কারণ নেই, অন্তত বিভাস এর কোন কারণ জানে না।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেলে, কোন ভূমিকা না করে ইন্দ্রাণী বলল, 'আমার একটা চাকরি দরকার।'

কিছু না ভেবে অর্থহীন প্রশ্ন করল বিভাস—'কেন?'

আর একবার ইন্দ্রাণী চোখ তুলে তাকাল, হয়ত বুঝতে দিল—এমন নিরর্থক প্রশ্ন করা নিতান্ত বোকামি। টেবিলের ওপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছু একটা করতে চাই। আমার সময় কাটছে না।'

সময় ঠিক কেটে যায়। দিন যায়, দিন যাবে। এই তো এতগুলো বছরের অগুনতি দিন গেছে। বিভাসের চোখ তীব্র আলোয় ঝলসে দিয়ে গেছে অজস্র দিন। কয়েক বছর আগেও সিভিল লাইন্সে তারাই তরুণ ছিল, ভেবেছিল—এখানে যা আছে, আমরাই তার

সম্রাট। আমাদের জন্যেই কৃষ্ণচূড়া, আমাদের জন্যেই ন্যাড়া কাল ছাত বর্ষায় সবুজ, আমাদের জন্যেই ডালিমের সরু সরু ডাল ফলের ভারে নেমে আসে। অথচ ইতিমধ্যেই তারা পিছনে পড়ে গেছে, ইতিমধ্যেই সব প্রায় বেদখল। আরও দুদিন গেলে তারা একেবারে উচ্ছিষ্ট হয়ে যাবে। যদিও কেউ কিছু কেড়ে নেয়নি, তবু আর কিছুই যেন করলগ্ন নেই।

জানলা দিয়ে একটা হাওয়ার ঝাপটা এল। ইন্দ্রাণীর রুক্ষ চুল কাঁপল একটু। মুখ না তুলেই ইন্দ্রাণী হয়ত বুঝতে পারল, বিভাস তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'চাকরি করলেই সব সহজ হয়ে আসবে ভাবছ কেন? বরং এখনই চাকরি না নিয়ে, আবার অন্তত কয়েক বছরের জন্যে পড়াশুনো শুরু করতে পার।'

'হাওয়ায় হাওয়ায় কথা বল না বিভাস, মাস্টারের চোখ দিয়ে সবাইকে দেখ না।' ইন্দ্রাণী সোজা হয়ে বসে বিভাসের দিকে তাকাল। 'আমার কিছুই তো সরলরেখায় চলল না। এমন আঁকাবাঁকা ভাঙাচোরা হয়ে যাবার জন্যে আমি নিজে কতটা দায়ী বুঝতে পারি না। তবে বলার দরকার হয় না যে আবার নতুন করে পড়াশুনো শুরু করবার মত সুন্দর ভাবনার আমার কাছে আর কোন দাম নেই।' একটু থেমে কথায় আরও ধার আনল ইন্দ্রাণী। 'তুমি হয়ত জান না, কিন্তু আমি লতার মত ইচ্ছে করে কিছু জড়াতে যাইনি। দেখলাম, জড়িয়ে গিয়েছি। আমার শিকড় হয়ত তেমন গভীর ছিল না, যেটুকু ছিল তাও দেখলাম গোড়া থেকে ছিঁড়ে গেছে। তবু আমি যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন জীবনের জন্যে তৈরি হয়েছিলাম, অনেক চেষ্টা করেছিলাম। যাক্‌গে। তোমাকে এসব বলে আর কী হবে! এখন, শোন, আমার মেয়াদ যদি মাত্র পঞ্চাশ বছরও হয়, তাহলে এখনও আমাকে আরও বাইশ-তেইশ বছর বাঁচতে হবে। কিছু একটা করতে চাই। আমার সময় কাটছে না।'

প্রচ্ছন্ন খোঁচাগুলো গায়ে মাখল না বিভাস। ইন্দ্রাণী এখনও এতটুকুও তীক্ষ্ণ হতে পারে দেখে মনে হল, এই এতকাল পরে এই ঘরে বসে থাকার কী এক বিচিত্র স্বাদ আছে। সহজ হয়ে বলল, 'আমাকে কী করতে হবে বল।'

'তোমাদের মালবিয়াজীকে একটু আমার জন্যে বলতে হবে। অনেক সংগঠনে তিনি আছেন। আমাকে কোন একটাতে নিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে হয়ত কঠিন হবে না। স্কুল, ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান—এইসবের মধ্যে তো তিনি আছেন, তুমি নিশ্চয়ই আমার থেকে বেশি জান।'

'তোমার থেকে হয়ত বেশি জানি, তবে সব জানিনে। চল না একবার মালবিয়াজীর বাড়ি; তিনি তো তোমাকে চেনেন। আজই যাবে? আজ তো ছুটির দিন। আজই দুপুরের পরে আমরা যেতে পারি।'

'আজই যাব।' ইন্দ্রাণীর কথা আবার মৃদু হল। 'জান, শেষের দিকে বিজয়প্রতাপ প্রায়ই বলত—তুমি তো বেগমেরই কন্যা! সত্যি, ভেবে দেখ, আমার মা'র সঙ্গে এখন আমার প্রচুর মিল, অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হবে। তুমি জান আমি জানি মাকে কোনদিন শ্রদ্ধা করতে পারলাম না। কিন্তু তুমি জান না যাঁরা শ্রদ্ধাস্পদ তাঁদের শ্রদ্ধা করতে না পারা কী ভীষণ কষ্ট!'

বিভাস ভাবল, আমার মাকে কি আমি শ্রদ্ধা করতাম। আমার যে বাঙলা বই পড়ার অভ্যেস সে কি মা'র কাছ থেকে পেয়েছি। না হলে এই অভ্যেস কেন হল। ছোটবেলা থেকে তো শুধু ইংরেজি পড়ার সুযোগ এসেছে। গম্বুজের ছায়ায় বসে উনিশ শতকের এক ইংরেজ কবির জীবনাশ্রয়ী এক উপন্যাস পড়ে একবার তো প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার মা তো বিয়ের আগে ব্রহ্মদেশপ্রবাসী বাঙালী মেয়ে ছিলেন; তিনি কি অন্য কারও সান্নিধ্য থেকে পেয়েছিলেন বাঙলা পড়ার অভ্যেস। কী মুশকিল, এসব কেন ভাবছি। ইন্দ্রাণী এখানেই বসে আছে, এখন কি শুধু সে-ই ভাবনা জুড়ে থাকবার কথা নয়। বিছানায় একখানা বাঙলা বই পড়ে আছে বলেই কি এইসব ভাবছি। ভাবনাগুলো বড় এলোমেলো।

মালবিয়াজীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন। খুব ছোট একটা ফলকে লেখা রঘুরঞ্জন মালব্য। অন্তত এক মাস এখানে আসেনি বিভাস। মালবিয়াজী শহরের বাইরে কোথাও গেছেন কিনা তাও জানে না। এখানে থাকলেও হয়ত এখন বাড়ি নেই। তাহলে আবার আসতে হবে। ইন্দ্রাণীর চাকরির জন্যে আসাটা তিনি কেমন চোখে দেখবেন জানা নেই। হয়ত খুশীই হবেন, সহজেই হয়ত চাকরি একটা মিলবে।

এক মিনিটের দ্বিধার পর ফটক পার হয়ে বাগানে দু'পা এগোতেই পিছনে সাইকেলের ঘণ্টি বাজল। লাফিয়ে সাইকেল থেকে নেমে এক মুখ হাসি ছড়ালেন মালবিয়াজী। পিছন ফিরে ভাল করে দেখল, সেই এক মূর্তি। খাকি ট্রাউজারের ওপর সাদা শার্টটা বেশ ময়লা, কাঁচাপাকা দাড়ি অন্তত তিন দিন ধরে বাড়ছে। সাইকেলটা দেওয়ালের গায়ে রেখে কাছে এলেন, তখন মালবিয়াজীর মুখ দেখতে হলে আকাশের দিকে তাকাতে হবে; শীর্ণ কিন্তু ঋজু। বললেন, 'এস, এস। ইন্দ্রাণী এসেছ, আমার কী সৌভাগ্য!'

বিভাস অনেকবার ভেবেছে, সারা শহরে একমাত্র মালবিয়াজীর সান্নিধ্যে এলে মনে হয় আমরা এখনও তরুণ।

বাইরের দিকের ঘরটায় বসে অনেকক্ষণ গল্প হল। চা এল দু'দফায়। এখানে ইন্দ্রাণীকে নিয়ে আসার কারণটা বিভাস জানাল। ইন্দ্রাণীর গত কয়েক বছরের প্রায় সব খবর মালবিয়াজী নিশ্চয়ই জানেন, তবু সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করে সোচ্চার হাসিতে কথায় এমন ভাব দেখালেন যেন আজ এখন ইন্দ্রাণীর এই উদ্দেশ্যে এখানে আসাটা পুরোপুরি স্বাভাবিক। দু'এক মাসের মধ্যে ইন্দ্রাণীর কিছু একটা হবে আশ্বাস দিলেন। তাঁর স্ত্রী চুপচাপ দরজার পাশে বসে কথা হাসি শুনছিলেন, শুধু মাঝে মাঝে একটু যোগ দিচ্ছিলেন হাসিতে। তিনি ইন্দ্রাণীকে নিয়ে একবার ভিতরে গেলেন, তাকে অন্দরমহলটা দেখাবেন। মালবিয়াজীও সঙ্গে গেলেন এবং বিভাসকেও ডাকলেন। বিভাস গেল না, একা বসে রইল বাইরের দিকের ঘরটায়। বিভাসের কাছে সারা শহরের মধ্যে এই একটি মাত্র জায়গা যেখানে মনে হয়, হাওয়ায় বিষ নেই। তবু ভিতরে গেল না। কারও ভিতরের মহল, কারও অন্তরাল, এমনকি মালবিয়াজীরও, দেখবার আগ্রহ বিভাসের আর নেই। এখানেও যদি অন্তরালের পর্দা সরালে বিষাক্ত দাঁত বেরিয়ে পড়ে তাহলে আর কোথাও কোন আশ্রয় থাকবে না। বস্তুত, বিভাস ভাবল, তার নিজের মনেই বিষ।

ঘণ্টা তিনেক পরে বাগান ফটক পার হয়ে রাস্তায় এসে যখন নামল, ইন্দ্রাণীর হাতে একরাশ ফুল। সিভিল লাইন্স এখান থেকে অনেক দূর। তবু ইন্দ্রাণী খুশী খুশী গলায় বলল, 'হেঁটে যাব।' যেন কয়েক বছর আগের ইন্দ্রাণী। অথবা যেন কয়েকটা বছর আগেকার দিনগুলো এইমাত্র ফিরে পেল।

আজ আবার অনেক দিন পরে বিভাসের মনে পড়ল, একদা বড় লাজুক ছিলাম। একরাশ ফুল বুকের সঙ্গে চেপে রাস্তা দিয়ে এমন সগৌরবে হাঁটতে ইন্দ্রাণীর একটুও লজ্জা

করছে না, আশ্চর্য! রাস্তার সবাই পাশ দিয়ে চলে গিয়েও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। নিজেদের দর্শনীয় করতে বিভাসের আপত্তি।

'সত্যি হেঁটে যাবে? তোমার কষ্ট হবে না?'

'বলেছি তো, হেঁটে যাব।' ইন্দ্রাণী কয়েক বছর আগেকার মত হাসল।

রাস্তার দুপাশে মাঝে মাঝে বাংলো। প্রত্যেকটি বাংলোর সামনে বাগান। ঘেঁষাঘেঁষি না, টেগোর টাউনের মত না, এমনকি সিভিল লাইন্সের মতও না। এই সেই পুরনো শুকনো শহর। জন্ম থেকে দেখছে। তাদের চোখের সামনেই কত বদলে গেল। বন্ধুদের মুখে যে শহরের কথা শুনেছে তার তো বিক্ষিপ্ত চিহ্ন মাত্র এখন নজরে পড়বে। আমরাও কত বদলেছি। ইন্দ্রাণী হাঁটছে পাশে পাশে, অথচ কথা বলতে গিয়ে পিঠ থেকে বুকে আর বুক থেকে পিঠে বেণী আছড়াচ্ছে না। আমি আর দীর্ঘ পথ হেঁটে পার হতে চাই না। সত্যি কি চাই না। ফুলের বোঝার অজুহাত মিথ্যে। সত্যিই মিথ্যে কি না বুঝি না। আজও কি ইন্দ্রাণীর বুকের সঙ্গে চেপে ধরা একরাশ ফুলের রঙ চোখে মেখেও মনে হয়, সব ফুলের সব পাঁপড়ি প্ল্যাস্টিকের।

সামনে সেই হাজার ডালের বট, যে নাকি কখনও মরবে না। তার পিছনে শীতশীত অন্ধকার জমান সেনেট হল। কাঠের কারুকাজ, অজস্র মৃদু উজ্জ্বল রঙের কাচের জানলা। বিরাট ঘড়িটা সন্ধ্যেয় বাজে, তার ধ্বনি ক্রমবিলীয়মান তরঙ্গে হাওয়ায় মিশে যায়। অনেকক্ষণ শুধু কানের মধ্যের পরিমিত হাওয়ায় একটুখানি লেগে থাকে। কয়েক বছর আগেও এখানে বিশিষ্ট নেতাদের বক্তৃতা শুনেছে। তখন বক্তৃতার সময় মনে হত, বাতাস অস্থির, দেওয়ালগুলো কাঁপছে। এখানে এক সময় গানের আসর বসত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। একটা সকালবেলার জলসার স্মৃতি তার বাবার মনে এখনও বেঁচে আছে। মা বেঁচে থাকলে তাঁর মনেও কি সেই স্মৃতি বেঁচে থাকত। মা কি এসেছিলেন জলসায় বাবার সঙ্গে। মাকে নিয়ে কি তিনি বেরোতেন, যখন তখন। কতবার চোখ বুজে বিলাপের মত করে সেদিন সকালবেলার জলসার বিবরণ দিয়েছেন ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এনায়েৎ খাঁর সেতারে ভৈরবী গৎ নিয়ে সেদিন সকালবেলার শুরু। নাসিরুদ্দীন দগর উচ্ছ্বসিত হয়ে সেই রাগেই দীর্ঘক্ষণ এমন আলাপ করলেন যা নাকি এখনও এই শহরের কয়েকজন বৃদ্ধ ভুলতে পারেনি। তারপর এলেন হাফিজ আলি। স্বরোদে সেই ভৈরবী বাজালেন। শ্রোতাদের অন্য সব চেতনা লুপ্ত হল। অবশেষে ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ। সে নাকি সুন্দরের সারাৎসার। তার স্বাদ নাকি এখনও এই শহরের কয়েকজন বুড়োর মনে লেগে আছে।

কাছেই কোথায় যেন মাইক্রোফোনে সিনেমার একটা বাজিমাত করা গান বাজছিল। 'চাঁদি তুম্‌হারা, যোবন হামারা।' যৌবনকে যোবন বললে বেশ কড়া বেশ জমজমাট শোনায়। যাঁর রেকর্ড তিনি কোকিলকণ্ঠী, অর্থাৎ গলাটি কোন মসৃণ ধাতু দিয়ে তৈরি। দু'হাত দূর থেকে তিনটি ছেলের মধ্যে একজন তাদের লক্ষ্য করে, বিশেষত ইন্দ্রাণীর উদ্দেশে, সেই গানের থেকেও কড়া একটি শিস দিল, যাকে একালে বলা হয়—আওয়াজ দিল। সত্যি বলতে কি, খুশীই হল বিভাস। কী সব আজেবাজে এলোমেলো ভাবছিল। কত বছর পরে পাশে-পাশে হাঁটছে ইন্দ্রাণী। এখন তো শুধু ইন্দ্রাণীই ভাবনা জুড়ে থাকার কথা। ছেলেটার আওয়াজ ইন্দ্রাণীর দিকে বিভাসের চোখ ফিরিয়ে দিল।

ইন্দ্রাণীর মুখে ক্ষুব্ধ বিরক্তি। যতটা রেগেছে, জোর করে দেখাতে চাইছে তার থেকে বেশি।

বিভাস একটু শব্দ করে হেসে বলল, 'যেতে দাও। এবয়েসের ছেলেরা এসব একটু করেই।'

'কোথাও আর একবার চা খাওয়া যায় না?' বিভাস আবার বলল।

'এটা কি কলকাতা?' পাল্‌টা প্রশ্ন করল ইন্দ্রাণী।

'তার মানে?'

'তার মানে এখানে কি কলকাতার মত সব জায়গায় চা-খানা কফি-খানা ছড়িয়ে আছে? এখানকার ছেলেমেয়েদের দিনরজনী চায়ের দোকানে কাটে না।'

'কলকাতার আবহাওয়া বিষয়ে তুমি নিজেকে বিশারদ মনে কর?'

'অন্তত তোমার তুলনায়। আমি দু'বার সেখানে গিয়ে বেশ কিছুদিন করে থেকেছি।'

'বুঝলাম। তবে এখানেও চায়ের দোকানের সংখ্যা বাড়ছে। একটু হাঁটলে যেমন-তেমন একটা পেয়েই যাব।'

পাওয়া গেল। খুব অপরিচ্ছন্ন নয়, কারণ দোকানটা নতুন। কিউবিক্‌লে ঢুকতেই বেয়ারা এসে পর্দা টেনে দিল। বিরক্তি লাগল বিভাসের। পর্দা টেনে দেবার কী দরকার। আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, জানান হল না। টেবিলের ওপর একটা ফুলদানিতে কাগজের ঋতুপুষ্প। জানলার নতুন রঙ-করা কাঠে চুনের দাগ। পায়ের কাছে একটা বেড়াল, সাদা আর বাদামী, সুন্দর। যথেষ্ট চেষ্টা করেও কোলে তোলা গেল না।

'ইন্দ্রাণী তো চাকরি পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে।' চায়ের কাপে চামচে নাড়তে নাড়তে বিভাস হঠাৎ বলল।

শুধু একটু হাসল ইন্দ্রাণী। কিছু বলল না। বিভাসের মনে হল, আরও কিছু বলা দরকার। অকারণে কথা বলা দরকার। কথা না হলে বাতাস কেমন ভারী হয়ে ওঠে। আগে এমন হত না। আজ এতক্ষণ পরে ভাবল, ইন্দ্রাণীর চুল থেকে কি কোন গন্ধ আসছে। টেবিলের ওপর রাখা একরাশ ফুলে তো এমন গন্ধ নেই। হয়ত ইন্দ্রাণীর চুল থেকে এই কাঠের ঘরের স্বল্প পরিসরে কিছু তীব্র হয়েছে কোন মৃদু সুবাস। শরীর, শরীরের স্বাদ! না, শরীরের আবার স্বাদ কোথায়। শরীরের কোন স্বাদ থাকে না। নিজের হাতের আঙুলগুলো কী রুক্ষ! কড়ে আঙুলটা একটা বিরাট তালার মস্ত চাবির মত ঝুলছে।

ইন্দ্রাণী বলল, 'তুমি তো কোনরকম চাকরি একটা জুটিয়েছ। এবার কী করবে ভাবছ, বিভাস?'

বিভাস দারুণ চমকে উঠল, যেন অন্ধকারে দৌড়তে গিয়ে একটা রুগ্ন ঘুমন্ত কুকুরের পাঁজরায় পা রেখেছে। ঠিক এই কথা একদিন চায়ের দোকানে বসে বেগম তাকে বলেছিলেন। বিভাস বলতে যাচ্ছিল—তুমি ঠিক বেগমের মত কথা বলছ, ইন্দ্রাণী—বলল না। কী হবে বলে।

'আমার চাকরিটা তোমার কাছে হাস্যকর, কিন্তু আমার দৌড় এই পর্যন্তই।' বিভাস নিজেই একটু হাসল।

'একেবারে ভুল বুঝলে। তুমি তো সব সময় খুব চাপা। সব কথা নিজের মনে চেপে রাখা স্বভাব। হয়ত অন্য কিছু, বড় কিছু করার আশা লুকিয়ে রেখেছ। হয়ত সিভিল লাইন্স, এমনকি এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। তাই ওকথা বললাম। আমি তো জানি তুমি আমার গত কয়েকটা বছর ভুলতে পার না। তুমি যে খুব ভাল, তাই কথায়

আচরণে ঘৃণা প্রকাশ কর না।'

বিভাস চেয়ারটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'বিশ্রী সব কথা বলে মন তেতো করে দিও না। এস, বাইরে এস। এখানে দম আটকে আসছে।'

রাস্তায় নেমে দেখল, শুধু সেই ছোট কাঠের ঘরে নয়, বাইরেও কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আলো জ্বলছে রাস্তায়। ভিড় আরও বাড়ছে। সবাই তাকাচ্ছে তাদের দিকে। চলে গিয়েও ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। এত কী দেখার আছে। তাদের পোশাক সাধারণ, অন্য সবার মত, তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবার বয়েস নেই। তবে এত কী দেখার আছে। শুধু একরাশ ফুল। ফুল কি দেখার জিনিস, ফুল দেখে রাস্তার একজনও কি খুশী। নাকি ইন্দ্রাণীর হাতে ফুল দেখে সবাই দাঁত চেপে ব্যঙ্গের হাসি লুকোচ্ছে। ভাবছে, আমরা দুটো শিশু, আমাদের গায়ে এখনও নখের আঁচড় লাগেনি।

আসলে হয়ত আমার ভুল। সবাই হয়ত বিশেষভাবে তাকাচ্ছে না আমাদের দিকে। বস্তুত তেমন করে তাকাবার কোন কারণ নেই। এমনিই হয়ত চোখ পড়ছে, যেমন রাস্তায় বেরোলে লোকজনের দিকে এমনিই চোখ পড়ে। আমি এত আত্মসচেতন তাই এই সব ভাবছি। আমি নিজেকে দর্শনীয় করতে চাই না বলা ঠিক নয়, বলা উচিত আমি নিজেকে ঢেকে রাখতে চাই, অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চাই।

ইন্দ্রাণী বলল, 'তুমি তো আজ কাল দু'দিনই ছুটি পেলে?'

'হ্যাঁ, কালও স্কুলে যেতে হবে না।'

'দুপুরের পর বেরোবে?'

'না।'

'আমি আসব।'

বিভাস মনে মনে বলল, এস। কথাটা উচ্চারিত হল না। গলায় প্রচুর উৎসাহের ঝাঁজ এনে বলা উচিত ছিল, এস, নিশ্চয়ই আসবে, আমি ঘরেই থাকব। কিন্তু কিছু বলা হল না। গলার ঝাঁজ মরে গেছে। কোনদিন ছিল কি না অনিশ্চিত। মুশকিল হয়েছে সবই কেমন জলের মত, বড় তাড়াতাড়ি দাগ শুকোয়। আজই সকালে মনে হয়েছিল, তার ছোটঘরে ইন্দ্রাণীর সামান্য দূরে বসে থাকার কী এক বিচিত্র স্বাদ আছে।

বাড়ি ফেরার একটু পরে বিভাস খেতে বসে শুনল, বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণি তাদের বাড়ি বউ হয়ে আসছেন। সব ঠিক হয়ে গেছে, আর মাত্র দু'মাস বাকী। এ খবর শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিছু নতুন মনে হল না। বিতোষ, বলা বাহুল্য, বাবার সামনে তার মনোভাব প্রকাশ করবে না। তাহলে বাড়ির মধ্যে একমাত্র বিভাসের এই খবরে উল্লসিত হওয়ার কথা। বিভাস হাসিহাসি মুখে নানাবিধ ছেলেমানুষি কথা বলেও বুঝল, ঠিক জমছে না, যেন দলবেঁধে বেড়াতে বেরিয়ে পা কেটেছে নতুন জুতোয়, হাঁটতে পারছে না। তাছাড়া আরও যে একটি খবর শুনল সেটাই আসলে নতুন। বিতোষ কলকাতায় কোথায় যেন কেমিস্টের চাকরি পেয়েছে। বিয়ের পরই এখান থেকে চলে যাবে। এতদিনের মরানদীর পর তার আর বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণির ব্যাপারটায় যে হঠাৎ এই স্রোত এসেছে, কলকাতার চাকরিই তার কারণ।

সুতরাং স্বল্পকালের মধ্যে এই পুরনো একতলা বাড়িটায় একবার রঙটঙ হবে,

কাগজের মালা আর বেলুন ঝুলবে, নানা রঙের আলো জ্বলবে-নিভবে, সন্ধ্যেয় নিমন্ত্রিতরা যে আনন্দ অনুষ্ঠানে আসবেন তার একটা ইংরেজি নাম দেবেন সবাই, বলবেন—রিসেপসন। বিতোষ আর বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণি একসঙ্গে একটা মস্ত কেক কেটে বিলোবে। আগেই বিভাসকে এই মর্মে শক্ত কাগজে নির্দেশ লিখে ভাঙা স্নানঘর ইত্যাদির দরজায় ঝোলাতে হবে যে, বিভিন্ন কার্য সমাপনান্তে দয়া করে জলটল ঢালবেন। কারণ সেদিন সন্ধ্যের অনুষ্ঠানের আগেই তো অনেকে এসে এবাড়িতে দু'তিন দিন থাকবেন।

বিতোষ চলে যাবে এবং তারপর এই ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা পুরনো একতলা বাড়ি আরও শূন্য মনে হবে। বিভাস থাকবে আর থাকবেন ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। দুজনের মধ্যে হয়ত সারা দিনে একটাও কথা হবে না। বিভাস বাড়ির পিছনটায় না গেলে হয়ত দেখাই হবে না। বিতোষের সঙ্গেও বাবা বিশেষ কথা বলতেন না। যেটুকু সামান্য গল্প তিনি করতেন তা বাঙলা স্কুলের সেঝ দিদিমণির সঙ্গে। বিকেলে মাঝে মাঝে সামনে চা নিয়ে বসে গল্প হত। অবশ্য কয়েক বছর আগে বিভাস বাবার বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। এখন কি আবার তেমন হয় না। দেওয়ালে ঝোলান সেতারের সাদা ফুল তোলা নীল ঢাকনাটার দিকে বিভাস তাকিয়েছিল। বিতোষ এখান থেকে চলে গেলে আবার কি আগেকার মত বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না।

বার

বাইরে বৃষ্টি। বেরোবার উপায় নেই। উপায় হয়ত আছে, ইচ্ছে নেই। সকাল থেকে এমন বৃষ্টি হতে থাকলে বাইরে যাবার ইচ্ছে হয় না। বই নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকার দিন গেছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ ফোলানর অভ্যেস গেছে, ইদানীং দিনের বেলা ঘুম আসতে চায় না। এই ছোট ঘর, বাড়ির মধ্যে এই সব থেকে ছোট ঘর, আর বাইরে বৃষ্টি। পনের দিনে ন্যাড়া কাল ছাত শ্যাওলায় সবুজ, পিছন দিকের বাগান খুব তেজী হয়ে উঠেছে।

উকিলবাবুর মেয়েটা একঘণ্টা হল এই ছোট ঘরে একখানা বইয়ের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। উঠবার নাম নেই। এই বৃষ্টিতে চলে যেতেও বলা যায় না। এই কম বয়েসী মেয়েটা, যার নাম জবা, বড় জ্বালায়। কেমন করে ওকে বোঝাব ইতিমধ্যেই আমি উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছি, রস-নিংড়ে-নেওয়া আখের সাদা ছিবড়ের স্তূপের মধ্যে আমার ছিবড়েটাও ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়। মেয়েটা নিশ্চয়ই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মক্‌শ করে দেখেছে ঠিক কোন্ মুখভঙ্গীতে ওকে সব থেকে ভাল দেখায়। যখন তখন আসবে, চোখে ঠোঁটে অবিশ্বাস্য মোচড় দিয়ে বলবে—'আজ আবার আপনার একটা বই নেব।' যেন আমি গ্রন্থাগারিক আর আমার এই ঘরে থরে থরে মুখরোচক বই সাজান আছে।

বিজয়প্রতাপ জবার বাবা উকিলবাবুর কাছে তাদের বাড়িটা বেচে দিয়েছিল। তখন থেকেই উকিলবাবু সপরিবারে ওবাড়িতে রয়েছেন। জবারা আসার পর ওবাড়িতে বিভাস কখনও গিয়েছে মনে পড়ে না। অথচ ওরা প্রায়ই এখানে আসবে, এমনকি বাড়ির পিছন দিকে বাবার এলাকায়ও হানা দেবে। আর জবা সবে সেই দুঃসহ বয়েসে পৌঁছে এমনভাবে বিভাসের ঘরে এসে দাঁড়াবে যেন বিভাস তার ক্রীতদাস। এই মেয়ে কয়েকমাস আগে কোন্ এক দাদার সঙ্গে লুকিয়ে বোম্বাই চলে গিয়েছিল। অভিনেত্রী হবে ভেবেছিল। দিন দশেক পরে আবার ফিরে এসেছিল। একদিন এই নিয়ে সোরগোল হয়েছিল সত্যি,

তারপর চাপা পড়ে গেছে। এসব নিয়ে একালে কারও আর বেশি মাথা ঘামাবার অবকাশ নেই। জবার বয়েসে ইন্দ্রাণী কি এমন ছিল। দেখে মনে হয়, জবা কখনও ভুলতে পারে না, এমনকি ঘুমিয়েও ভুলতে পারে না, তার নিজের দুঃসহ শরীরের দাম। এই বয়েসে ইন্দ্রাণী কি এমন ছিল। সেই সব দিনে বিভাসের কখনও তেমন কিছু মনে হয়নি।

জবা বইয়ের খোলা পাতায় চোখ রেখে পড়ে আছে। একবার ভুল করেও মুখ তুলছে না। অর্থাৎ ইচ্ছে করে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ভাবছে, বিভাস তার শরীরের ডৌল দেখছে। হায়রে, কী ভেবেছে আমাকে! কিন্তু সত্যি এতক্ষণ কোথায় তাকিয়ে আছি। কেন মনে হল, জবার এই বয়েসের শরীর ঢেউয়ের মত, ঢেউয়ের মত। কেন ইন্দ্রাণীর এই বয়েসটা মনে এল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে নিজের হাতের একটা আঙুলের ওপর দুসারি দাঁত জোরে চেপে ধরল বিভাস। কেমন অস্পষ্ট ঘৃণা হল নিজের ওপর।

বৃষ্টি থামলে জবাকে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। যেন অনিচ্ছায় চলে গেল জবা। যাবার সময় বইটা নিয়ে গেল। বাড়ির পিছনে এসে বিভাস দেখল, বাবা বাগানে নেই। হয়ত ঘরে শুয়ে আছেন। বিভাস বাগান থেকে একগোছা রজনীগন্ধা তুলে নিয়ে বাইরে রাস্তায় এল। জবারা তাদের বাগানটা সংস্কার করেছে। দেখে মনে হতে পারে, সেই বিবর্ণ সিংবাড়িটা এখন কোন বিত্তবানের বাসস্থান। তার উল্টো দিকে নবাব খানের বাগানটায় এখন আর যত্নের লক্ষণ নেই। তবু বৃষ্টির ঋতুতে বাংলো পর্যন্ত ঘন সবুজ।

স্ট্রেচি রোডের কাল অ্যাসফল্ট বৃষ্টিতে ভিজে আরও কাল। রাস্তায় একটিও লোক নেই। একরাশ রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে হাঁটতে অস্বস্তি হল না, ফুলগুলো গায়ের বর্ষাতির মধ্যে লুকোতে হল না।

রাজাপুর কবরখানায় যখন পোঁছল, আবার টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। তার সঙ্গে শীত-শীত দমকা হাওয়া। এই ছোট বিনীত কবরখানায় আজ এখন কেউ নেই। বৃষ্টি আর হাওয়ার গমক থাকলেও ইট-সাজান সরু পথে বিভাসের ভারী জুতোর শব্দ খুব স্পষ্ট। তার মা'র কবর বাঁ দিকের এক প্রান্তে। নিজের পায়ের জুতোর শব্দে নির্জনতা আরও বেশি করে ইন্দ্রিয়সংবেদ্য হল।

মা'র কবরের পাশে উবু হয়ে বসল। বর্ষাতিটার দুপাশের ঝুলন্ত কোণ জোরে টেনে গুঁজে দিল কোলের মধ্যে। ফুল রাখার পাত্রটা কাত হয়ে পড়ে আছে। ওপরের পাতলা অংশ ভেঙে গেছে খানিকটা। ফুলদানিটা সোজা করে কিছু জল ফেলে দিয়ে রজনীগন্ধার গোছা ভিতরে বসিয়ে দিল। হাত সরিয়ে নিতেই হাওয়ার ঝাপটায় পড়ে গেল কাত হয়ে। আবার সোজা করে রাখল, পড়ে গেল আবার। তখন রজনীগন্ধার লম্বা ডাঁটিগুলো দাঁত দিয়ে কেটে কেটে খুব ছোট করে দিল। আর কাত হয়ে পড়ল না ফুলদানিটা। হাঁটু কোমর টনটন করছিল। উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টির বড় বড় ফোটা পড়ছে, হাওয়া যেন আরও ক্ষেপে গেল।

মা কতকাল আগে এই শহরে ক্রিশ্চিয়ানদের কী এক সম্মেলনে প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন ব্রহ্মদেশ থেকে। সদ্য ডাক্তারি পাশ করে আসা জিতেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেখানে তাঁর প্রথম দেখা হয়েছিল। মা বোধহয় একটু লাজুক ছিলেন। এসব গল্প বলার সময় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতেন না।

জুতোর ওপর একটা বুনো পোকা উঠেছে। বিভাস শুধু দেখল, একটুও নড়ল না। আমি এখনই তো বাড়ি ফিরে যাব। আমার কাজ শেষ হল। শেষ হল? আরও কত বছর

এই কবরখানা থেকে এমন বাড়ি ফিরে যেতে পারব?

আমাকে এখানে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকতে কেউ তো আর দেখছে না। দেখলে ঠোঁট মুচড়ে বলতে পারত—ছেলেমানুষি, বলতে পারত—ন্যাকামি। একটা গাছের মত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন হয়। পা ধরে যাওয়ার, টনটন করার কোন মানে হয় না। সেনেট হলের সামনের বিপুল বটগাছটা নাকি কোনদিন মরবে না। তাহলে তো বলতে হয়—বটগাছটার সেই অনিবার্য বন্ধু নেই যে চিরকালের সঙ্গী। আমার বর্তমান মোটেই স্বচ্ছ না, তবে অতীত আর ভবিষ্যতের পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখতে পাই। যখন জন্মেছিলাম তখনই মৃত্যুর কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছি। জানি, ভবিষ্যতে সেই চিরকালের সঙ্গীই থাকবে, একমাত্র যার আন্তরিকতা নিখাদ।

আমি বুঝেছি, ভাল চাকরি আমার জন্যে না। চেষ্টা করি না পাব না বলে। পাশটাশ করেছি সত্যি, কিন্তু কখনও অসাধারণ ছাত্র ছিলাম না। এক সময় বই আমার আশ্রয় ছিল। এখন বই ভালবাসি না। আমার উচ্চাশা নেই, আমার ভালবাসা নেই। আমি কি পরগাছা। পরগাছারও তো আশ্রয় থাকে। আমার বর্তমানের চেহারা আমি দেখতে পাই না। অন্য কেউও আমাকে স্পষ্ট করে দেখাতে পারে না। আমার মনে বিষ। আমার মনে শুধু বিকৃতি। আমার বিকৃতি কি অনন্য। বৃষ্টি পড়ছে। এখনই কি বাড়ি ফিরে যাব।

কে যেন বিভাসকে ডাকল। ফিরে দেখল, ইন্দ্রাণী। কবরখানার ফটকের ওপরের গীর্জার চুড়োর মত কারুকাজ করা কাঠের সংক্ষিপ্ত ছাউনির তলায় ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সামনে সব যেন পাক খেয়ে ঘুরে গেল। ইন্দ্রাণী এখানে কেন। এত দূরে এই রাজাপুর কবরখানার ফটকে ইন্দ্রাণীর দাঁড়িয়ে থাকা অভাবনীয়।

এগিয়ে এসে বিভাস বলল, 'তুমি এখানে!'

'এলাম।'

'এলাম মানে?'

'তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?'

'মনে হচ্ছে গোয়েন্দার মত আমার পিছু নিয়েছ। ভাবলে হাসি পাচ্ছে।'

'তোমাকে একরাশ ফুল নিয়ে বেরোতে দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিলাম। তুমি কোথায় যাবে বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম রাস্তায় তোমাকে ধরব, ধরতে পারলাম না; তুমি এত জোরে হাঁটছিলে।'

'আমাকে রাস্তায় ধরার কী দরকার? আমার ঘরে আস না কেন?'

'ক'দিন তো তোমাকে বাড়িতে দেখছি না। আজ সকাল থেকে কিছুতেই সময় কাটছিল না। যতবার দূর থেকে তাকিয়েছি, জানলা দিয়ে দেখি তোমার ঘরে জবা। ওই খুকিটা এমন জমে গেল কেন তোমার ঘরে?'

বিভাস বলতে যাচ্ছিল—'তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি'—বলা হল না। এমন কথা ইন্দ্রাণীকে বলা যায় না। এমন কাঁচা রসিকতা ইন্দ্রাণী সহ্য করবে না।

ইন্দ্রাণী আবার বলল, 'এই পর্যন্ত এসে দেখি তুমি তোমার মা'র কবরের পাশে। আর এগোই নি। তোমাকে একা থাকতে দিলাম।'

'ইন্দ্রাণী জান, মরে যাওয়া মা'র জন্যে এই ঝড়বৃষ্টিতে এমন উৎসাহ দেখালে লোকে আমাকে ন্যাকা বলবে?'

'কে বলবে? বিজয়প্রতাপ?'

'শুধু বিজয়প্রতাপ কেন? আরও অনেকেই বলবে। আসলে কিন্তু উৎসাহটা মা'র জন্যে না, আমার নিজের জন্যেই। আমারও কিছুতেই সময় কাটছিল না। সবাই সব কিছু একমাত্র নিজের জন্যেই করে।'

'বুঝলাম। এখন ফিরবে তো?'

'ভাবছি, এখন ফিরব কী করে?'

ইন্দ্রাণীর গায়ে বর্ষাতি নেই। একটু ভিজেছে। বৃষ্টি থামে নি, হাওয়া গর্জাচ্ছে। এতটুকু জায়গায় দাঁড়িয়েছি, মাথার ওপর কৃপণ ছাউনি আছে, যদিও ছাট আসছে বৃষ্টির। এতক্ষণ আর কেউ এদিকে আসে নি। সিভিল লাইন্স যথেষ্ট দূর। আবহাওয়া রীতিমত নাটকীয়। দৃশ্যটা বেশ রসঘন।—কত তাড়াতাড়ি বদলে গেলাম। ক'বছর আগেও যমুনা ব্রীজে শেষ রদ্দুরের রঙ দেখে চোখে দিগন্তদৃষ্টি আসত। আজ এখন যমুনাব্রীজ বৃষ্টিতে ভিজছে। বর্ষাতিটা খুলে কপাটে ঝুলিয়ে রাখল বিভাস।

ইন্দ্রাণী শাড়ির কোণ দিয়ে মুখ মুছল। আঙুলের ঘা দিয়ে দিয়ে ঝেড়ে ফেলল রুক্ষ চুল থেকে বৃষ্টির বিন্দু। শীতে কাঁপছে নাকি। আমি কী করতে পারি। বর্ষাতিটা কি ওকে দেব। নেবে না, ঠিক জানি নেবে না। ইন্দ্রাণীর এখানে আসার কোন মানে হয় না। বৃষ্টি মাথায় করে কেন এল। এখন ফিরে যেতে হবে। ইন্দ্রাণীকেও ফিরে যেতে হবে। আরও কতকাল কবরখানা থেকে বাড়ি ফিরে যেতে পারব?

ইন্দ্রাণী রাস্তায় নামবার কোন লক্ষণ দেখাল না। বলল, 'মালবিয়াজীকে বলেছি আমাকে অন্য কোথাও একটা চাকরি দিতে। আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

'কেন?'

'এখানে আমি থাকতে পারছি না।'

'কেন থাকতে পারছ না?'

'পারা যায় না, বিভাস। সবার করুণা, সবার ঘৃণা কুড়িয়ে থাকা যায় না।'

'তুমি রাগের কথা বলছ। মা আমি যুদ্ধে যাব-র মত কথা বলছ।'

'হেসো না।' ইন্দ্রাণীর স্বর তীব্র হল। 'আমার ধারণা আমাকে নিয়ে হাসা অন্তত তোমার মানায় না।'

'কী সব বলছ, ইন্দ্রাণী। আমি হাসি নি, বিশ্বাস কর, হাসি নি।'

'তুমি মনে মনে হাসছ। তুমি ভাব আমি যে এমন হয়ে গেলাম এর জন্যে তোমার কোন দায় নেই? তুমি কিছু করনি আমার? তোমার দেখা পাই না। তুমি আমাকে এড়িয়ে যাও। এত ঘৃণা কর তুমি আমাকে!'

'বারে বারে এই মিথ্যে তুমি কেন বল? তোমাকে ঘৃণা করি না। তোমাকে কেন ঘৃণা করব?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রেলিংয়ের গায়ে ইন্দ্রাণীর জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাতের ওপর বিভাস হাত রাখল। তার নিজের হাতও কাঁপছিল। কোনদিন একটি মেয়ের হাত ছোঁয় নি। এত সরল সাধারণ কাজ এত কঠিন কেন। চাপা চাপা গলায় বলল, 'কখনও তোমাকে ঘৃণা করি নি, কোনদিন না!'

'আমি পারব না!' ইন্দ্রাণীর চোখ চিকচিক করে উঠল। 'একটা চাকরি নিয়ে এতগুলো বছর কাটিয়ে দিতে আমি পারব না।'

বিভাস কী বলতে পারে। যদি বলি—আমি এই ক'বছরে একেবারে বদলে গিয়েছি, আমার বর্তমানের চেহারা আমি দেখতে পাই না, কেউ আমাকে স্পষ্ট করে দেখতেও পারে না, জন্মানর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছি, আমার ভবিষ্যৎ সেই চিরকালের বন্ধুর জন্যে এক দীর্ঘ প্রতীক্ষা ছাড়া আর কিছু না, আমার কোন আশা নেই, আমার ভালবাসা নেই, তাহলে কি ইন্দ্রাণী স্বস্তি পাবে। আমি ওকে আশ্বস্ত করতে চাই কেন। আমি কি ওকে খুশী করতে চাই।

'আমার আর কিছু নেই।' ইন্দ্রাণীর গলায় কান্নার স্বর। 'আমি পুড়ে ছাই! ছোটবেলা থেকে আমি তোমাকে দেখেছি, সারা জীবন তোমাকেই দেখার কথা। কিন্তু আমাকে সময় দেওয়া হল না, নিজেকে বুঝবার অবকাশ দেওয়া হল না। যখন বুঝলাম, দেখলাম বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। এখন আমি কী করব! শুধু একটা চাকরি নিয়ে এতগুলো বছর কাটিয়ে দিতে আমি পারব না।'

বিভাস যেন না জেনে, হয়ত বা জেনে, ইন্দ্রাণীর হাতে কঠিন চাপ দিচ্ছিল। জলে ভেজা ঠাণ্ডা নিরক্ত হাত। ইন্দ্রাণী আরও কাছে ঘন হয়ে এসে দাঁড়াল। এমন যে হতে পারে, এমন যে হবে, বিভাস ভাবে নি। অথচ শরীর, শরীর, শরীরের স্বাদ। এই বয়েসে এই মনেও কি শরীরের স্বাদ থাকে, এমন অসহ্য জ্বালা করা যন্ত্রণার স্বাদ! বৃষ্টি কমছে, এখন অনেক কম। ইচ্ছে করলে বেরিয়ে পড়া যায়, ফিরে যাওয়া যায় পুরনো একতলা বাড়িটায় যার কাল ন্যাড়া ছাত শ্যাওলায় সবুজ। ইন্দ্রাণীও ফিরে যেতে পারে নবাব খানের গুহায়। ফিরেই তো যাব; এখনও আরও কিছুকাল কবরখানা থেকে বাড়ি ফিরে যাব। কিন্তু শরীর, শরীর কি আমার মত পরগাছার, আমার মত উচ্ছিষ্টেরও আশ্রয়। শরীরে কি নিজেকে ঢাকা যায়, শরীর কি অন্ধকার।

তের

পকেটে এক গাদা নিমন্ত্রণপত্র। পকেটটা বেশ ভারী হয়েছে। তবু তো প্রায় তিরিশ খানা ফেলে এসেছে ডাকবাক্সে। এখন একটু হালকা হবার কথা। আর এক পকেটে সিগারেটের প্যাকেট। ইদানীং সিগারেট ধরেছে বিভাস। কার্ডখানা বেশ ছাপা হয়েছে। একপাশে বাংলা, একপাশে ইংরেজি। বিভাস বাংলা আর ইংরেজি দু'রকমের নিমন্ত্রণপত্র ছাপাতে চেয়েছিল। বিতোষ রাজী হল না। বলল, 'বেশি বাহানায় কাজ নেই।' আহা, ভাঙা বাড়িতে তো খুব রঙচঙ লাগান হল। অবশ্য বিতোষ তো এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। কার্ডটার দু'পাশেই বাবার নামের সঙ্গে মা'র নাম ছাপা হয়েছে। কেমন বিচিত্র লাগে। কতকাল পরে মা'র নামটা চোখের সামনে দেখতে পেল।

এখনই কাছের কয়েকটা বাড়ি ঘুরে আসতে হবে। নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে আসতে হবে।

সিংবাড়ির পরিচ্ছন্ন বাগানের পাশ দিয়ে বিভাস বারান্দায় উঠল। সামনে উকিলবাবুর চেম্বার। উকিলবাবু বসেই ছিলেন, তবে আরও লোক ছিল ঘরে। বিভাস এক কোণের একটা চেয়ারে সবিনয়ে বসল, তার আগমনের উদ্দেশ্য জানাল, একখানা চিঠি বাড়িয়ে দিল উকিলবাবুর হাতে। একটু বসতেই, একটা দু'টো কথা হতেই, উকিলবাবু জবার মা'কে ডাকলেন। জবার মা দরজা পর্যন্ত এসে বিভাসকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বিভাস ভিতরে যেতে চায়নি, বরং বেশ তীব্র অনিচ্ছা ছিল, তবু যেতে হল।

ভিতরে আসতেই জবা তাকে প্রায় লুফে নিল। তার মা'কে পাঠাল রান্নাঘরে, চায়ের

ব্যবস্থা করতে। সকাল থেকে বিভাসের চারবার চা হয়ে গেছে। তখন আর চায়ে রুচি ছিল না, বরং বেশ তীব্র অনিচ্ছা ছিল, তবু খেতে হবে। সেই ঘরে তাকে নিয়ে এল জবা, বিজয়প্রতাপের ঘরে।

জবা বলল, 'একটা বইয়ের বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করব, সেই বইখানা যার নাম—অশ্রুর ঋতু।' খুব মুরুব্বির মেজাজ জবার। 'বইখানা ভালই লাগল, তবে শেষটায় আমার আপত্তি। শেষ পরিচ্ছেদটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আপনার সব মনে আছে তো? আপনারই তো বই।'

'আলোচনা আর একদিন হবে। আজ আমি কত ব্যস্ত নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

জবা ঠোঁটে চোখে মোচড় দিল। 'কী এমন রাজকার্য পড়ে আছে আপনার! দু'এক জায়গায় কার্ড দিতে যাবেন, এই তো?'

'এখন সত্যি আর মাত্র দু'জায়গায় যাব।' বিভাস শিশুর মত হাসতে চেষ্টা করল। 'কিন্তু দুপুরের পর থেকে অনেকের বাড়ি যেতে হবে। রেভারেন্ড আয়ার, পণ্ডিত ঝা, মালবিয়াজী, বিজয়প্রতাপ, আমার স্কুলের তিনজন সহকর্মী—সবার বাড়ি যেতে হবে।'

জবা রাগ দেখিয়ে অস্থির পায়ে একবার সারা ঘর ঘুরে এল। বেরিয়ে গিয়ে তখনই ফিরে এল এক কাপ চা নিয়ে। শুধু চা, বিভাস দেখল, আখরোট কিসমিস নেই। আখরোট কিসমিস এই ঘরের অনিবার্য অনুষঙ্গ। জবা মেয়েটি বেশ, যেন চর্বির বড়া, কিন্তু কী হবে, আমাকে এমন করে দেহের ঢেউ দেখিয়ে কী হবে। আমি আরও ভুলে যাব, এই মুহূর্ত একেবারে ভুলে যাব। আমি হয়ত এই ঘরের মেঝেয় ভাঙা কাচের গ্লাসের ধারাল টুকরো খুঁজে দেখব। এই সেই ঘর যেখানে বিজয়প্রতাপ আর ইন্দ্রাণী প্রথম ডুব দিয়েছিল অন্ধকারে।

চায়ে একবার দু'বার মুখ দিয়ে জিভ পুড়িয়ে বিভাস তাড়াতাড়ি বাইরে এল, বারান্দা বাগান পার হয়ে রাস্তায় নামল।

এর পর সব থেকে কাছের বাড়িটা উপাধ্যায়জীর। পাঁচ মিনিট হেঁটে পৌঁছে গেল। বারান্দার গায় গোলাপের ঝাড়, তার পাশেই একটা দড়ির খাটিয়া উলটে রেখেছে রোদ্দুরে। উপাধ্যায়জীর একটা ছেলে একখানা সাইকেল সম্পূর্ণ খুলে ফেলে তেল মাখাচ্ছে, খটাং খটাং করে হাতুড়ি পিটছে মাঝে মাঝে। বাইরের দিকের ঘরটায় এসে বসে সেই দিকে তাকিয়ে রইল বিভাস। মুখ ফিরিয়ে দেখল, মাথার ওপর টালির ছাতের তলায় চুন-কাজ করা মোটা কাপড়ের আস্তর, কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে টালি দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে একটি বাচ্চা তাকে দেখেই দৌড়ে ভিতরে গেছে, কলকণ্ঠে ঘোষণা করছে তার আগমনবার্তা, এখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এই শহরের ভাষায় এই বাড়ি উপাধ্যায়জীর দৌলংখানা। বিভাসের প্রায়ই মনে হয়েছে, এই শহরের অনেক বাদশাহী কথায় বিদ্রূপ মেশানো। এই ঘর, যার মেঝেয় সিমেন্ট নেই, যার ঠিক মাঝখানে একটা নড়বড়ে চেয়ার আর পাশে একখানা ছোট নিচু সরু বেঞ্চ আর এক কোণে একটা দড়ির খাটিয়া, এই শহরের ভাষায় উপাধ্যায়জীর দরবার।

উপাধ্যায়জী এলেন, সঙ্গে এল তিনটি নোংরা ছেলেমেয়ে, তাদের মা দরজার আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। বিভাস উপাধ্যায়জীর নাম লেখা চিঠিটা বেছে রেখেছিল, এখন এগিয়ে দিল। বাড়ির সবাইকে নিয়ে যাবার অনুরোধ জানাল। খুশীতে রঙ বদলে গেল উপাধ্যায়জীর মুখের। আবোল তাবোল অনেক কিছু বললেন। তাঁর সব কথার একটিই মানে—ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উৎসব, এর থেকে আনন্দের খবর আর কী আছে!

বিভাস উঠল। উপাধ্যায়জী তাকে বারান্দার এক কোণে টেনে নিয়ে এলেন। মনে হল,

বিশেষ কিছু বলবেন। কিন্তু শুধুই একটা হাত ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ।

'কিছু বলবেন?' বিভাসকে জিজ্ঞেস করতে হল।

'বলব, বলতে হবে। বড় লজ্জা করে। দু'দিন পরেই তো যেতে হবে ডাক্তারবাবুর ওখানে। কিন্তু আমি কেমন করে যাব? আমার হাতে একটিও টাকা নেই।'

'আমাদের বাড়ি যাবেন তার জন্যে টাকার কী দরকার?'

'তুমি বুঝতে পারছ না, বিভাস। একটা কিছু হাতে করে তো যেতে হবে।'

'কিছু নিয়ে যেতে হবে না আপনাকে। আপনি শুধু বাড়ির সবাইকে সঙ্গে করে আসবেন।'

'ছিঃ, তা কখনও হয়!—তুমি আমাকে দশটা টাকা ধার দাও বিভাস। এখন তো চাকরি করছ। আমি দু'মাসে ফিরিয়ে দেব।'

কী মুশকিল! বড় বিশ্রী লাগে। এমন আবহাওয়ায় দম আটকে আসে। আজকাল তো এই শহরে সব সময় ডলারের গন্ধ, হাওয়ায় ডলার উড়ছে। উপাধ্যায়জী কুড়িয়ে নিতে পারেন না? যমুনার ওপারে একটা বিরাট কৃষি বিদ্যালয় আছে, সেখানে থরে থরে ডলার সাজান। উপাধ্যায়জী তুলে আনতে পারেন না? পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব, লাইব্রেরী, সংস্কৃতির খাসমহল গজিয়ে উঠেছে, সেখানে নাচ গান ঢালাও ইয়াংকি আদবকায়দা। সেই সব জায়গায় নাক গলালে উপাধ্যায়জীর পকেটে কিছু আসে না?—নিজের নির্বোধের মত বেতাল ভাবনায় বিভাসের হাসি পেল। রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে সব গুলিয়ে গেছে। কোথায় ডলার আর কোথায় উপাধ্যায়জী!

'পাঁচটা টাকা রাখুন।'

'না বিভাস, পাঁচ টাকায় হবে না। উপহার কেনা ছাড়া আরও দরকার আছে।'

দশ টাকাই দিতে হল। একটা ময়লা ফ্রকপরা মেয়ে প্লেটে দুটো বরফি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। উপাধ্যায়জীর আচরণে রাগ হয়ে যাবার কথা। তবু একটা বরফি তুলে নিল। মেয়েটার দৃষ্টি আশ্চর্য করুণ। জল না খেয়েই বেরিয়ে পড়ল। বরফিটা দাঁতে জিভে জড়িয়ে গেছে। বড় বেশি মিষ্টি, চিনি চিনি শুধু চিনি, উপাধ্যায়জীর কাঁচাপাকা দাড়িতে ছাওয়া লজ্জিত মুখের মত!

খুব কাজের লোকের মত হনহন করে হেঁটেও বাগচীবাড়ি পৌঁছতে আরও সাত আট মিনিট লাগল। তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেরা দরকার। বিকেলে আবার কতকগুলো জায়গায় যেতে হবে, বিশেষ করে বিজয়প্রতাপের বাড়ি। বিনীতাকে ভাল করে না বললে হয়ত আসবে না।

বাগচী বাড়িটার দিকে তাকালে দেওয়ালের ফাটলে চোখ আটকে যায়, কেমন গা সির-সির করে, মনে হয় এখনই ভেঙে পড়বে। অথচ বাড়িটার আদলে এককালের ঐশ্বর্যের ছাপ আছে। সেই এককাল অবশ্য দুর্লক্ষ্য দূর। এই বাড়িতে একটা মেয়ে ছিল, বিভাসের বয়সী। তার নাম ছিল অমিতা। ছোটবেলায় অমিতার খুব অস্থির স্বভাব ছিল। যখন তার বিয়ের বয়েস হল, হয়ে প্রায় পার হয়ে গেল, তখন একেবারে স্থানুর মত হয়ে গেল মেয়েটা। তিন সপ্তাহের টাইফয়েডে যখন মরল অমিতা, বিভাসের মনে হয়েছিল—বাগচী বাড়ির দেওয়ালের অজস্র ফাটল দিয়ে বিলম্বিত স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, সবাই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে হয়েছিল, মেয়ের বিয়ে দিতে হল না, বাগচীমশাই কয়েক বছর বেশি বাঁচবেন। সবাই

যখন কাঁদছে, তখনই এমন নোংরা ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বিভাস। পরে এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছে যে তার ভুল হয়েছিল, অমার্জনীয় ভুল হয়েছিল।

অনেক দিন পরে সেই বাড়িতে এল। বেশিক্ষণ বসবার সময় ছিল না। নাম লেখা নিমন্ত্রণপত্রখানা বাগচীমশাইয়ের হাতে দিয়ে বিভাস চলে আসছিল, কিন্তু তিনি তাকে উপাধ্যায়জীর মত একপাশে টেনে নিয়ে গেলেন। ছোট ছেলের মত আব্দেরে গলায় বললেন, 'আমি কেমন করে যাব, বিভাস?'

'কেন?'

'আমার যে একটাও উপযুক্ত পোষাক নেই।'

'যা আছে তাই পরে যাবেন।' বিভাস হেসে ফেলল। 'আমাদের বাড়ি যাবেন তার আবার উপযুক্ত পোষাক!'

'ছিঃ, তা কখনও হয়! আমার একটা সম্মান আছে। তাছাড়া আমার যে বেরোবার মত প্রায় কিছুই নেই।'

বিভাস তখনই বলার মত কথা খুঁজে পেল না।

বাগচীমশাই আবার বললেন, 'শোন, তোমার বাবার একটা পুরনো স্যুট লুকিয়ে আমাকে এনে দেবে একদিনের জন্যে?'

'বাবার পুরনো স্যুট আমি কোথায় পাই বলুন? সম্ভবত নেই, থাকলেও মা'র ঘরে আছে। সে ঘরে আমরা ঢুকি না, সব সময় তালা বন্ধ থাকে, চাবি বাবার কাছে।'

'তা হলে এখন কী করি? দু'দিনের মধ্যে কী ব্যবস্থা করি আমি? না গেলেও তোমার বাবা দুঃখ পাবেন।'

বেলা বাড়ছিল। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বিভাস বলল, 'একটু বেশি রাত্তিরে একবার আসবেন। দেখি কিছু করা যায় কিনা।'

নবাব খান, উকিলবাবু আর বিভাসদের বাড়ি নিয়ে যে প্রাঞ্জল জ্যামিতিক ত্রিকোণ তার সবটাই সেদিন সন্ধ্যেয় নতুনের মত হয়েছিল। সন্দেহ নেই ছিবড়ের মত অন্ধকার ছড়িয়ে ছিল শ্যাওলাধরা পাঁচিলের গায়, কৃষ্ণচূড়া আর ডালিমের পাতার ফাঁকে, তবু অনেক বেশি আলো ছিল, কেমন এক উত্তাপ ছিল হাওয়ায়।

বিভাসকে ক'দিন ধরেই প্রচুর কাজ করতে হচ্ছিল। রীতিমত মেহনত। এত ব্যস্ত কোন দিন হয় নি। সত্যি বলতে কি, ভালই লাগছিল। পারিবারিক ব্যাপারে তার যে এত দাম, এর আগে কখনও বুঝতে পারে নি। কয়েকজন আত্মীয় দু'দিন আগে থেকেই এসে এ বাড়িতে ছিলেন। ইন্দ্রাণী যে এ বাড়ির কেউ নয় তাও বুঝতে পারা সহজ ছিল না। এমনকি বেগম সেদিন সকালেও একবার এসেছিলেন।

পুরনো বাড়িটায় রঙটঙ করা হয়েছিল। গম্বুজটা ছোঁয়া হয়নি। আগের মতই ছিল, সবুজ রোঁয়ারোঁয়া উদ্ভিদে ছাওয়া। গম্বুজটা যেন বাড়ি থেকে আলাদা, বাড়ির অঙ্গ না। অথচ গম্বুজ বাদ দিয়ে শুধু ন্যাড়া ছাতটাকে বিভাসের একেবারে ফোত হয়ে যাবার মত লাগে। সেদিন সন্ধ্যের পর গম্বুজটার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল। পাতলা রঙিন কাগজের মালা টাঙান হয়েছিল, অজস্র বেলুন ঝোলান হয়েছিল, ছোটছোট আলো জ্বলছিল-নিভছিল ন্যাড়া ছাতের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত একটি সরলরেখায়। এছাড়া জোরাল

আলো জ্বলছিল অনেকগুলো।

বিকেলে একবার সামনে থেকে চোখ বুলিয়ে ইন্দ্রাণী বলেছিল—'বাড়িটাকে আজ সুন্দর দেখাচ্ছে।' বিভাসের অবশ্য মোটেই তা মনে হয়নি। বরং চড়া রঙের ছদ্মবেশে তার প্রচ্ছন্ন জীর্ণতা আরও যেন বেশি করে ধরা পড়েছিল। তাড়াতাড়িতে এবং অন্য নানা কারণে দরজা-জানলায় রঙ করা সম্ভব হয় নি। দেওয়ালের নতুন রঙের পাশে বিশ্রী বেমানান লাগছিল। দেওয়ালেও সব জায়গায় সমান রঙ ধরেনি। ইন্দ্রাণী বলেছিল—'তবু সব মিলিয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে।'

মা'র ঘর ধুয়ে মুছে প্রায় ঝকঝকে করা হয়েছিল। সকাল থেকে খুলে রাখা হয়েছিল ঘরটা। মা'র সব থেকে বড় ছবিখানায় ফুল দেওয়া হয়েছিল, একটি মালা আর দু'পাশে সুতো দিয়ে বাঁধা রজনীগন্ধা। ছবিতে মা'র মুখ হাসি হাসি। রাজাপুর কবরখানায় মা'র কবরে ফুল রাখার পাত্রটার কানা ভেঙে গেছে। ছবির পাশে সুতো দিয়ে রজনীগন্ধা বেঁধে দিয়েছিল ইন্দ্রাণী। দরজার দিকে সরে এসে একটু দূর থেকে চোখ বুলিয়ে বলেছিল, 'বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমার মা খুব সুন্দর ছিলেন।' বিভাস বলেছিল—'এ যে-সময়ের ছবি তখন আমি আসি নি।'

অনেক দিন পরে মা'র ঘর এমন খুলে রাখা হয়েছিল। ঘরটা প্রায় সবসময় বন্ধই থাকে। মাঝে মাঝে শুধু পরিষ্কার করবার জন্যে খোলা হয়। বোঝা যায় বাড়ির বেড়ালটা কোন ফাঁক দিয়ে যেন এই ঘরে ঢোকে, এটাই তার আস্তানা। আমার ঘর থেকে মা'র সেতারটা এই ঘরে এনে রাখতে হবে। আমার ঘরে সেতারটার সাদা ফুলতোলা নীল ঢাকনাটায় বড় বেশি ধুলো পড়ে। আমার অবশ্য ধুলো ঝেড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ঝাড়া হয় না। কেন যে হয় না! মা'র সেতারে ধুলো জমে থাকা দেখতে খারাপ লাগে। ধুলোর প্রাচুর্য এই শহরে। এই ঘরে এনে রাখলেও ঢাকনাটায় ধুলো জমবে। তবু চোখের সামনে থাকবে না। সেদিন রাজাপুর কবরখানায় ঝড়ো হাওয়াতেও ধুলো উড়ছিল না। অন্য সময় ধুলো ওড়ে। সেদিন বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়েছিল, ধুলো বসে গিয়েছিল। আমার মন কি এক বৃষ্টিতেই নরম কাদা হয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যের উৎসব এই ছোট বাড়িতে হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। অন্য কোথাও হতে পারত। এ বাড়িতে একখানাও খুব বড় ঘর নেই। তবু বাবা চাইলেন, এ বাড়িতেই হোক। এবং দেখা গেল, বিতোষেরও তাই ইচ্ছে। এর ফলে সেদিন অভ্যাগতরা দু'খানা ঘর, বারান্দা আর বাগানে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতরা সবাই দীর্ঘ সময় ছিলেন এ বাড়িতে। কেউ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে চলে যান নি। সন্ধ্যের দিকে প্রথম দফায় চায়ের সঙ্গে কেক, পেস্ট্রি, চিজ স্ট্র ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। খাবার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছিলেন সবাই। ঘরে বারান্দায় বাগানে জোর আলোয় নানা বিচিত্র ছায়া পড়ছিল, ভেঙে যাচ্ছিল। নবাব খান আর বেগম এবং বিজয়প্রতাপকে নিয়ে বিভাসের অস্বস্তি ছিল। ভেবেছিল, নবাব খান অথবা বেগম কেউ-ই বিজয়প্রতাপের সামনে স্বাভাবিক বোধ করবেন না। দেখা গেল, তাঁরা বিজয়প্রতাপকে এড়িয়ে চলছেন এবং বিজয়প্রতাপ তাঁদের থেকে সযত্নে দূরে থাকছে। প্রথমে অনেকক্ষণ বিজয়প্রতাপকে দেখতেই পায় নি, ভেবেছিল—তখনও আসে নি; একটু পরে তাকে প্রায় আবিষ্কার করেছিল। এক কোণে একটা চেয়ার দখল করে বসেছিল বিজয়প্রতাপ, তাকে ঘিরে বসেছিল আরও কয়েকজন। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছিলেন বলে প্রথমে বিজয়প্রতাপকে দেখতে পায় নি।

বিভাস কাছে গিয়ে বলেছিল, 'তোকে তো খুঁজেই পাচ্ছি না। বিনীতা আসে নি?'

'না, শরীরটা একটু খারাপ।' বিজয়প্রতাপের বলার ভঙ্গিতে বোঝা গিয়েছিল, কথাটা সত্যি না। বিভাসের মনে হয়েছিল, বিনীতা সহজেই আসতে পারত। শরীর খারাপের মিথ্যে অজুহাত দেবার দরকার ছিল না। এ বরং ছেলেমানুষি।

বিজয়প্রতাপ যেন খোঁচা দিয়ে বলেছিল, 'তোকে বড় উল্লসিত মনে হচ্ছে, বিভাস।'

'অবশ্যই। আমার তো আজ খুশী থাকবারই কথা।'

'না, অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে মনে হচ্ছে।' কথা বলার সময় বিজয়প্রতাপ চোখ দুটোকে খুব ছোট করে আনছিল। বিজয়প্রতাপের কথার যে কোন বিশেষ মানে ছিল, বিভাস ভাবে নি। বোকার মত একটু হেসে চলে গিয়েছিল অন্য দিকে।

সেদিনের পুরো উৎসবটাই একটা বাড়তি ব্যাপার ছিল। এই ধরনের রিসেপশনের রেওয়াজ এই শহরে ছিল না। কিন্তু বিতোষ চেয়েছিল এমন একটা কিছু করতে। তার ছাত্রজীবন কলকাতায় কেটেছে, তাই তার ইচ্ছেয় কলকাতার এই প্রথা এই শহরে আমদানী করা হয়েছিল।

বাগচীমশাইকে বিভাস কোন পোষাক দিতে পারে নি। তিনি এমন একজনের একটি দামী স্যুট পরে এসেছিলেন যাঁর দেহ মেদস্ফীত এবং উচ্চতা তাঁর থেকে কম। বেমানান লাগছিল। তবে তিনি নিজে এ বিষয়ে মোটেই সচেতন ছিলেন না।

বিতোষ তার অফিসের বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বাঙলা স্কুলের সেজ দিদিমণি, মানে নতুন বউ যে এত সাজতে জানেন, সেদিন না দেখলে বিশ্বাস হত না। জবা কী করে যেন ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে খুব জমিয়ে নিয়েছিল। চুলে ফুল গুঁজেছিল জবা, তার শাড়ির আর জামার রঙ যেন চিৎকার করছিল। উপাধ্যায়জীকে মনে হচ্ছিল খুশীতে বেসামাল। ঠিক মত দাড়ি কামান থাকলে তাঁকে এই বয়েসেও আশ্চর্য সুন্দর দেখায়। বড় অল্পে খুশী হন উপাধ্যায়জী।

সেদিনের অনুষ্ঠানের এত কিছু মনে ছিল বিভাসের, দীর্ঘকাল। হয়ত অন্য দু'টো গভীরতর দৃশ্যের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল বলে এত কিছু মনে ছিল।

প্রচুর আলো আর অভ্যাগতদের ভিড়ের মধ্যে ইন্দ্রাণী একসময় সন্তর্পণে বলেছিল, 'চল একটু ছাতে যাই।'

এমন কৈশোরোচিত প্রস্তাবের জন্যে বিভাস প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময় লুকোবার চেষ্টা না করে বলেছিল, 'কেন?'

'চল না একবার!'

ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য সবার দৃষ্টি এড়িয়ে বিভাস সিঁড়ি বেয়ে ছাতে উঠে এসেছিল, পিছনে ইন্দ্রাণী। ছাতে নির্জন অন্ধকার ছিল, নিচেয় নিমন্ত্রিতদের কলকণ্ঠ। গম্বজটায় রঙটঙ পড়ে নি, রোঁয়ারোঁয়া উদ্ভিদে ছাওয়া। তার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ইন্দ্রাণী বলেছিল, 'কেন যেন ভিড় ভাল লাগছে না। ইচ্ছে করছে এখানে বসে থাকি এবং তুমিও এখানে থাক। অবশ্য এখন তা সম্ভব না। চল নিচে যাই।'

বিভাসের মনে হয়েছিল, কিছু বলা দরকার। কিন্তু কিছুই বলা হল না। চিকন সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত ইন্দ্রাণীর পিছনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছিল। নামতে নামতে ভেবেছিল, আমি কেন যে কখনও দর্শনীয় কিছু করতে পারি না!

ছাত থেকে নেমে এসে একটু সময় অনিশ্চিত পায়ে এঘর-ওঘর করতে হয়েছিল। মনে

হয়েছিল, বড় বেশি আলো। চোখে লাগে। এক ফাঁকে বিতোষ খাবার টেবিল সাজানর বিষয়ে দরকারী কয়েকটা কথা বলেই অন্য দিকে চলে গিয়েছিল। এবং বিতোষ চলে যেতেই সন্দেহ হয়েছিল তার কথা শুনেছে কিনা। অবশ্য খাবার টেবিল ঠিকই সাজান হয়েছিল। দুই ঘরে দু'সারি আর বারান্দায় এক। মাঝে মাঝে ভাড়া করে আনা পাত্রে ফুল রাখা হয়েছিল, নানা রঙের ঋতুপুষ্প।

পরিবেশনের সময় অন্য কয়েকজনের সঙ্গে ইন্দ্রাণীও সাহায্য করছিল। এই সব বিভাস কোনদিন করেনি। তবু মনে হচ্ছিল, এই কাজে সে যথেষ্ট দক্ষ। সযত্নে অভ্যেস করলে রীতিমত কৃতিত্ব দেখাতে পারে। কেন যেন হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, বিজয়প্রতাপ হ্যাংলার মত রায়তা খেতে ভালবাসে। একটা প্লেটে করে অনেকটা রায়তা নিয়ে এসে কোন কথা না বলে বিজয়প্রতাপের সামনে টেবিলে রেখেছিল। বিজয়প্রতাপ খাওয়া বন্ধ করে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। কী আশ্চর্য, তাকে এতটুকু খুশী মনে হয় নি।

'এসব কাজে তো তোর এত উৎসাহ ছিল না, বিভাস!' কথা বলার সময় বিজয়প্রতাপ চোখ দুটোকে খুব ছোট করে এনেছিল। কেন যেন তার দু'সারি সুবিন্যস্ত দাঁত পরস্পরকে পিষছিল। সামান্য দূরে আর একটা টেবিলের সামনে অন্য কোন খাদ্য নিয়ে দাঁড়ান ইন্দ্রাণীকে এবং এক হাতের মধ্যে দাঁড়ান বিভাসকে চোখ ছোট করে একসঙ্গে দেখছিল বিজয়প্রতাপ।

ছাতের নির্জন অন্ধকার আর বিজয়প্রতাপের চোখের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় সেই রাত্রের অনেক দৃশ্য মনে ছিল বিভাসের, দীর্ঘকাল।

চোদ্দ

সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় রাস্তার মাঝখানে একটা দ্বীপ তৈরি হয়েছে, একটা ট্র্যাফিক আইল্যান্ড। এখনও একটু কাজ বাকী। ইট সুরকি সিমেন্টের একটা বিরাট সুন্দর বৃত্ত। কেন্দ্রবিন্দুতে একটি উজ্জ্বল রঙের আলোকস্তম্ভ। যুদ্ধের বছরগুলোতে এখানেও ছায়াছায়া অন্ধকার ছিল। দিনরাত মিলিটারী ট্রাক আর জীপ গর্জাত। ফাফামাও বিমান-ঘাঁটী আর কার্জন ব্রীজ এবং ক্যান্টনমেন্ট আর ম্যাক্‌ফার্সন লেক যেন দুই দীর্ঘবাহু বাড়িয়ে দিত এই বিন্দুতে। কত বছর হল যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সেই প্রসারিত বাহু গুটিয়ে নিয়েছে সন্দেহ নেই, তবু এখনও মিলিটারী ট্রাক দেখা যায় মাঝে মাঝে। হয়ত ক্যান্টনমেন্টের দিক থেকে আসে অথবা কেল্লা থেকে। বিভাস জানে না, স্পষ্ট করে কিছু জানে না। জন্ম থেকে এই শহর দেখছে, তবু তার ভূগোল বিভাসের মনে পরিচ্ছন্ন নয়। এই শহরের প্রাঞ্জল নক্‌শা মোটেই তার নখদর্পণে নেই। বিতোষের মত কোনদিন এখান থেকে চলে গেলে হয়ত এই শহরের অঙ্গের কয়েকটি ভগ্নাংশের আদল শুধু মনে থাকবে। হয়ত মনে হবে, মুঘল স্থাপত্যের উদ্ধত চূড়োগুলোয় বর্ষার ধোঁয়া রঙ মেঘ নেমে আসে। পাতলা অন্ধকারেও যমুনা ব্রীজের সাদা শরীরে যেন একটু রোদ লেগে থাকে। পরিত্যক্ত গভর্নমেণ্ট হাউসের আগাছা আর বুনো লতায় ছাওয়া নিচু পাচিলের পাশে একটা দেড়শ' বছরের পুরনো ইঁদারার আদুড় গা কঙ্কালের মত। তার ইটগুলো ঠিক তাসের প্যাকেটের মত। ম্যাক্‌ফার্সন লেক ছাড়িয়ে গেলে আরও একটা ইঁদারা, যার গভীর প্রত্যন্তে কাল দুর্গন্ধ জল আছে। তার মধ্যে পাথরের টুকরো ফেললে কেমন অদ্ভুত শব্দ ওঠে আর অসংখ্য চামচিকে উড়ে আসে। সাপের জিভের মত ক্ষিপ্র ডানার কসরত দেখিয়ে ঝাঁক ঝাঁক চামচিকে সেই ইঁদারার গভীর

দেওয়াল থেকে উড়ে এলে উন্মত্ততার সেই সংজ্ঞাটা অবশ্যই মনে আসে যা এক সময় একটা ইংরেজি উপন্যাসে পড়েছিল—'বয়লিং আপ অব দি কয়েটিক ডীপ।'

স্টেশনে গিয়েছিল। সন্ধ্যেটা সেখানে কেটেছে। চুপচাপ এক কোণে দাঁড়িয়ে থেকে, পায়চারি করে, পাথরের বেঞ্চে বসে ব্যস্ততা দেখছিল। সময় কাটে না, অথচ হিসেব করলে দেখা যাবে পাত্র উপচে পড়া জলের মত বছরগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে। এবং আরও তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে পাত্র ভরে নি। একেবারে শূন্য না হলেও জল উপচে পড়ার মত নয়। বিতোষ বউ নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। চলে গিয়ে হয়ত ভালই করল। এখানে সে প্রবাসীর মত থাকত। কৈশোর আর প্রথম যৌবনে বিতোষ কলকাতায় ছিল। এই শহর তার ভাল লাগত না। কিন্তু বিভাসের তো তা নয়। এই শহরে সে প্রবাসী না। বিতোষের চলে যাওয়ার পর দেওয়ালে নতুন রঙ সত্ত্বেও সেই একতলা বাড়িটা যেন হঠাৎ আরও পুরনো হয়ে গেছে। ঘর, বারান্দা, সিঁড়ি, কুলুঙ্গি, দেওয়ালের ফাটলে শুধু শীত শীত অন্ধকার।

পুরো সন্ধ্যেটা স্টেশনে কাটিয়ে এখন কুইন্স রোড ধরে ফিরছিল। সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় রাস্তার মাঝখানে ইট সুরকি সিমেণ্টের দ্বীপটা সম্পূর্ণ হতে এখনও বাকী। সন্ধ্যের পরও কাজ হচ্ছে। ক্যানিং রোডের কাছে এসে বিভাস একটু দাঁড়াল। আশপাশের বাড়িগুলোর কপালে অনেক নিয়নালোকিত বিজ্ঞাপন। ক্রমেই বাড়ছে। একটা টাঙাওয়ালার পায়ের তলায় ঘোড়ার জন্যে কিনে-আনা তেজী সবুজ ঘাস। এইমাত্র ঘাসমণ্ডি থেকে এল। তাদের আর নবাব খানের বাগানে এখন প্রচুর ঘাস। উকিলবাবুর বাগান সযত্নরক্ষিত, অমন বেপরোয়া তেজী ঘাস হয় না। কিছুদিন আগে দেখেছিল, বৃষ্টি আর বাতাসের ঝাপটায় রাজাপুর কবরখানার দেওয়ালের গায় ঘাসের জঙ্গল দুলছে। কবরখানার রেলিংয়ের ওপর ইন্দ্রাণীর জলেভেজা হাত আশ্চর্য ঠাণ্ডা ছিল, নিরক্ত মনে হয়েছিল আঙুলগুলো। সেই রাত্রে ছাতে নির্জন অন্ধকার ছিল, নিচে নিমন্ত্রিতদের কলকণ্ঠ। কিছু বলতে পারি নি, তীব্র কিছু বলতে পারি না, দর্শনীয় কিছু করতে পারি না।

একটা মোটর প্রায় বিভাসের গায়ের ওপর এসে থামল। হঠাৎ ব্রেক করার কর্কশ শব্দে ফিরে তাকাতে হল।

'বিভাস, আবে মারহুম!' স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে বিজয়প্রতাপ হাসছে। গাড়িতে আর কেউ নেই।

বাঁ পাশের দরজাটা খুলে দিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'উঠে আয়।'

'কোথায় যাবি?' বিভাস সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠল না।

'নরকে যাব, তোকে নিয়ে যাব।' বিজয়প্রতাপ বেশ মেজাজে আছে মনে হল।

'আমাকে যে এখন ফিরতে হবে। সকালে বেরিয়েছি। স্কুল থেকে বাড়ি যাই নি।'

'তাহলে এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী করছিলি?'

'কিছু না। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'বাজে বকিসনে। উঠে আয়।'

উঠতে হল। অনিচ্ছায় উঠে বিজয়প্রতাপের পাশে বসল। সেই পুরনো গাড়িটা। খুব ছোট। নতুন গাড়ি এর মধ্যে আর কেনে নি বিজয়প্রতাপ। হয়ত শিগগিরই কিনবে। স্টিয়ারিংয়ে একটা হাত, আর একটা হাত বাইরে, হাওয়া লেগে সিগারেট তাড়াতাড়ি পুড়ছে। হাওয়ায় ছাই উড়ে যাচ্ছে, তবু অসহিষ্ণু আঙুলে ঘা দিয়ে দিয়ে ছাই ঝাড়ছে। ক্যানিং রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে বাঁয়ে স্ট্যানলি রোডে মোড় নিল গাড়িটা।

আগে আগে তিনজন এইসব রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেত, কখনও সাইকেল রিক্সায়, কখনও টাঙায়। অ্যাসফল্টের রাস্তায় অথবা সিমেণ্টের পেভমেণ্টে শুকনো হলুদ পাতা কখনও একটা দুটো, কখনও অজস্র চোখে পড়ত। মোটর থেকে, বিশেষ করে রাত্রে, হলুদ পাতা দেখা যায় না। তিনজন কখনও একসঙ্গে মোটরে বেড়ায় নি। এখন আর তা সম্ভব না। বিজয়-প্রতাপের একটা মাউথ অর্গান ছিল। সেটা এতদিনে নিশ্চয়ই ফেলে দিয়েছে, অথবা বাড়ির মধ্যেই কোথাও হারিয়ে গেছে। দেওয়ালে ঝোলান সেতারটার সাদা ফুলতোলা নীল ঢাকনাটায় ধুলো জমছে। মা'র ঘরে সরিয়ে রাখবার কথা ছিল, রাখা হয়নি। এই মুহূর্তে ছোটবেলার এই সব খুঁটিনাটি কেন মনে আসছে। আমার কি আর বয়েস বাড়েনি। এমন হয়, কারও কারও এমন হয়। এক জায়গায় এসে বয়েসটা থেমে থাকে, আর বাড়ে না। আমার তেমনি হয়নি। আমার বয়েস যদি সেই সময়ে এসে থেমে যেত, তাহলে তো তখনকার ইচ্ছেগুলো এখনও আমাকে জ্বালাত। আমার তো সেই বয়েসের ইচ্ছেগুলো নেই। বস্তুত আমার সব ইচ্ছেই যেন মরে গেছে।

বিজয়প্রতাপ এতক্ষণ কথা বলেনি। এমন হয় না। এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা তার স্বভাব নয়। হয়ত গভীর কিছু বলবে। ইন্দ্রাণীর বিষয়ে কিছু বলবে কি। সোজা সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। ভ্রূসন্ধি ঈষৎ কুঞ্চিত। চেহারাটা নতুন। মনে পড়ল, সেদিন রাত্রে তার সঙ্গে কথা বলার সময় বিজয়প্রতাপ চোখ দুটো খুব ছোট করে এনেছিল। কেমন বিশ্রী জ্বালা ছিল সেই চোখে। তারপর এই প্রথম দেখা হল।

'তোর জিভ খসে গেছে নাকি? না কি আমার গায়ে মদের গন্ধ পেয়েছিস? আমার সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করে?' বাঁ পাশে এক ঝলক তাকিয়ে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল বিজয়-প্রতাপ। তার কথা বলার আকস্মিকতা চমকে দেবার মত। এত কর্কশ গলায় বিজয়প্রতাপ কথা বলে না। গলাটা নতুন।

'তোর জিভে তো সব সময় সুড়সুড়ি। তুই চুপ করে আছিস কেন?' একটু থেমে বিভাস আবার বলল, 'প্রায়ই ভাবি তোদের বাড়ি একবার যাব। তোর সঙ্গে আজকাল বিশেষ দেখাই হয় না। বিনীতার কী খবর?'

'ভাল।' বিজয়প্রতাপ মুখ ফরাল না, সোজা সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। গলাটা এখনও নতুন।

বাঁয়ে সিভিল লাইন্স শেষ হয়ে গেছে, ডাইনে অ্যালফ্রেড পার্ক অনেক দূর, সামনে মিয়রাবাদ। গাড়িটাকে একবার থামতে হয়েছিল। তখন খুব বেশি কাঁপছিল গাড়িখানা। একটা প্লাগ বোধহয় ফায়ার করছে না। এখন আবার তীব্র গতি। স্পীডমিটারের কাঁটা থরথর করে কেঁপে লাফিয়ে পার হয়ে গেল চল্লিশের ঘর। মনে হল, বাইরে কোথাও কেউ নেই, আলো অত্যন্ত কৃপণ। বিজয়প্রতাপ কোথায় যেতে চায়। রাত বাড়ছে।

গাড়িতে উঠতে বিভাসের অনিচ্ছা ছিল। শুধু জোরে আপত্তি করার উৎসাহ ছিল না বলে উঠে বসেছিল বিজয়প্রতাপের পাশে। অথচ এখন ভাল লাগছে, খুব ভাল লাগছে, নেশার মত। এখন রগরগে কিছু ঘটলে হয়ত আরও ভাল লাগত। বিজয়প্রতাপ সত্যি নেশা করেছে নাকি। কিসের যেন গন্ধ। জোর বাতাসে গন্ধটা উড়ছে। বিভাসের হাতের সিগারেট থেকে একটা আগুনের ফুলকি উড়ে এসে ঠোঁটে লেগেই নিভে গেল। একটু জ্বলে উঠেই আবার ঠাণ্ডা। জবা মেয়েটা চর্বির বড়ার মত। একটু আগে দেখা টাঙাওয়ালার ঘোড়াটা হয়ত এখন তেজী ঘাসে মুখ ডুবিয়েছে।

দুজনেই চুপ, কারও মুখে কথা নেই। চোখ ঘুরিয়ে দেখল, বিজয়প্রতাপের চোয়ালের হাড় পরস্পরকে কঠিন চাপ দিচ্ছে, ঠোঁটের তলায় দুসারি দাঁত পিষছে পরস্পরকে। নতুন চেহারা। খুব ভাল লাগছে। স্পীডমিটারের কাঁটা আর এক লাফ দিয়ে পঞ্চাশের দাগ ছুঁয়ে ফেলল। এখন একটা দুর্ঘটনা হলে বেশ জমে, বেশ একটা জমজমাট নাটক হয়। ইন্দ্রাণী আজ সন্ধ্যেয় আমার সঙ্গে বেরোবে বলেছিল। স্কুল থেকে ফেরাই হল না। কখনও দর্শনীয় কিছু করতে পারি না। এখন দর্শনীয় কিছু ঘটলে বেশ নাটক জমে যায়। আমি যদি সঙ্গে সঙ্গে থেঁতলে ফোত হয়ে যাই আর বিজয়প্রতাপের যদি দুটো আঁচড় মাত্র লাগে, তাহলে চমৎকার!

মিয়রাবাদ কত পিছনে পড়ে রইল। সামনে একটা কালভার্ট। এক ঝাঁকানি দিয়ে পুরনো ছোট গাড়িখানা কালভার্টটা পার হয়ে গেল। বাঁ দিকে গল্‌ফ্‌ লিঙ্কস, ডাইনে যুদ্ধের সময় সৈন্যদের তাঁবু ছিল। ডান দিকে মোড় নিয়ে আরও এগোলে কার্জন ব্রীজ। আরও কত দূর ফাফামাও বিমানঘাঁটী।

ডান দিকে মোড় নেবার সময় অস্পষ্ট দুর্বোধ্য কী যেন বলে বিজয়প্রতাপ হিংস্র চাপ দিয়েছিল অ্যাক্‌সিলারেটরে, সামনে ঝুঁকে দুহাতে স্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে দিয়েছিল বাঁয়ে। খাদের তলায় গড়িয়ে যাবার আগে গাড়িখানা একটা গাছের গুঁড়িতে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছিল, দুটো দরজা খুলে গিয়েছিল একসঙ্গে, বিভাস আর বিজয়প্রতাপ ছিটকে পড়েছিল বাইরে। প্রায় বিভাসকে ছুঁয়ে গাড়িটা গড়িয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে গাছগুলোকে চেনা যায়নি। পিপুল অথবা বট অথবা তেঁতুল অথবা নিম। অন্ধকার, অন্ধকারের গন্ধ। গাছ চেনা যায়নি, নাটক এমন ঠিক ঠিক জমলে গাছ চেনা যায় না।

দুজনে প্রচুর কসরত করে উঠে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। বিভাস ভাবছিল, এখন একটা অট্টহাসি খুব ভাল। কিন্তু বিজয়প্রতাপ বাঁ হাতের কব্জি চেপে ধরে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। জখম হাতটাই আবার ভাঙল নাকি! বিভাস প্রায় হাসি হাসি মুখে বলল, 'কিরে, ভেঙেছে নাকি?'

'মনে হচ্ছে। তোর কিছু হয়নি?'

'আঁচড়টাচড় লেগেছে বোধহয় দুপাঁচটা। বুঝতে পারছি না।'

'তোর দেখছি শক্ত হাড়। বেঁচে গেলি!'

হাঁটু কনুই ইত্যাদি মোক্ষম জায়গাগুলো জ্বলছে। জ্বলুক। গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। খাদের তলায় গড়িয়ে গেছে, তার ওপরে অন্ধকার অরণ্য। কাল বৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে ছিটকে পড়েছিল সেখানকার মাটি বোধহয় নরম ছিল। নরম মাটির গন্ধ। তার সঙ্গে যেন অন্ধকারের গন্ধ মিশেছে। অন্ধকারের কি কোন আদিম গন্ধ আছে। বিজয়প্রতাপের কব্জির হাড় ভেঙে গিয়ে থাকলে কিছু একটা করা দরকার। এখান থেকে ফিরে যাওয়া দরকার। যুদ্ধের সময় হলে সামনের সৈন্যদের তাঁবুতে যাওয়া যেত। কিন্তু সেই তাঁবুগুলো তো এখন আর নেই। এমন একটা দর্শনীয় ব্যাপার ঘটল, তবু আমার কিছু হল না। আমার শক্ত হাড়।

স্ট্যানলি রোড ধরে দুজন শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বিভাসের পকেটের সিগারেট দেশলাইয়ের বাক্স চিপটে গেছে। বিজয়প্রতাপের পকেটে মোটামুটি আস্ত ছিল। একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দুজন সিগারেট ধরাল। বিজয়প্রতাপের ঠোঁটে সিগারেট ঝুলছে, ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে বাঁ হাতের কব্জি।

খানিক দূর হেঁটে সাইকেল রিক্সা পাওয়া গেল একখানা। সেখান থেকে সিভিল হসপিটাল। অল্প সময়ে পেঁাছে গেল। ওষুধটষুধ দিয়ে দুজনেরই আঁচড়গুলো জীবাণুমুক্ত করা হল। বিজয়প্রতাপের ভাঙা কব্জি প্লাস্টার করতে সময় লাগল অন্তত আধঘণ্টা।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বিভাস বলল, 'দুটো রিক্সা ডাক। তুই বাড়ি যা, আমি বাড়ি যাই।'

'বাজে বকিস নে। এখন বাড়ি যাব না।'

'তবে এখন কী করবি? তোর হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে না?'

'হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে না! ন্যাকা!' বিজয়প্রতাপ একটা রিক্সায় উঠে বসে বলল, 'উঠে আয়। মোটর থেকে তখন ঠিক এইভাবে বিভাসকে ডেকেছিল।

সাইকেল রিক্সা চলতে শুরু করলে বিজয়প্রতাপ আবার বলল, 'তুই কোন কৈফিয়ত চাস না?'

'কিসের?'

'আজকের ঘটনার জন্যে তুই কোন কৈফিয়ত চাস না?'

'না।'

'ও, তুই বুঝি ক্রোধ ঘৃণা বিদ্বেষ এসবের অনেক উর্ধ্বে উঠে গেছিস! তোর ধ্যানস্থ ভাব দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু আজ তোকে আমি কৈফিয়ত দেব, তুই না চাইলেও দেব।'

বিভাস বলার মত কিছু কথা পেল না। গল্‌ফ্‌ লিঙ্কসের পরে ডান দিকে মোড় নেবার সময় বিজয়প্রতাপ গাড়ির গতি একটু কমাবার জন্যে ব্রেকে চাপ না দিয়ে অ্যাক্‌সিলারেটরই চেপে রেখেছিল, সামনে ঝুঁকে দুহাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিয়েছিল বাঁয়ে। একটা গাছের গুঁড়িতে ঘা মেরে গাড়িটা খাদের তলায় গড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে অসরল কিছু নেই। এর জন্যে কৈফিয়ত চেয়ে কী হবে। বরং বিজয়প্রতাপ এখনই একটা নতুন গাড়ি কিনবার কৈফিয়ত পেল।

রাস্তা ফাঁকা হয়ে এসেছে। এই শহর বড় তাড়াতাড়ি ঘুমোয়। দুর্ঘটনায় সব সময় মোটরে আগুন ধরে যায় না কেন। গাছের গুঁড়িতে ঘা মারার পর গাড়িটায় আগুন ধরে গেলে আরও জমত। অন্ধকার খাদের তলায় রাত্রে আলো পেঁাছয় না। আজ জ্বলন্ত গাড়ি গড়িয়ে গেলে খাদের তলাটা আলোকিত হত। বাইরে ছিটকে না পড়লে ছাই হত শক্ত হাড়। সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় আবার এমন ফিরে আসা যেত না। আরও কি অনেক কাল এমন ফিরে ফিরে আসব।

রিক্সা থেকে নেমে রামাজ বার অ্যান্ড রেস্টরাণ্টে ঢুকল দুজন। একটা নির্জন কোণের টেবিলে বিজয়প্রতাপের জন্যে হুইস্কি এল আর বিভাসের জন্যে চা। কয়েকবার ঠোঁটে পাত্র ছুঁইয়ে বিজয়প্রতাপ প্রশান্ত হল। নির্বিষ শিশুর মত একমুখ হসে বলল, 'বিশ্বাস কর, বিভাস, এর মধ্যে কোন পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। যখন তোকে গাড়িতে উঠতে ডেকেছিলাম, তখন এমনিই ডেকেছিলাম। স্ট্যানলি রোড নির্জন হয়ে এলে সেই প্রথম আমার মনে হল, তোকে শেষ করে দিই। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিস তোকে থেঁতলে মারতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু তুই নিজেও তো ছিলি গাড়িতে।'

'প্রথমে সে হিসেব মাথায় আসেনি। পরে ভাবলাম, গাড়িটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে

ডাইনে লাফ মারব, আর তুই চাপা পড়ে মরবি।'

'নিখুঁত পরিকল্পনা এবং তার সিদ্ধি তোর বাঁ হাতের কব্জি।'

'কিন্তু বিশ্বাস কর, সবটাই খুব অল্প সময়ের ভাবনা। সত্যিকার কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না।'

এর পর আর পুরনো বন্ধুদের কী কথা থাকতে পারে। সব তো পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল। এবার পাত্র শেষ করে উঠলেই হয়। অথচ বিজয়প্রতাপ উঠবার কোন লক্ষণ দেখাচ্ছে না। পাত্রটি ধরেছে ডান হাতে, কপাল নাসাগ্র স্বেদাক্ত।

'আজ তোকে একটা কথা বলব, বিভাস।' বিজয়প্রতাপের গলায় বেশ উত্তাপ। 'আমি আর ইন্দ্রাণী যে পরস্পরের কাছে এমন দুঃসহ হলাম তার জন্যে আমি একা সবটুকু দায়ী না। অনেক কাল আগে আমি ইন্দ্রাণীকে প্রায় খুবলে নিয়েছিলাম, আর তুই আমাকে অনেকগুলো বছর ধরে নিঃশব্দে অদৃশ্য ছোবল মেরেছিস। আমাদের ঘরের বাতাসে তুই বিষ ছড়িয়েছিলি। আমার আর ইন্দ্রাণীর মাঝখানে, অন্তত শেষের দিকে, তুই সব সময় দাঁড়িয়েছিলি।'

বিভাসের একটু সুড়সুড়ি লাগল সন্দেহ নেই। তবু বলল, 'এসব সত্যি না। তোর আসলে নিজের ওপর আস্থা কম, তাই এসব ভেবেছিস। নিজের ওপর বিশ্বাস গভীর না, তাই এই মিথ্যেকে প্রশ্রয় দিয়েছিস। এবং এই কারণেই নিজেকে এমন বেশি করে জাহির করিস।'

'এসব সত্যি না হলে আমাকে ঝাঁজাল সুখের পিছনে এমন হন্যে হয়ে ছুটতে হত না।' বিজয়প্রতাপ একটু থেমে বলল, 'তুই আছিস বলে ইন্দ্রাণী আর আমি পরস্পরের কাছে দুঃসহ হলাম। তুই হয়ত বুঝতে পারিসনি, অথচ, বিভাস, আমার আর ইন্দ্রাণীর ঘরে তুই-ই বিষ ছড়িয়েছিস। দিনের পর দিন যন্ত্রণায় জ্বলেছি, তাই আমার আর সহ্য হল না। সেদিন রাত্রে তোদের বাড়িতে যখন দেখলাম তুই আবার ইন্দ্রাণীর খুব কাছে এসেছিস, তখন আর আমার সহ্য হল না।' শূন্য পাত্রটা বিজয়প্রতাপ শব্দ করে টেবিলে রাখল। দুসারি সুবিন্যস্ত দাঁত হাসিতে উজ্জ্বল হল। 'সুতরাং আজ স্ট্যানলি রোড ফাঁকা হয়ে এলে আবার হন্যে হয়ে গেলাম। ভাবলাম, তোকে শেষ করে দিই। তোকে থেঁতলে মারতে চেয়েছিলাম।'

'আমাকে শেষ করতে এত মেহনত করলি, হাত ভাঙলি, এর জন্যে কৃতজ্ঞ রইলাম। তোর এমন একটা প্রেরণা না এলে আমার আজকের এই অভিজ্ঞতাটা হত না।'

'বিভাস, যদি আমার ওপর রাগে ক্ষিপ্ত হতে না পারিস, আমাকে ঘৃণা কর। আমাকে ঘৃণা কর। আমাকে ঘৃণা করার তোর সঙ্গত কারণ আছে।'

বিভাস একবার নড়েচড়ে বসল। আমার কি দুটো কানই কাটা। আমি কেন বিজয়প্রতাপকে ঘৃণা করতে পারি না। রাগে জ্বলে যাই না কেন আমি। আমি এতদিন, এখনও, কেমন করে তার বন্ধু আছি। আমি কি ভাল করে জানি আমি কত বড় বেহায়া। আমার কি শিরদাঁড়া আছে, কোনদিন কি ছিল। রুগ্ন দুর্বল ল্যাজগোটান জানোয়ারের মত তার সঙ্গে গিয়ে গঙ্গার বালি নখ দিয়ে খুঁড়েছি, আবার তার সঙ্গে ছায়ার মত ফিরে এসেছি। এবং এতকাল তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখেছি। আজ আমাকে থেঁতলে মারতে চেয়েছিল বিজয়প্রতাপ। তবু কেন আমি রাগে জ্বলে উঠলাম না। কেন তাকে ঘৃণা করতে পারছি না।

দাঁত দিয়ে থেকে থেকে ঠোঁট কামড়াচ্ছে বিজয়প্রতাপ। যন্ত্রণা, ভাঙা কব্জির যন্ত্রণা। অথচ হাসি লেপ্টে আছে ঠোঁটে, যেন দুজনের একটা মধুর মধুর সন্ধ্যে কাটল, এবং এখন রাত বেড়েছে বলেই শুধু একটু ক্লান্ত। স্বেদাক্ত কপাল আর তীক্ষ্ম নাসাগ্রে বনেদী সরাইখানার বিচ্ছুরিত আলো, বিশাল শরীরে অঢেল স্বাস্থ্য, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেও কোনদিন নিঃশেষ হবে না। হঠাৎ ভয়ঙ্কর চমকে উঠল বিভাস। এই প্রথম, যেদিন উদয়প্রতাপ সিং ছেলেকে নিয়ে ওপাড়ায় এসেছিলেন তারপর এই প্রথম বিভাস এমন কিছু আবিষ্কার করল যা তার ফুসফুসে যেন আচমকা ছুরি বসিয়ে দিল। তাহলে কি এতদিন ধরে আমি নিজেকেও লুকিয়ে বিজয়প্রতাপকে প্রশংসা করে এসেছি। আমার মনের গভীর অন্ধকারে কি তার এত কীর্তির প্রতি গোপন সমর্থন আছে। আমি যা পারি না বিজয়প্রতাপ তা অবলীলায় পারে বলে কি তার মধ্যে আমি নিজেকে পূর্ণ করার স্বাদ পাই। আমি এক অক্ষম বিজয়প্রতাপ! ওপরে যে পাখাটা ঘুরছিল সেটা যেন ক্ল্যাম্প রড আর্মেচার ব্লেড সবসুদ্ধ বিভাসের মাথায় ছিঁড়ে পড়ল।

ঘুম জড়ান চোখে তাকিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'তুই যেন কাঁপছিস! কাঁপছিস নাকি?'

গল্‌ফ্‌ লিঙ্কসের পর ডানদিকে মোড় নেবার সময় গাড়িটা বাঁয়ে ঘুরে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঘা মারলে বেশ দূরেই নরম মাটিতে ছিটকে পড়েছিল বিভাস! অথচ তখন সেখান থেকে উঠে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে গায়ে কাঁপুনি ধরেনি। এখন এই নরম চেয়ারে এলিয়ে বসে মনে হল, কিসের যেন কঠিন চাপে পুরো শরীরটা থেঁতলে যাচ্ছে। টেবিলের ওপর রাখা নিজের আঙুলগুলোকে মনে হল, একগোছা বড় বড় চাবি। হাতের শিরা যেন ঠেলে উঠেছে, আর তার মধ্যে অনেক বিকৃত ইচ্ছের বিষাক্ত রক্ত। নিজেকে কখনও অত্যন্ত দামী মনে না করলেও, এতদিন মনের কোথায় যেন এমন একটা প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস ছিল যে আমি ভাল, একটা পোশাকী শব্দ ব্যবহার করলে বলা যায়—বিজয়প্রতাপের তুলনায় আমি পরিশীলিত; বিজয়প্রতাপ বড় বেশি চড়া রঙ, বড় বেশি মোটা দাগ, স্থূল, প্রায় হিংস্র জন্তু। কিন্তু আজ এখন বুঝতে পারছি, আমিও জানোয়ার, শুধু বিজয়প্রতাপের মত আমার আদিম হিংস্রতা নেই। আমি দুর্বল, রুগ্ন। তাই আরও বেশি করুণার পাত্র। আমার মধ্যেও একই ক্লিন্ন বাসনা লিকলিকে সাপের মত কিলবিল করে। শুধু অব্যর্থ ছোবল মারতে পারি না। আমি এক অক্ষম বিজয়প্রতাপ!

দাম মিটিয়ে দিয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'ওঠ। তুই বাড়ি যা, আমিও বাড়ি ফিরে যাই।'

দুজন বাইরে এল। কাছে ডেকে আনল দুটো সাইকেল রিক্স। বিজয়প্রতাপ কষ্ট করে জিভটাকে আয়ত্তে এনে বলল, 'বিভাস, আবে মারহুম, তোকে আজ খুন করতে চেয়েছিলাম। হিংসে, বুঝলি, হিংসে। তবে বিশ্বাস কর, তোকে আমি ভালবাসি, চিরকাল।'

দুটো রিক্স দুদিকে চলতে শুরু করেছিল। এক মিনিটের মধ্যে বিজয়প্রতাপের রিক্সটা আবার ঘুরে পাশে এল। গলা বাড়িয়ে বিজয়প্রতাপ বলল, 'বিভাস, তুই ইন্দ্রাণীকে বিয়ে কর।'

বিভাস কিছু বলল না, বলতে পারল না। বিজয়প্রতাপকে নিয়ে রিক্সটা অন্য দিকে মোড় নিল।

রিক্সর পিছনের কাঠটা পিঠে লাগছিল। বাঁ কনুইটা টনটন করছে। পকেটে সিগারেট নেই। রাস্তায় লোক নেই। এই শহর বড় তাড়াতাড়ি ঘুমোয়। এই শহর আমাকে পুড়িয়ে

মারল। বাবার কথা ভাবলেই পরিত্যক্ত গবর্ণমেন্ট হাউসের নিচু পাঁচিলের পাশের দেড়শ' বছরের পুরনো ইঁদারাটার চেহারা মনে আসত, যার পাতলা ইটের দেওয়াল কঙ্কালের মত। এখন নিজের কথা ভেবেও সেই ইঁদারাটার আদল মনে আসছে। পাতলা ইটের দেওয়ালে শ্যাওলা নেই, যেন দাঁত বের করে হাসছে। এই শহর এখন থেকে আমার ভিতরের অক্ষম জানোয়ারটাকে দেখে ফেলে হাসবে। এই শহরে আমি আর থাকব না। এখানে থেকে কী হবে।

আজ বুঝতে পারছি, কেন বিজয়প্রতাপের সঙ্গে গঙ্গার বালি খুঁড়ে আবার তার সঙ্গেই ছায়ার মত ফিরে এসেছিলাম, কেন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিই নি, রাগে জ্বলে উঠি নি, কেন এতদিন তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রেখেছি। তার সব কীর্তির প্রতি আমার গোপন সমর্থন ছিল। নিজেকেও লুকিয়ে তাকে প্রশংসা করেছি। আমি যা পারি না, বিজয়প্রতাপ তা অবলীলায় পারে। তার মধ্যে আমি নিজেকে পূর্ণ করার স্বাদ পাই। এখন বুঝতে পারছি, কেন বিজয়প্রতাপ আজ আমাকে খুন করতে চাইলেও তার সঙ্গেই ছায়ার মত সিভিল লাইন্সের সদর মহল্লায় ফিরে এসেছি। গল্‌ফ্‌ লিঙ্কস থেকে ফিরে বনেদী সরাইখানার বিচ্ছুরিত আলোয় উদ্ভাসিত বিজয়প্রতাপের বিশাল শরীর কেন সুন্দর মনে হয়েছে, আজ বুঝতে পারছি।

আকবর ফোর্টের পাথুরে দেওয়াল থেকে খানিক দূরে নরম মাটিতে টেনে তোলা নৌকোয় বসে বিজয়প্রতাপ যেদিন প্রথম তার অভিজ্ঞতা বলল, সেদিন থেকেই, বরং তার কিছু আগে থেকেই, আমার দুকান কাটা। সিংবাড়ির নির্জন ঘরে ইন্দ্রাণীর হাত ধরে অন্ধকারে ডুব দেওয়ার স্বাদ আমিও পেয়েছিলাম, বিজয়প্রতাপের উল্লসিত বর্ণনা থেকে নিজেকেও না জানিয়ে স্বাদ নিয়েছিলাম। গল্‌ফ্‌ লিঙ্কসের পরে ডানদিকে মোড় নেবার সময় বিজয়প্রতাপের স্টিয়ারিং-ধরা বলিষ্ঠ হাতের ওপর আমার দুর্বল হাত রেখে লুকিয়ে মোচড় দিয়েছিলাম বাঁয়ে, অ্যাক্‌সিলারেটরে তার পায়ের ওপরে আমার পা চেপে ধরেছিলাম। তার আদিম হিংস্রতায় মুগ্ধ হয়ে মনের কোন দুর্লক্ষ্য অতলে এইসব করেছিলাম। অন্তত নরম চেয়ারে বসে বিচ্ছুরিত আলোর তলায় বিজয়প্রতাপের বিশাল সুন্দর শরীরের দিকে তাকিয়ে এইসব করেছিলাম। এইসব করে, এইভাবে আমাকে মারতে গিয়ে, তার মধ্যে নিজেকে পূর্ণ করার স্বাদ নিয়েছিলাম। আমি এক দুর্বল, রুগ্ন, অক্ষম বিজয়প্রতাপ!

ইন্দ্রাণী একদিন বলেছিল, সে নাকি পুড়ে ছাই। এখন আমিও পুড়ছি। একটু পরেই ছাই হয়ে যাব।

রিক্সা থেকে নেমে বিভাস নবাব খানের বাগানে ঢুকল। জঙ্গল হয়ে আছে। ভাল করে কিছু দেখা যায় না। ডালিম গাছটার তলায় গভীরতর অন্ধকার। তার এবাড়ির অন্দরে প্রবেশের অভ্যেস নেই। এখন অনেক রাত হয়েছে। সবাই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। এসময়ে তার এ বাড়িতে আসা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। কিন্তু এখনই ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলা দরকার। কাল হয়ত এই অস্থিরতা থাকবে না, যথেষ্ট জোর দিয়ে কিছু বলতে পারবে না।

বারান্দায় উঠে দেখল, ইন্দ্রাণীর ঘরের জানলা খোলা, আলো জ্বলছে। হয়ত আজকাল দেরিতে ঘুমোতে যায়, হয়ত কিছু পড়ছে। ইন্দ্রাণী হয়ত জানে আমি এখনও ফিরি নি। হয়ত সেই কারণেই ঘুমোতে পারে নি। আমার জন্যেই ঘুমোতে পারে নি? অবশ্য এসব ভেবে আর কী হবে। এসবের এখন আর কোন দাম নেই।

বিভাস ভূতের মত জানলায় আলোর সামনে এসে দাঁড়াতে তার সুদীর্ঘ ছায়া বাগান পর্যন্ত প্রসারিত হল। পায়ের শব্দে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী ভিতরের বারান্দা ঘুরে বাইরে এল। বিভাসের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এত রাত্তির পর্যন্ত কোথায় ছিলে?'

'বাইরে একটু আটকে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যেয় তোমার সঙ্গে বেরোবার কথা ছিল, সময়মত ফিরতে পারি নি, দুঃখিত।'

'এমন মেপে মেপে কথা বলছ কেন? ঘরে এস।'

'না, এখানে একটু দাঁড়াও। তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।'

বিভাস ভেবেছিল, ইন্দ্রাণীর ঘরে যাবে না। বড় হয়ে কোনদিন যায় নি। আজ এখন আর ইন্দ্রাণীর ঘরে যাবে না। অথচ যেতে হল। ইন্দ্রাণী চাপা গলায় এমন জোর দিয়ে ডাকল যে তার ঘরে যেতে হল।

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসেই কোন ভূমিকা না করে বিভাস বলল, 'আমি কাল বিতোষের ওখানে চলে যাব। এখানে এই শহরে আর থাকা সম্ভব হল না।'

ইন্দ্রাণী চুপ করে কিছুক্ষণ শুধু বিভাসকে দেখল।

'আমি পালিয়ে যাচ্ছি, এই পরিচিত শহর থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। এতদিন বোধহয় আমার প্রচ্ছন্ন অহমিকা ছিল। নিজেকে এত ঘৃণ্য কখনও মনে হয় নি। আজ বুঝতে পারছি সব মিথ্যে। আজ বুঝতে পারছি আমার মধ্যে একটা জানোয়ার আছে। সেই জানোয়ারটা আজ হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে।' বিভাস প্রথমে মেপে মেপেই কথা শুরু করেছিল। এখন সব এলোমেলো হয়ে গেল।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলে বল তো?'

বলতে হল, আজকের রগরগে অভিজ্ঞতার টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিতে হল ইন্দ্রাণীকে।

'আমার এতদিনের আচরণের ব্যাখ্যা আজ পেলাম। এখনও বিজয়প্রতাপের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার কারণ আজ বুঝলাম। আমি তীব্র কঠিন কিছু বলতে পারি না, দর্শনীয় কিছু করতে পারি না। আমার গোপন ইচ্ছেগুলো বিজয়প্রতাপকে আশ্রয় করে বেঁচেছিল। তার মধ্যে আমি নিজেকে পূর্ণ করে বেঁচে আছি। এতকাল নিজেকেও না জানিয়ে তাকে প্রশংসা করে এসেছি। আজ সে আমাকে মারতে চেয়েছিল। অথচ গল্‌ফ্‌লিঙ্কস থেকে ফিরে এসে জোরাল আলোর তলায় তার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার চোখে ঘৃণা নেই, তার ওপর আমার রাগ নেই। বরং মনের কোথায় যেন তার প্রতি সমর্থন লুকোন আছে। আমি এক রুগ্ন বিজয়প্রতাপ! আমি তার থেকেও ঘৃণার, করুণার পাত্র।' বিভাস পাশের টেবিলের ওপর রাখা খোলা বইখানার কয়েকটা পাতার কোণ আঙুল দিয়ে ঘষতে ঘষতে ছিঁড়ে ফেলল।

ইন্দ্রাণী বিছানার পাশে বসে শুনছিল। এখন উঠে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি বিভাসের চোখের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'নিজেকে এমন ব্যবচ্ছেদ করার চেষ্টাও অহমিকা। নিজেকে ছোট করে দেখানর মধ্যে একটা বাহাদুরি আছে। কিন্তু সে বয়েস তুমি পার হয়ে এসেছ, বিভাস। এখন অকারণে যন্ত্রণা ডেকে এনো না, আমাকেও শুধু শুধু যন্ত্রণা দিও না। বিজয়প্রতাপকে আমি চিনি, তোমাকেও। তার সঙ্গে তোমার নিজেকে জড়ানর কোন মানে হয় না। বিজয়প্রতাপ একটা দুর্ঘটনা, শুরু থেকে এপর্যন্ত একটা পুরো নিখাদ দুর্ঘটনা।'

ইন্দ্রাণী একটু থেমে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল, তখনই দেওয়াল ঘড়িতে এগারটা বাজল। এবং ঠিক তখন বেগম খোলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে এসে বললেন, 'বিভাস কি বাড়ি থেকে এলে, না বাইরে থেকে?'

'বাইরে থেকে এলাম। আমি এখনও বাড়ি যাইনি। আজ খুব দেরি হয়ে গেল।'

'তাহলে এখন বাড়ি যাও। তোমাদের বাড়িতে যে লোকটা কাজ করে সে এখানে এসেছিল তোমার খোঁজে। তোমার বাবা হয়ত ভাবছেন।'

বিভাসের ইচ্ছে হল বলে—বাবা এসব ভাবেন না। কিন্তু কী হবে। এখন বসে বসে বেগমের সঙ্গে কথা বলা অর্থহীন। বিভাস একবার দেখে নিল, বেগম তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন কিনা। কিছু বুঝতে পারল না। বেগমের ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসিটা লেপ্‌টে নেই। হয়ত বেগম এই মুহূর্তে হাসিটা লুকিয়েছেন। প্রায়ই লক্ষ্য করেছে, বেগম তার দিকে তাকিয়ে কেমন ঠোঁট চেপে হাসেন, যেন বিভাসের সর্বকিছু তিনি জেনে ফেলেছেন।

বিভাস উঠল, ইন্দ্রাণী তাকে এগিয়ে দিতে এল বাগান পর্যন্ত। অন্ধকারে বিভাসের হাতে চাপ দিয়ে বলল, 'কাল তোমার সঙ্গে কথা বলব। এখন চুপ করে থেকে আবার আমি নিজেকে পুড়িয়ে মারব না।'

বিভাসের হাতটা টনটন করে উঠল। আঙুলগুলো কি মচকে গেছে। বাগান থেকে বেরিয়ে এল। আমি ইন্দ্রাণীর ঘরে কেন এসেছিলাম। আমি কি চেয়েছিলাম ইন্দ্রাণী কাঁপা-কাঁপা গলায় বলবে—'না, তুমি যেও না!'

নিজের ঘরে এসে হঠাৎ মনে হল, বেগমের সঙ্গে এই শহরের আশ্চর্য মিল। রাজ্যপাট গেছে, তবু নানাবিধ চড়ারঙের বিচিত্র মুখোশ। মুখ কখনও দেখা যায় না। বেগম দুঃসহ হলে এই শহরও অসহ্য।

পনের

ট্রেনের জানলার কাচ আর কাঠের ফ্রেমের ফাঁকে কয়েকটা পোকা মরে পড়ে আছে। কাল রাত্রে আলো দেখে অজস্র পোকা এসেছিল। তার কয়েকটা কেমন করে যেন আটকে গিয়েছিল কাচ আর কাঠের ফ্রেমের ফাঁকে। ট্রেন ডেহরি-অন-শোন থেকে ছাড়লে প্রথম সকালবেলার নরম রোদ পড়েছিল মরা পোকাগুলোর মসৃণ চিকন ডানায়। আর একটু পরে হয়ত পিঁপড়ে আসবে, কুরেকুরে খাবে মরা পোকাগুলোকে। ট্রেনের কামরায় কি পিঁপড়ে আসে।

সাসারাম জংশন থেকে এইমাত্র ট্রেন ছাড়ল। সকাল সাতটা বাজতে মিনিট পনের বাকী। এখনও জানলা খুলতে সামনের বেঞ্চের মহিলাটির আপত্তি। বাইরে ঠান্ডা হাওয়া। সাসারামে চা পেয়েছিল। শূন্য কুল্‌হাড় এখনও বিভাসের হাতে। কোথায় ফেলবে ভাবছিল। আঙুলের ফাঁকে আর চায়ের তলানীতে কয়লার গুঁড়ো। সারা রাত জানলা বন্ধ ছিল, তবু অনেক কয়লার গুঁড়ো এসেছে। একটি মাত্র রাত্রে এই যাত্রীরা কামরাটাকে কী বিশ্রী নোংরা করেছে। দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি, সিগারেটের টুকরো আর ছাই, চায়ের কুল্‌হাড় ইত্যাদি ফেলে বিভাসও অন্য সবাইকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

মাত্র একমাস আগে ঠিক এই পথে বিভাস তার আজন্ম চেনা শহর থেকে পালিয়েছিল। আজ আবার ঠিক সেই পথে তার আজন্ম পরিচিত শহরে ফিরে যাচ্ছে। পালিয়ে যাওয়ার

কোন মানে হয় না। ফিরে আসারও কোন অর্থ নেই। বস্তুত এখন কোন কিছুরই আর যেন কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। মিথ্যের মুখোশটা ছিঁড়ে আসল চেহারাটা দেখে ফেলার পর আর কোথাও গিয়ে কিছু হবে না। বেগমের মত বিচিত্রবর্ণ না হলেও এতদিন একটা মুখোশ ছিল। সেই মুখোশ ছিঁড়ে গেছে। নিজের হাতে বিভাস ছেঁড়েনি, এমনিতেই ছিঁড়েছে। বিভাস কখনও দর্শনীয় কিছু করতে পারে না।

কাল রাত্রে যে শেয়ালটাকে দেখেছিলাম সে আমার নিখুঁত উপমা। অকারণ ক্ষিপ্রতায় শেয়ালটা দৌড়ে পালিয়েছিল। যেন দৌড়ের কসরত দেখিয়ে মুগ্ধ করার জন্যে ছুটে পালিয়েছিল। একটা পেয়ারাগাছের ছায়ায় ট্রেনের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল, আশঙ্কা ছিল না, বিস্ময় ছিল না, যেন আত্মপ্রত্যয়ের একটি নিপুণ মুদ্রা। অথচ কী যে হল, আচমকা এক পাক খেয়ে নিজের ছায়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল। কোন দুর্নিরীক্ষ্য দূরে যায়নি, একটা কাঁটার জঙ্গলে শরীর ঢেকেছিল। ট্রেন চলে গেলে কাঁটাঝোপের আবরু থেকে বেরিয়ে এসেছিল আবার। কিন্তু শুধু এই পর্যন্ত। এর পর আর মিল নেই। বরং কাল রাত্রে যে দুটো উট দেখেছিলাম এখন আমি তাদের মত। উট দুটো যেন মরে ফোত হয়ে যাওয়ার পরও পিঠে বিপুল ভার নিয়ে হাঁটছিল। অবশ্য এসব ভেবেও আর কিছু হবে না। এসব ভাবনাও হয়ত প্রচ্ছন্ন অহমিকা থেকে আসে। অন্তত ইন্দ্রাণী তাই বলবে। হয়ত বলবে—এসব উপমার রীতি পচে গেছে।

গল্‌ফ্ লিঙ্কস্ থেকে ফেরার পরদিনই তার আজন্ম চেনা শহর ছেড়ে যেতে চেয়েছিল, পারেনি। আরও দু'দিন দেরি হয়েছিল ট্রেনে উঠতে। ইন্দ্রাণীর অনেক ধারাল কথা শুনতে হয়েছিল পরদিন। ইন্দ্রাণী কথা বলতে শিখেছে। অবশ্য বিভাস ভাল করে কিছু শোনে নি। শুধু ভেবেছিল, তার আসল চেহারাটা দেখে ফেলতে আর কারও বাকী নেই। তবু শেষ পর্যন্ত হয়ত থেকেই যেত, লুকিয়ে কলকাতার ট্রেনে উঠে পড়তে পারত না, যদি না উকিলবাবুর মেয়ে জবা নতুন করে খুঁচিয়ে জ্বালা ধরাত। আজ আবার মাত্র একমাস পরে সেই ট্রেনে তার আজন্ম চেনা শহরে ফিরে যাবে। পালিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না, ফিরে আসারও কোন অর্থ নেই। তবু ফিরে যাবে।

ইন্দ্রাণী বলেছিল—'বুঝলাম, কোন দুর্বোধ্য কারণে তোমার নিজের ওপর ঘৃণা হচ্ছে, অন্য কারও ওপর না। কিন্তু এখান থেকে চলে গেলে কি নিজের কাছ থেকে পালান যায়? নিজেকে তো পিছনে রেখে কোথাও যেতে পারছ না।'

ইন্দ্রাণী ঠিক বলেছিল সন্দেহ নেই। নিজেকে পিছনে রেখে কোথাও যেতে পারবে না। মনে হয়েছিল, তার আসল চেহারাটা দেখে ফেলতে কারও আর বাকী নেই, তবু ইন্দ্রাণী যেন সবটুকু বুঝতে পারছে না, তার যন্ত্রণার চেহারাটা দেখতে পারছে না। এক মাস আগে সেদিন জবাকে ঘরের মধ্যে রেখে অমন করে দাঁতে দাঁত চেপে বেরিয়ে না গেলে ইন্দ্রাণী হয়ত আমাকে ঠিক চিনতে পারত।

ট্রেনে উঠবার আগের দিন বিভাস ইন্দ্রাণীকে বলেছিল, 'আমি চেষ্টা করেও হাসতে পারি না। আমি আর কোনদিন হাসতে পারব না। কারণ আমি লুকিয়ে হাসতে শিখেছি।'

'কান্না আসার মত তীব্র বোধও তো তোমার আছে মনে হয় না।' ইন্দ্রাণীর কথায় সেদিন খুব ধার ছিল। 'তাছাড়া ওদু'টোর কোনটাই অত্যাবশ্যক না। ওদু'টোর কোনটাই না থাকলেও এখান থেকে চলে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।'

ইন্দ্রাণী ইদানীং বেশ কথা বলতে শিখেছে।

আগে থেকে কোন খবর না দিয়ে হুট্ করে হাজির হওয়ায় বিতোষরা অবশ্যই অবাক হয়েছিল। তাদের আশ্চর্য লাগা খুব স্বাভাবিক ছিল। তবে তারা একটির পর একটি জেরা করে বিভাসকে বিব্রত করে নি। তারা কী ভেবেছিল, তারা নিজেদের মধ্যে কী কথা বলেছিল, বিভাস জানে না। তারা বিভাসের সঙ্গে আচরণে বুঝতে দেয়নি, অস্বাভাবিক কিছু হয়েছে। বাবাকে রেখে হঠাৎ এমন চলে আসা যেন খুব স্বাভাবিক। বাঙলা স্কুলের সেজ দিদিমণির সঙ্গে বিভাসের কখনও ঘনিষ্ঠতা ছিল না, এখনও হয় নি। বিতোষ তার নতুন চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। বিভাসেরও হয়ত একটা চাকরি পেয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। তিন মাস, ছ'মাস, এক বছর অপেক্ষা করলে হয়ত একটা চাকরি পেয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। এত দীর্ঘ সময় বেকার বসে থাকলেও বিতোষ তাকে খোঁচাত না আশা হয়। বিতোষকে মনে হয় বেশ সচ্ছল। বিতোষদের ফ্ল্যাটে তার থাকবারও অসুবিধে ছিল না। দু'ঘরের ফ্ল্যাট। ওই শহরের অবিশ্বাস্য ভিড়ে তিনজনের জন্যে দু'খানা ঘর অবশ্যই সৌভাগ্য। অসুবিধে সত্যি বিশেষ ছিল না। তবু এক মাস পরে আবার ট্রেনে উঠে পড়ল। ফিরে যাবে। কোন কিছুরই যখন আর কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন ফিরে না যাওয়াও অর্থহীন।

এমন ভয়ঙ্কর ভিড় বিভাস আগে কোথাও দেখেনি। মানুষ এমন পরস্পরের গায়ে ঠেসাঠেসি করে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। রাস্তায় একটু অসাবধান হলে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। সবার শরীরে যেন জ্বরের উত্তাপ, সবাই অস্থির। যে কোন মুহূর্তে নাটকের শেষ দৃশ্যের মত গুরুতর কিছু ঘটতে পারে। কী এক উত্তেজনায় সবাই যেন কাঁপছে। পুরো এক মাস বিভাস বাইরে বাইরে ঘুরেছে, ওই শহরের অন্দরে ঢোকার দরজা একবারও খুঁজে পায় নি। পুরো এক মাস শুধু বাইরে বাইরে ঘুরেছে, মনে হয়েছে, যে শহরে ঋতু বদলায় দোকানের জানলায় তার কোথায় যেন বিচিত্র তীক্ষ্ণ কঠিন সুন্দর এক প্রাণ আছে, যার খোঁজ বিভাস একবারও পায় নি।

প্রথমে চমকে গিয়েছিল, তারপর বরং উৎসাহিত হয়েছিল বিভাস। ভেবেছিল, ওই ভিড়ে জড়িয়ে যাবে। নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মন তেতো হয়ে যাবে না, কারণ নিজের দিকে তাকাবার অবকাশ মিলবে না। পরে বুঝেছিল, ইন্দ্রাণী ঠিকই বলেছিল। নিজেকে পিছনে রেখে কোথাও যেতে পারবে না।

কতকাল আগে ওই শহরেই তার বাবা ছিলেন ছোটবেলায়। বিতোষের কৈশোর আর প্রথম যৌবন ওই শহরে কেটেছে। অন্য কোথাও গেলে বিতোষ প্রবাসীর মত থাকে। এখন আবার ওখানে ফিরে গিয়ে বেঁচেছে। অথচ বিভাস ওখানে হাত বাড়িয়ে ধরবার মত কিছু পেল না। নিজেকে ধরে ফেলে, নিজের আসল চেহারাটা ধরা পড়ে যাওয়ায়, শুধু আরও বেশি করে লুকিয়ে হাসতে শিখেছে। পুরো এক মাসে বিতোষরা ছাড়া আর একজনের সঙ্গেও ভাল করে আলাপই হল না। দু'একজনের সঙ্গে একআধটু কথা বলে দেখেছে, খুব মসৃণ আচরণ। এক টুকরো স্নিগ্ধ অথচ মাপা হাসি উপহার দিয়েই শেষ। আসলে ওখানে ব্যস্ততা অনেক বেশি। দরবারী মেজাজ, ঢিলেঢালা ভাবও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বিভাস এক মাসে তার খোঁজ পায় নি।

বিতোষদের ঘর দু'খানা যেন কারও দিনরাত থাকবার জন্যে না, শুধু দু'খানা ঘরের একটা নক্শা। কোথাও এতটুকু খুঁত নেই, একবিন্দু বাড়তি নেই। যেন পরে কখনও ঘর তৈরি হবে, এখন শুধু নক্শা। ঘর দু'খানার সঙ্গে তাদের পুরনো একতলা ন্যাড়া

ছাতের বাড়িটার তুলনা করলে চোখ গোল গোল হয়ে আসে। বাবাকে বলে এসেছিল—এমনিই বিতোষের ওখানে বেড়াতে যাচ্ছে। আবার সেই ছায়াছায়া ঠান্ডা বাড়িতে ফিরে যাবে। তিনি কিছু বুঝতে পারবেন না। বিভাস যে সত্যিই শেয়ালের মত পালাবে, গল্‌ফ্ লিঙ্কস্ থেকে ফেরার দু'দিন পরে লুকিয়ে ট্রেনে উঠে পড়বে, ইন্দ্রাণী ভাবেনি। ইন্দ্রাণী আমার যন্ত্রণার চেহারাটা সবটুকু দেখতে পারছে না।

কারও প্রিয় নাম ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার খেলাটা আর সবার মত বিভাসও ছোটবেলা থেকে জানত। তখন সকালবেলার রোদে ভিজে ঘাসে ঢাকা উধাও মাঠের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ইন্দ্রাণীর নাম উচ্চারণ করে দেখল, মোটেই মিলছে না। নামটাতে বড় বেশি ধ্বনির ভার। ছেলেমানুষি খেলাটা এখন আবার কেন মনে এল। তার এমন করে চলে আসা এবং এক মাস পরে আবার ফিরে যাওয়াই যথেষ্ট হাস্যকর ছেলেমানুষি।

জানলার কাচটা ঠিক স্বচ্ছ না, অনেক জলের দাগ এবং খুব অপরিচ্ছন্ন। কাল রাত্রে এই কাচের জানলার মধ্য দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের পিঠের মত অসমতল মাঠ, সযত্ন-লালিত ফলের বাগান, ছড়ান ছিটোন জঙ্গল, কাঁটাঝোপ—সব গলে গলে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। জানলার ফ্রেমে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করেছিল বিভাস, উথালপাতাল অন্ধকারে ডুব দিয়েছিল। কৈশোর যৌবন, দৃশ্য দৃশ্যান্তর সব গলে গলে পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে মিশে একাকার হয়েছিল। কাল ট্রেনের কামরার বাইরে ঝাঁঝাঁ রাত দুপুরের হাওয়ায় শেষ হেমন্তের হিম ছিল। এখন সকালবেলার নরম রোদ। সামনের বেঞ্চের বছর দশেকের ছেলেটা উঠে বসেছে এই মাত্র। মেদের ভারে কাহিল মহিলাটি বেঞ্চে পিঠ রাখবার জায়গাটায় মাথা ঠেকিয়ে এতক্ষণে বুঝেছেন, আর ঘুমের চেষ্টা করা চলে না। ড্যাক্রনের ট্রাউজার পরা লোকটি ক্রমাগত চুলে চিরুনি চালাচ্ছেন। বিভাস জানলার কাচের পাল্লাটা তুলে দিল। মনে হল, এখন আর কারও অসম্মতি নেই।

কয়েকটা পিঁপড়ে সত্যিই এসেছে। কেমন করে এল, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। মরা পোকাগুলোর শুকনো চিকন ডানা কুচি কুচি করে কাটছে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে কাঠের ফাঁকে ফেলে দিলে হয়। মরা পোকাগুলোর শুকনো চিকন ডানা আর হাভাতে পিঁপড়েগুলো পুড়বে। অবশ্য কাজটা বেআইনী এবং বিপজ্জনক। সামনের মহিলাটি নিশ্চয়ই খেঁকিয়ে উঠবেন। এমন একটা কাজ করার মত নিষ্ঠুরতা শিশুদের থাকে। কৈশোরেও কারও কারও থাকে। বিভাসের শৈশব এবং কৈশোর অনেক দূর। উত্তর তিরিশের ট্রেন সব দরজা খুলে স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। অবলীলায় উঠে পড়া যায়। এবং উঠে পড়তে আর তেমন বাকী নেই। একবার ন্যাড়া ছাতে গম্বুজের ছায়ায় এক ঝাঁক পিঁপড়ে দেখেছিল। অত তাড়াতাড়ি অত পিঁপড়ে যে কেমন করে এল, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। উড়তে শেখার আগে একটা আবাবীল উঁচু থেকে পড়ে ফেটে গলে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অন্য কোন বড় পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়েছিল সেটাকে। তবু ছাতের কাল রঙে জলের মত কী যেন লেগেছিল। সেখানে এসে জমেছিল এক ঝাঁক পিঁপড়ে। রাজাপুর কবরখানায় মা'র কবরে ফুল রাখার সময় পিঁপড়ের একটা ঘন মোটা সার দেখেছিল। বৃষ্টি জোরে নামলে কি কয়েকটা পিঁপড়ের গলা ছিঁড়ে যায়নি। একটা বুনো পোকা পায়ের ওপর উঠেছিল। এসব কেন যে এখন মনে পড়ছে!

ভেবে দেখল, খুব ছোটবেলায় বিভাসের এমন নিষ্ঠুরতা ছিল না। অথচ শিশুদের অনেকেরই থাকে। এখন এই বয়েসে ইচ্ছে হল দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে কাঠের ফাঁকে

ফেলে দেবে। অবশ্য ফেলে দেওয়া হল না। ইচ্ছেটাকে মনে মনে প্রশ্রয় দিল কিছুক্ষণ। শুধু সিগারেট ধরাতে গিয়ে ডান হাতের একটা আঙুলে একটু বেশি তাপ লেগে গেল।

ট্রেনটা থামল। মোগলসরাই। এই স্টেশনের নামটার পুরনো অনুষঙ্গ কৈশোরে বিভাসকে টানত। এখানে ট্রেন প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়াবে। ট্রেন প্রায় খালি করে সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। আবার ট্রেনে ওঠার আগে শরীর থেকে সারা রাতের ক্লান্তি আধঘণ্টায় ঝেড়ে ফেলবে। প্ল্যাটফর্ম থেকে এই সংক্ষিপ্ত অবসরে যতটুকু পারে সুখ কুড়িয়ে নেবে।

পাশের কামরার মেয়েরা তাদের দলের ছেলেদের প্রসারিত বাহু আশ্রয় করে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে নামল। এক ঝাঁক সাদা আর বাদামী বুনো হাঁস জঙ্গলের আব্রু থেকে বেরিয়ে এসে এইমাত্র জলে নামল। তারা কী করে যেন বুঝতে পেরেছে, আশপাশের সবাই চোখ রেখেছে তাদের ওপর। তারা ঠিক বুঝতে পারে, আশৈশব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে। কী করে যেন বুঝেছে, সেই সব চোখের সুখের জন্যে সব সময় দর্শনীয় কিছু করার দায়িত্ব একমাত্র তাদের। ছেলেদের এবং দুজন অধ্যাপিকা আর একজন অধ্যাপকের অঙ্গে যথেষ্ট পোশাক। শুধু মেয়েদের প্রত্যেকের জুতোর ওপর থেকে শুরু করে পায়ের ঊর্ধ্ব প্রত্যন্ত পর্যন্ত একেবারে আদুড়। কাল রাত্রে যখন এদের দেখেছিল, অনেক কুয়াশার পরত ডিঙিয়ে আসা নীলাভ আলো ছিল। এখন সকালবেলার রোদ। বেলা বাড়ছে। রোদ আর বেশিক্ষণ নরম থাকবে না। গালের আর জানুর অবারিত ঊর্ধ্বভাগ মোমের মত গলে যাবে।

কয়েকজন নীল শার্ট-প্যান্ট পরা কনিষ্ঠতম রেলকর্মী আর অন্য যারা এই পরস্পরের গায়ে ঢলঢলে পড়া মেয়েদের হাঁ করে দেখছে তাদের চোখেমুখে বেহায়াপনা থেকে, হ্যাংলামি থেকে বিস্ময় বেশি। আরও অনেকে এই মেয়েদের দেখছে, বিভাসও। তবে অমন হাঁ করে দেখছে না। এখন কারও সঙ্গে তর্ক করার মেজাজ থাকলে বিভাস বলত—ওই লোকগুলোকে ঘেন্না করার কোন মানে হয় না। এই বুনো হাঁসের মত অস্থির উদম এবং সুন্দর মেয়েরা ওদের প্রাত্যহিকতায় প্রচণ্ড আঘাত। এই মেয়েদের সঙ্গে ওদের দুস্তর ফারাক মাপতে গিয়ে ওদের ঠোঁট ফাঁক হয়ে দাঁত বেরিয়ে এসেছে। এমন হাঁ করে দেখা খুব স্বাভাবিক।

এই মেয়েদের এই ছেলেদের দেখলে বুঝতে পারি আমার বয়েসটা ওইখানে এসে থেমে যায়নি। মাঝে মাঝে একটা মিথ্যে ভয় হয়। ওই বয়েসেও অমন অস্থির ছিলাম না। অমন দর্শনীয় হবার বাসনা কোন দিন ছিল না। ইন্দ্রাণীও ওই বয়েসে অমন ছিল না। বিজয়-প্রতাপ হয়ত ছিল। তা হলে কি বাসনাটা আমারও ছিল, শুধু সাধ্য ছিল না। আমার বয়েস সত্যিই বেড়েছে। এক জায়গায় এসে থেমে যাওয়ার ভয়টা মিথ্যে। তা না হলে এই প্রায় আধঘণ্টায় একবারও প্ল্যাটফর্মে নামবার ইচ্ছে হল না কেন। হাতপায়ে খিল ধরে গেছে। একবার প্ল্যাটফর্মে নামলে একটু ভাল লাগত সন্দেহ নেই।

চা বিস্বাদ মনে হল। কুলহাড়ে পোড়ামাটির গন্ধ। চায়ের সঙ্গে অন্য কিছু নিলে হত। অথবা সাদা উর্দিপরা যে লোকগুলো কাঁধের ট্রেতে সাদা পেয়ালা পিরিচ নিয়ে ছুটছে তাদের একজনকে চা দিতে বললে হত। কিন্তু এখন আর সময় নেই। কাল সন্ধ্যায় বিতোষদের বাড়ি থেকে বেরোবার পর চা ছাড়া আর কিছু খায়নি।

ট্রেন ছাড়ল। আর ঘণ্টা তিনেক। তারপর সেই শহর যা তাকে পুড়িয়ে ছাই করেছে। ফিরে যাবার কোন অর্থ নেই। তবু ফিরে যাবে। এখন থেকে সেই শহর তাকে দেখে দেখে

শুধু হাসবে। তবু ফিরে না যাওয়াও হাস্যকর ছেলেমানুষি।

কামরার মধ্যে চোখেমুখে জল দেওয়া সম্ভব না। এই ভিড় ঠেলে এগোনোর উৎসাহ নেই। আগের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামা উচিত ছিল। চুলের মধ্যে কয়লার গুঁড়ো, হাত-মুখ চিটচিট করছে। থুতনির কর্কশ দাড়িতে বাঁ হাতের উল্টো পিঠ ঘষল। আর পাঁচ বছরে সামনের বেঞ্চের ছেলেটার চিবুকে রেশমের রোঁয়া উঠবে। সিগারেট ধরাতে গিয়ে একটা আঙুলে একটু বেশি তাপ লেগেছিল। এখনও জ্বলছে। নখ দিয়ে অনেক বালি খুঁড়লে অবশেষে আঙুলের ডগা জ্বালা করে।

হয়ত শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রাণীকে এড়িয়ে ট্রেনে উঠে পড়তে পারত না, যদি না জবা নতুন করে খুঁচিয়ে জ্বালা ধরাত। এক মাস আগে সেদিন দুপুরটা দুঃসহ ছিল। ভাবছিল, যে কোন মুহূর্তে ইন্দ্রাণী আসবে। ইন্দ্রাণী এল না। তার বদলে এল জবা। বেড়ালের মত নিঃশব্দে তার নির্জন ঘরে এল। জবার হাতে তার ঘর থেকে নেওয়া একখানা বই ছিল। ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় বিভাস নিজে বসেছিল। তাকে উঠবার সময় না দিয়ে বিছানার পাশে পা ঝুলিয়ে বসল জবা।

মেয়েটা নিশ্চয়ই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মক্‌শ করে দেখেছে, ঠিক কোন্ ভঙ্গীতে তার শরীর সব থেকে তীক্ষ্ণ হয়। শিয়রের দিকে একটু সরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে জবা শেলফ থেকে আর একটা বই টেনে নিল। আগের বইখানা রেখে দিল শেলফে। চোখে ঠোঁটে অবিশ্বাস্য মোচড় দিয়ে হাসল। বলল, 'আজ এই বইটা নেব।' যেন বিভাস গ্রন্থা-গারিক আর এই ঘরে থরে থরে মুখরোচক বই সাজান আছে।

বই হাতে নিয়ে আজ খোলা পাতায় চোখ আটকে রাখল না জবা। বারেবারে চোখের কোণ দিয়ে বিভাসের দিকে ফিরে ফিরে তাকাল। অথচ অন্যদিন জবা এমন করে না। খোলা পাতায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। ভাবে, বিভাস তার শরীরের ডৌল দেখছে। অন্য দিন বিভাসের বলতে ইচ্ছে করে—আমার কাছে কিছু চেও না। ইতিমধ্যে আমি উচ্ছিষ্ট হয়ে গিয়েছি, রস নিংড়ে নেওয়া আখের সাদা ছিবড়ের স্তূপের মধ্যে আমার ছিবড়েটাও ছুড়ে ফেলে দেওয়া যায়।

সেদিন খোলাপাতায় চোখ আটকে রাখতে পারল না জবা। সেদিন দুপুরে তার সেই বয়েসের ভার অসহ্য হয়েছিল। যেন নিজের শাড়ি সামলাতে নাজেহাল হয়ে বিভাসকে ডাকল—'এখানে একটু আসুন তো।' এমনভাবে ডাকল যেন বিভাস তার ক্রীতদাস। অথচ ঠিক সই সময় জবার গলায় বিচিত্র প্রার্থনা, তার চোখ আশ্চর্য বিষণ্ণ।

বিভাস চেয়ার থেকে উঠে দু'পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

'এ কী! আপনার হাতে কী হয়েছে?' কথায় প্রচুর বিস্ময়, অথচ জবা মোটেই গলা চড়াল না।

'ও একটু ছড়ে গেছে।' বিভাস অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

ঠিক তখন জবা উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এসে বসল।

ভুরু কুঁচকে বিভাস বলল, 'দরজা বন্ধ করলে কেন?'

'এমনি।' জবা কেমন করে যেন হাসল। কেঁপে কেঁপে দুটো পুরু ঠোঁট সরে গেলে দাঁত দেখা গেল। বিছানায় গা এলিয়ে দিল জবা। সেই দুঃসহ দুপুরে তার সেই বয়েসের শরীর ঢেউ হল।

দাঁতে দাঁত চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিভাস। দরজা খুলে বেরোবার সময়

পিঠের ওপর কী একটা এসে পড়ল। বিছানা থেকে জবা বইটা ছুঁড়েছে, বুঝতে পারল।

বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে স্ট্রেচি রোড ধরে জোরে হাঁটছিল। অকারণে জোরে হাঁটছিল। অনেক দূর এসে হঠাৎ মনে হয়েছিল, জবা মেয়েটা বেশ, চর্বির বড়ার মত। আর ঠিক সেই সময় বুঝেছিল, তার মধ্যে যে রুগ্ন দুর্বল জানোয়ারটা আছে সেটা আবার বেরিয়ে এসেছে। আমি বন্ধ দরজা খুলে বাইরে এলাম। অথচ ভাবছি, জবা ঢেউ হতে জানে। বিজয়প্রতাপ হলে বন্ধ দরজা খুলে বাইরে আসত না, অনেক দূর এসে ভাবত না জবার শরীর ঢেউয়ের মত, বরং নিজে দরজা বন্ধ করত। আমি যদি বন্ধ দরজা খুলে বাইরে না আসতাম, যদি বিজয়প্রতাপের মত নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে দিতে পারতাম, তাহলে হয়ত আমাকে ঠিক চিনতে পারত ইন্দ্রাণী। অথবা যদি কাল রাত্রে দেখা শেয়ালটার মত পালিয়ে না গিয়ে, জবাকে সঙ্গে নিয়ে পালাতে পারতাম, তাহলে হয়ত আমাকে চিনতে পারত ইন্দ্রাণী। আমি বিজয়প্রতাপ হতে পারি না। তবু আমি এক রুগ্ন দুর্বল অক্ষম বিজয়প্রতাপ! ইন্দ্রাণী আমাকে ঠিক চিনতে পারছে না।

বিকেলের দিকে একবার বাড়ি ফিরে, ইন্দ্রাণীকে এড়িয়ে সন্ধ্যায় ট্রেনে উঠে পড়েছিল বিভাস।

চুলের মধ্যে অজস্র কয়লার গুঁড়ো। হাতমুখ চিটচিট করছে। বিভাস ভেবেছিল, প্ল্যাটফর্মে নেমে চোখে মুখে জল দেবে। কিন্তু কোন্ স্টেশন গেল হিসেব রাখেনি। মীর্জাপুর নিশ্চয়ই পিছনে ফেলে এসেছে।

ট্রেন ঢিমেতালে চলছে। এখন আর গতি বাড়বে না। সামনে সেই জংশন। সামনে সেই শহর যা তাকে পুড়িয়ে ছাই করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিল। আবার সেই আজন্ম চেনা শহরে ফিরে যাচ্ছি। অকারণে একমাস দৌড়ের কসরত দেখিয়ে ফিরে আসতে আমার লজ্জা নেই, আমার ফিরে আসার আনন্দও নেই। আসলে আমার অনুভবের ধার মরে গেছে। এখন আর কোনদিন কেউ আমার দিকে একবার তাকিয়ে চমকে উঠে বলবে না—'তুই যেন কাঁপছিস! কাঁপছিস নাকি?' অনুভব আর কোনদিন এত তীব্র হবে না যে সারা গায় কাঁপুনি ধরবে।

জানলা দিয়ে বিভাস বাইরে তাকাল। একান্ত পরিচিত নিসর্গ। তাহলে সত্যি ফিরে এলাম! রোদ আর নরম নেই। প্রায় মধ্যদিন। সামনে তার আজন্ম চেনা শহরের উদ্ধত চূড়োগুলো ঝলসাচ্ছে। পাথরের টুকরো ছড়ান মাটিতে পাঁজরার হাড়ের মত অগুনতি ধাতব সরলরেখা।

বিতোষের বাড়ি ছাড়বার কয়েক দিন আগে মালবিয়াজীকে একখানা চিঠি লিখেছিল। জানিয়েছিল, আজ ফিরবে। এই এক মাসে আমি কি কখনও ভেবেছি, ইন্দ্রাণীর চিঠি আসতে পারে। ইন্দ্রাণী আমার ঠিকানা জানত। অন্তত জেনে নেওয়া কঠিন ছিল না। ইন্দ্রাণী চিঠি লেখেনি।

প্রচুর ভূমিকা করে অবশেষে ট্রেন থামল। সঙ্গে সঙ্গে দশ বার জন কুলী আক্রমণ করল কামরাটা। বিভাসের কাছে ভারী কিছু নেই। বেঞ্চের ওপর পা গুটিয়ে বসল। যাদের নামবার নেমে যাক। ভিড় পাতলা হোক। এখানে ট্রেন পুরো আধঘণ্টা থেমে থাকবে।

দশ মিনিটে কামরাটা খালি হয়ে গেল। বিভাস নেমে এল প্ল্যাটফর্মে। প্রায় শূন্য প্ল্যাটফর্ম। খানিক দূরে মালবিয়াজী দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পাশে ইন্দ্রাণী। মালবিয়াজী

এগিয়ে এসে বিভাসের হাত ধরলেন। হেসে বললেন, 'আমি ভাবছিলাম তুমি বুঝি আজ আর এলে না।' আহা, আমি যেন বীর সেনাপতি, রাজ্য জয় করে এলাম।

মালবিয়াজীর হাতে জোরে চাপ দিয়ে বিভাস ইন্দ্রাণীকে বলল, 'তুমি কী করে জানলে আমি আজ ফিরছি?'

ইন্দ্রাণী কিছু বলল না, শুধু ইঙ্গিতে মালবিয়াজীকে দেখাল। অর্থাৎ তাঁর কাছ থেকে জেনেছে। ইন্দ্রাণীর রুক্ষ চুল উড়ছে, তার শাদা চিকন কাজ করা শাড়িটার কোথাও সামান্য মৃদু রঙও নেই।

স্টেশন বাড়িটা একেবারে নতুন। পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন অ্যামেরিকান নক্‌শায় তৈরি করা হয়েছে। বাড়িটার সর্বাঙ্গে উজ্জ্বল রঙ। সেই ডলারের গন্ধটা যেন নাকে লাগছে। এখানেও কয়েকটা আবাবীল এসে জুটেছে। খড়কুটো এনে জমিয়েছে অনেক উঁচু কোটরে। এইমাত্র একটা মাথার ওপর দিয়ে হাওয়া কেটে উড়ে গেল। এই পাখিগুলোর নাম আবাবীল হল কেন। হয়ত আসল নাম হাওয়া-বিল। আবাবীল তার আটপৌরে সংস্করণ।

বাইরে এসে মালবিয়াজী তাঁর নিজের সাইকেলে চেপে চলে গেলেন। সাইকেলে চাপবার সময় বলে গেলেন, 'তোমরা কাল পরশু একবার এস আমার বাড়ি।'

ইন্দ্রাণী আর বিভাস একটা টাঙায় উঠে বসল। বসেই ইন্দ্রাণী বলল, 'তোমার মেজাজটা বেশ নাটুকে!'

'তার মানে?'

'তার মানে বুঝতে পারছ না? আমাকে জানিয়ে গেলে কী ক্ষতি হত?' ইন্দ্রাণী হাসছে।

এখন আমারও একটু হাসতে পারা উচিত। বিভাস টাঙার রুগ্ন ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসিটা দেখাল কান্নার মত। হাসতে গিয়ে গালের পেশীতে একটু টান লাগল।

বাংলার শিক্ষাচিন্তা

ভবতোষ দত্ত

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ইংরেজ আমাদের দেশে এসেছিল, নবযুগের বাণী আমরা তার কাছ থেকে পাইনি। আমাদের জীবনের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেনি, তাদের সভ্যতার মানসসম্পদকে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কোনো উপায় সে উদ্‌ভাবন করতে পারেনি—এ বিষয়ে তাদের যোগ্যতাও ছিল কিনা সন্দেহ। যেটুকু সংঘাত তারা সৃষ্টি করেছিল, সে ছিল বাইরের জীবনে—অর্থনীতি বা রাজনীতির ক্ষেত্রে। যে নবযুগ আমাদের গৌরবের বস্তু, তার সূচনা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে এবং এটা সম্ভব হয়েছিল নতুন ধরনের শিক্ষানীতিতেই। ইংরেজ আমাদের দেশে বাণিজ্যবিস্তার করে অর্থ আকর্ষণ করে নিয়েছে কিন্তু সেকালে এর জন্যে ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠেনি কারণ তাদের সংসর্গের একটি অভাবিতপূর্ব মহৎ ফল আমাদের করায়ত্ত হল। ইংরেজ শাসনের ফলস্বরূপ শিক্ষার সাহায্যে আমরা যদি এই সম্পদ না পেতাম তবে বিশুদ্ধ ব্যবসায়ী এবং শাসক ইংরেজকে সহ্য করা কঠিন হত।

যুগান্তরের অমোঘ উপায় ছিল শিক্ষা। শিক্ষাই হচ্ছে সেই উপায় যার সাহায্যে নতুন রুচি এবং সংস্কারকে দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এক করে নেওয়া চলতে পারে। রাজকীয় নির্দেশ দ্বারা জীবনের মূল্যবোধ তৈরি করা যায় না। সে কেবল বাইরের কর্তব্য হবে মাত্র। প্রথম যুগে শাসক সম্প্রদায় এ দেশের জীবনাদর্শে এতটুকু হস্তক্ষেপ করতে চায়নি বরং প্রচলিত রাজনীতিকে অক্ষুণ্ণ ও উৎসাহিত করতে চেয়েছিল। কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৭৯২) এবং কলিকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা (১৭৮১) করে তারা প্রাচীন ধারাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০) স্থাপিত হয়েছিল দেশী ভাষা শিক্ষার দ্বারা শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্যই। বস্তুত ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ইংরেজ শাসক শিক্ষানীতিতে কোনো সুস্পষ্ট পন্থা অবলম্বন করেনি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ না থাকলেও সেই শিক্ষার প্রত্যক্ষ আনুকূল্য করতে তাদের দ্বিধার সীমা ছিল না।

যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সাহায্যে আমাদের মনোজগতে নবযুগ এসেছে বলে আমরা মনে করি, সে সম্বন্ধে নীতি কিভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে, সেটা জানা বিশেষ কৌতূহলের বিষয়ই হবে। এই নবযুগকে কে কিভাবে সার্থক হতে দেখতে চান, তারই উপর আমাদের কর্মকীর্তির সাফল্য নির্ভর করছে। রবীন্দ্রনাথকে বাংলার নবযুগের পরিণততম ফলরূপে গ্রহণ করা হয়। নবযুগের শিক্ষানীতির কল্পনাই বা তাঁর কি ছিল ঐতিহাসিক পটভূমিতে তার পর্যালোচনা বিশেষ অর্থপূর্ণ। শাসক সম্প্রদায়ের শিক্ষানীতি এবং চিন্তানায়কদের শিক্ষানীতি সর্বাংশে যে মিলবে, তা নাও হতে পারে। যাঁরা সত্যকার চিন্তাশীল মনীষী, দেশের সমাজপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যাঁরা জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করেছেন তাঁদের আদর্শই আমাদের বিবেচ্য। নবযুগের বাণীকে তাঁরাই গ্রহণ করেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের স্বপ্ন ও সাধনার সঙ্গে শাসনকর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য স্বভাবতই মেলেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সব নতুন শিক্ষাদান প্রচেষ্টা হয়েছে, তার সংবাদ

কিছু কিছু আমাদের জানা থাকলেও শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তখনও গড়ে ওঠে নি। আজ আমরা বুঝতে পারি আধুনিক-পূর্ব যুগে এবং আধুনিক যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল ভিন্ন। প্রাচীনকালে শিক্ষা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। সাধারণ পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হত অক্ষরজ্ঞান, রামায়ণ-মহাভারত বা মঙ্গলকাব্য পড়া বা নকল করার মতো বিদ্যা। ব্রাহ্মণ ইত্যাদি উচ্চতর বর্ণ পড়ত সংস্কৃত—কাব্যসাহিত্য ন্যায় স্মৃতি ইত্যাদি। তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হত শাস্ত্রজ্ঞান লাভের যোগ্যতা-অর্জনে। জীবনের উচ্চতর আদর্শ বা মূল্যবোধ এইভাবেই তারা লাভ করত। কিন্তু এই শিক্ষা আসলে বন্ধ্যা—বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করলেও উন্মুক্ত করে না, কেননা পরিবর্তনশীল জীবনধারার সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। সাধারণ মানুষ জীবনাচরণের আদর্শ পেত রামায়ণ মহাভারত পাঁচালী ইত্যাদি থেকে। বলা বাহুল্য এ শিক্ষার লক্ষ্যও সীমাবদ্ধ। কেননা প্রত্যক্ষ জীবনের সমস্যা কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসার সঙ্গে তারও কোনো যোগ নেই। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুরাও রাজকার্যে নিযুক্ত হত, সেজন্য ফারসী জানা আবশ্যক ছিল। কিন্তু ফারসী সংস্কৃতি থেকে কোনো নতুন চেতনা তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল কিনা সন্দেহ। এ ছিল বাইরের ব্যবহার্য বস্তু, অন্দরমহলে তার স্থান ছিল না। তার কারণ বোধহয় ধর্ম ও নীতিবোধে দুই সম্প্রদায়ের আদর্শই ছিল অটল। তাদের সামনে আর কোনো মান ছিল না যা দিয়ে আপন আপন ধর্মসর্বস্বতার শেষ সার্থকতা নির্ণয় করে নিতে পারত। এই নতুন মানটি আমরা পেয়েছি আধুনিক কালে। একে আয়ত্ত করার শিক্ষাই আধুনিক শিক্ষা। নতুন মানটি যে কি, সেটা ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের অনেকটাই প্রসঙ্গ ত্যাগ করতে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে ইহজগৎ সম্বন্ধে বিস্ময় কৌতূহল, বিশ্বের ধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ নীতিনিয়মের আবিষ্কারই হচ্ছে আধুনিক প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—'য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণ-বিধির সার্বভৌমিকতা; আর একদিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রকাব্যের নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।'

যে নীতি বিশেষ একটা সমাজের নয়, যে সত্য বিশেষ এক ভৌগোলিক সীমাখণ্ডের নয়, তাকে জানতে গিয়ে নতুন করেই আরম্ভ করতে হল। কিন্তু শিক্ষা বলতে গেলে যে এই জানাকেই বোঝায়, সেকথা সচেতনভাবে প্রথমেই যে কারও মনে উদিত হয়েছিল তা নয়। খ্রীস্টান মিশনারীরা তাদের সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্য দিয়ে পরোক্ষে এর সূচনা করেছিল। এ দেশে এসে তারা একটা নতুন নৈতিক বুদ্ধিকে জাগাতে চেষ্টা করেছিল। যদিও সেটা খ্রীস্টীয় নীতিবোধ তবু এর মধ্যেই ছিল এমন মানবতার বাণী যা রেনাশাঁসের পর য়ুরোপে পরীক্ষিত হয়েছে। বিদেশী ধর্মপ্রচারকেরা আমাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করবার জন্যই শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করেছিল। মনে রাখতে হবে সর্বদাই এটা নিছক 'খ্রীস্টানি' শিক্ষা ছিল না। তাহলে পাদ্রীদের প্রভাব একেবারেই অগ্রাহ্য হত। সেই য়ুরোপীয় নীতিবোধ যার পেছনে এক ধরনের সর্বমানবিক যুক্তির ভিত্তি আছে, পাদ্রীরা তাকে প্রচলিত করতে চেয়েছিল। এইজন্যই রামমোহনকেও তারা প্রথমে বন্ধুরূপেই পেয়েছিল।

খ্রীস্টান নীতিবোধের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষানীতির এই নিগূঢ় যোগ ছিল বলেই শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত পাদ্রীদের মধ্যেই প্রথম হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে

শ্রীরামপুরের ডাক্তার জশুয়া মার্শম্যান *Hints Relative to Native Schools* নামে একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি জাতীয় শিক্ষার আদর্শ প্রথম উপস্থাপিত করলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—

A peasant, or an artificer, thus rendered capable of writing as well as reading his own language with propriety and made acquinted with the principles of arithmetic, would be less liable to become a prey to fraud among his own countrymen, and far better able to claim for himself that protection from oppression which it is the desire of every enlightened government to grant.[১]

যদিও সাধারণভাবে স্বাক্ষর করে তোলাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল নতুন ধরনের নীতিবোধের উন্মেষসাধন। এদেশের আচার-আচরণ পাদ্রীদের কাছে অনেকটাই অর্থহীন। এই অর্থহীনতাটুকু বুঝতে দেওয়াই ছিল তাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য।

মনে রাখতে হবে পাদ্রীরা এদেশে নবযুগ নিয়ে আসবার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। সর্বব্যাপী পুনরুজ্জীবন ঘটানো তাদের লক্ষ্য ছিল না। তারা এসেছে খ্রীস্টের বাণী প্রচার করতে এবং এজন্য জনসাধারণের মধ্যেই তাদের কাজ করতে হবে। যে পদ্ধতি দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে শিক্ষাবিধানের উপায় হিসাবে গৃহীত হয়ে এসেছে, তারা সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করেছিল। দেশীয় পাঠশালার রীতিতে দেশীয় ভাষাতে ছাড়া আর কোনোভাবেই সাধারণের অন্তরকে স্পর্শ করা যাবে না। উল্লেখযোগ্য, ডাক্তার মার্শম্যানই সর্বপ্রথম মাতৃভাষার সাহায্যে আধুনিক শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পাদ্রী অ্যাডাম ১৮৩৫ এ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করার উপলক্ষে সুস্পষ্টভাবেই বলেন—

All schemes for the improvement of education, therefore, to be efficient and permanent, should be based upon the existing institutions of the country, transmitted from time immemorial, familiar to the conceptions of the people and inspiring them with respect and veneration. To labour successfully *for* them, we must labour *with* them, and to labour successfully *with them* we must get them to labour willingly and intelligently with us.[২]

জনশিক্ষার জন্য অ্যাডামের প্রয়াস আমাদের দেশে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষার লক্ষ্য ছিল নীতি এবং বিচারবোধ জাগ্রত করে চারিত্রিক উন্নতিসাধন। অবশ্য সেই সঙ্গে সাধু সরকারী উদ্যোগকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নেবার মতো নৈতিক সামর্থ্য অর্জন। এই দুই উদ্দেশ্যই সেকালের উপযুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'নীতিবোধ'ই সকলের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। খ্রীস্টান পাদ্রীরা তো বটেই, রামমোহন এবং নব্যবঙ্গ—সকলেরই লক্ষ্য ছিল নতুন নৈতিক চেতনার জাগরণ। অ্যাডাম

১ William Adam: *Reports on the State of Education in Bengal* (Calcutta University, 1941) p. 474 এ লঙের ভূমিকায় উদ্ধৃত।

২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ

ভেবেছিলেন তখনকার পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তো থাকবেই তবে তার সঙ্গে নীতি-শিক্ষার আরও ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়ার দরকার। এইজন্য অ্যাডাম বাংলা ভাষাকে বাঙালির শিক্ষার বাহন করার পক্ষপাতী ছিলেন।

অ্যাডামের এই মত তাঁর নিজের তো বটেই, এই মতই মোটামুটি ছিল সেকালের খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের বাইরে আর যাঁরা ছিলেন তখনকার সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃস্থানীয় তাঁদের মধ্যে নানা রকম অভিমত চলিত ছিল। শাসকদের দ্বিধার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শেষ পর্যন্ত যদি বা তাঁরা এদেশে নবশিক্ষার কথা কিছু কিছু ভাবতে শুরু করলেন, অনেক দিন পর্যন্ত তাঁদের পরিকল্পনা ছিল সংস্কৃতের সাহায্যেই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার। এদিকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার স্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা চাচ্ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রসার। হিন্দু কলেজ দেশীয় উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। রামমোহন ১৮২৩-এর শিক্ষাবিষয়ক পত্রে ইংরেজি শিক্ষার সাহায্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তিনি নিজে স্থাপন করেছিলেন এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল। এখানে বাংলা ভাষার সাহায্যেই আধুনিক বিদ্যা বিতরণ করা হত। কিন্তু আসলে তখন প্রাচ্যপন্থী এবং পাশ্চাত্ত্যপন্থী নামে যে দুটি দল দেখা দিল, তারা বিবাদ করেছে ইংরেজি অথবা সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য নিয়ে। বাংলা ভাষার প্রবক্তারা এই বিতর্কে কোনো স্থান পায়নি যদিও ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্ত্যপন্থীদের বিজয় সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও পর্যুদস্ত করে ফেলল। কেউ লক্ষ্য করল না অ্যাডামের যুক্তিকে—বাংলায় শিক্ষা না দিলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে—যদি সে উদ্দেশ্য হয় নৈতিক উন্নয়ন। এইসঙ্গে আর একটি তথ্য যোগ করা যায়। শোনা যায় হিতবাদ দর্শন তখনকার ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে কিছু কিছু প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছিল। হিতবাদীদের মত ছিল বাংলা ভাষাকেই সর্ববিধ সুযোগ দেওয়া কারণ মাতৃভাষা ছাড়া হিতকর চিন্তাকে কিছুতেই ফলপ্রসূ করা যাবে না।[৩] হিতবাদীদের প্রত্যাশা ব্যর্থ হল। মেকলে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে এই আশা করেছিলেন—

The effect of this education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo, who has received an English education, ever remains sincerely attached to his religion. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty year hence.[৪]

মেকলের এই প্রত্যাশা সংগত না অসংগত সে বিচার না করে একথা নিঃসন্দেহেই বলতে পারি যে দীর্ঘকালের ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মূল ধর্মীয় বিশ্বাসে সামান্যই পরিবর্তন আনতে পেরেছে। সেদিক থেকে পাদ্রীরা এবং হিতবাদীরা আরও পাকাপাকিভাবে কাজ করতে চেয়েছিলেন।

৩ "James Mill was no Anglicist. He was convinced that the vernacular languages were far better vehicles of instruction."—Erich Stokes. *The English Utilitarians and India* (1959) p. 57.

৪ George Trevelyan: *Life and Letters of Lord Macaulay, Vol. I* p. 464. যোগেশচন্দ্র বাগলের "বাংলার উচ্চশিক্ষা" (১৩৬০) পৃঃ ২৫-এ উদ্ধৃত।

২

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলনগুলির বিস্তৃত ইতিহাস রচনা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য নয়। নবযুগ কিভাবে তার লক্ষ্যকে চরিতার্থ করছে আমরা তারই আলোচনা করছি। দুটো সূত্র আমাদের চোখে পড়ছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে সত্য কিন্তু তার স্বরূপ কম লোকের কাছেই ধরা দিয়েছিল। কতকগুলি নৈতিক সংস্কারই যেন নবযুগকে সার্থক করার উপায়। এইজন্যেই নীতির উপর এত ঝোঁক। পাদ্রীরা তো চেয়েছেই, হিন্দু কলেজের শিক্ষার্থী নব্যবঙ্গেরা চেয়েছে, রামমোহন এবং তদনুবর্তীরাও তাই চেয়েছেন। নীতির প্রতি আসক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত প্রবল ছিল। প্রথম দিকের শিক্ষানীতি তাই ছিল নীতিনির্ভর। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যাবে, নীতি তো কতকগুলি যান্ত্রিক অভ্যাস মাত্র। মূল কথা হচ্ছে একটা মনোভঙ্গি (attitude) তৈরি করা। রেনাশাঁস অর্থ কতকগুলি আন্দোলন মাত্র নয়; রেনাশাঁস মানে বিশিষ্ট জীবনদর্শন, যার থেকে আমাদের আচরণ নৈতিক হয়ে ওঠে। প্রথম যুগের চাঞ্চল্য বিদ্রোহ নৈতিক সংস্কার ইত্যাদির ভিতর দিয়ে নবযুগ-চেতনার লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল মাত্র কিন্তু নবযুগ তখনও রূপ পায়নি।

যাঁরা ইংরেজ রাজত্বকে প্রার্থনীয় মনে করেছিলেন, তাঁরা ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে চেয়েছিলেন নতুন মূল্যবোধ। তাঁরা শুধু বই-পড়া বিদ্যার প্রসার চান নি, তাঁরা চেয়েছেন আধুনিক মনোভাব সৃষ্টি করতে। এই মনোভাবটা যে কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনই অর্জন করবে, এমন কথা তাঁরা চিন্তা করেন নি। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা যাঁরা প্রথম পেয়েছিলেন সেই নব্যবঙ্গেরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না। তাঁরা ভালো ইংরেজি বলতেন এবং অত্যধিক ইংরেজিভাবাপন্ন ছিলেন একথাই আমরা জানি কিন্তু একথা আমরা বিশ্বাস করি না যে তাঁরা নিছক আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন না। নীতিশিক্ষাদানের পথে তাঁরা স্বদেশের উন্নতি চেয়েছেন। পাদ্রীদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এখানেই যে পাদ্রীদের নীতিবোধ কতকগুলি অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মাত্র, নব্যবঙ্গেরা নীতিবোধকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। নব্যবঙ্গের পত্রিকায় এ যুগের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—

The importance and necessity of the joint cultivation of the intellect and the feelings cannot be too strongly urged. The influence of the heart upon the understanding is inculcable.[৫]

হৃদয়বৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগায় কল্যাণবোধ এবং বুদ্ধিবৃত্তি জাগায় সত্যনির্ধারণ-শক্তি। নীতিবর্জিত সত্যসন্ধানের কোনো অর্থ নেই, এ কথাও একজন বলেছেন—

In the state of society in which we live and in which every man is to be the architect of his own fortune, we could not commit a greater error than to teach the rising generation to seek knowledge on its own account.[৬]

তাঁরা শিক্ষার যে উদ্দেশ্য স্থির করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁদের বিশ্বাসের আন্তরিকতায় যদি সন্দেহ না করি তবে

[৫] *The Bengal Spectator*, July 1842, p. 19.
[৬] *The Bengal Spectator*, September 1, 1842, p. 57.

সন্ধান করতে হয় সত্যি সত্যি তাঁরা এর প্রসার কতখানি কামনা করেছেন। এই নীতিবোধ কি কেবল ইংরেজিশিক্ষিত সমাজের জন্য, অথবা, তাঁরা কি ভেবেছিলেন কেবল ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হয়েই এই মূল্যমানকে দেশের মানুষ আয়ত্ত করবে। মনে রাখতে হবে নব্যবঙ্গের মুখপত্র *The Bengal Spectator* পত্রিকা ছিল দ্বৈভাষিক। রামগোপাল ঘোষ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় গভীর ভাবের রচনা দেখে আনন্দে অধীর হয়েছিলেন। এঁদেরই উদ্যমে বেরিয়েছিল সর্বজনবোধ্য লোকভাষার "মাসিক পত্রিকা" এবং অন্যান্য বই। এই সময়ের যুগন্ধর শিক্ষানায়ক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ইংরেজির উপর তো নির্ভর করলেনই না সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত হয়েও সংস্কৃত শিক্ষাকেই চরম বলে মানলেন না। তিনি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করে বাংলা ভাষার সাহায্যে আধুনিক শিক্ষার ব্যাপ্তি ঘটাতে চাইলেন।[৭] লক্ষ্য করবার বিষয়, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তায় ধর্ম বা নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে এসেছে। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখলেন সচেতন জাগ্রত বুদ্ধিকে গড়ে তোলবার দিকে। তিনি সংস্কৃত কলেজে মিলের লজিক পড়াতে চেয়েছিলেন। 'ভ্রান্ত সাংখ্য ও বেদান্ত' দর্শনের প্রতিষেধক হিসাবে পাশ্চাত্ত্য দর্শন প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর বঙ্গ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৈরি করবার জন্যে নর্মাল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে সেই স্কুলেই ভর্তি হয়েছিলেন। সে কথা তিনি গর্বের সঙ্গেই বলতেন।

বঙ্কিমের যুগে দেখা গেল শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও পরিষ্কার হয়ে এসেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু নীতিবোধ সৃষ্টি করা নয় কিংবা কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ও সমাজতাত্ত্বিক নীতিনিয়মকেই জানা নয়—শিক্ষার উদ্দেশ্য একটি মার্জিত মনুষ্যত্বকে গড়ে তোলা। বঙ্কিমচন্দ্র নীতিসচেতন ছিলেন; এই নীতিচেতনা আধুনিক যুগসাধনারই একটি ফল কিন্তু তিনি নীতিসর্বস্ব ছিলেন না। মনুষ্যত্বরূপ শিক্ষার নীতি একটি রশ্মি মাত্র। নীতিই প্রধান লক্ষ্য নয়, প্রধান লক্ষ্য মনুষ্যত্ব। আর মনুষ্যত্ব হচ্ছে সর্বাঙ্গীণ বৃত্তির সমঞ্জস বিকাশ। প্রথম যুগে নীতির একটা স্থূল অভ্যাসই ছিল শিক্ষা। দ্বিতীয় যুগে নীতির চর্চার সঙ্গে বুদ্ধির অনুশীলন হল যুক্ত। বিদ্যাসাগরের চিন্তায় নীতিবাদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য গৌণ হয়ে মার্জিত বুদ্ধিপ্রকর্ষের সঙ্গে সমাজকল্যাণবোধ মিশ্রিত হয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন সম্পাদনাকাল থেকেই লক্ষ্য করি আধুনিক বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পরিপূর্ণ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বৃত্তিগুলিকে উজ্জ্বলতর করে তোলবার শিক্ষাদর্শ। এই আদর্শই বঙ্কিমজীবনের দ্বিতীয় যুগে পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনতত্ত্বে পরিণত হয়েছিল। ধর্মতত্ত্বে গুরুশিষ্যের সংলাপে দেবী চৌধুরাণীতে তার রূপরচনায় এই শিক্ষাতত্ত্বই প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিক্ষাতত্ত্বের আভাস অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাতেই প্রথম পাই।[৮] তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' গ্রন্থে ভৌতিক শারীরিক এবং মানসিক নিয়মগুলিকে জানাই প্রধান শিক্ষণীয় বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল। মানুষ যে নীতিপালন করবে সেই নীতিপালনের ভিত্তি কি, অক্ষয়কুমার তাই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন। বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের কর্তব্যকে মাত্র নির্দেশ না করে মানুষের মনুষ্যত্বকে তিনি জানতে বলেছেন। নবযুগের কেন্দ্রীয় মূল্যমান ছিল এই মনুষ্যত্ববোধ। আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে এই মূল্যমানটিকে খুঁজে বের করতে।

[৭] বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ" ৩য় খণ্ড।
[৮] এ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ভবতোষ দত্ত, "চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র" (১৯৬১) 'বঙ্কিমযুগের মননসাধনা'—অধ্যায়।

অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে উদ্ঘাটনই হচ্ছে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবিষ্কৃত শিক্ষার এই উদ্দেশ্য নবযুগের সাধনাকে যেমন পূর্ণতা দিয়েছে, তেমনি দীর্ঘকাল শিক্ষানায়কদের মনোভাবকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্কিমের মতোই বলেছেন—

'কালের কুটিল চক্রে শিক্ষা আজকাল বিজ্ঞানশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, ইতিহাসশিক্ষা, হাতেকলমে শিক্ষা বা টেকনিক্যাল শিক্ষা ইত্যাদি নানা উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া সহস্র সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; এবং কোন্ শিক্ষা ভাল আর কোন্ শিক্ষা মন্দ এই তর্কের কোলাহলে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই কোলাহলের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে একেবারেই অক্ষম। শিক্ষা বলিলে আমরা কেবল একটা মাত্র শিক্ষাই বুঝিয়া থাকি; সেই শিক্ষার অর্থ মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি স্ফূর্তি ও পরিপুষ্টি। যাহাতে অপুষ্ট মনুষ্যত্ব পুষ্টিলাভ করে, প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব বিকাশ পায়, হীন মনুষ্যত্ব স্ফূর্তিলাভ করিয়া জাগ্রত ও চেতন হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা শিক্ষা নামে অভিহিত করিয়া থাকি।'[৯]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মনুষ্যত্বের এই আদর্শের সঙ্গে নীতিবোধও জড়িত। কারণ এই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে নীতিকে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলা না হলেও এই শিক্ষার ফল সুস্থ জীবনবোধ। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শে বিশ্বাস অটুট রেখেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কখনই বন্ধ হতে পারে নি। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করতে পারে যে তাঁর কল্পিত বুদ্ধির অনুশীলন কখনই মানবকল্যাণ-বিরোধী নয়। অর্থাৎ এই বুদ্ধির চর্চা নীতিবোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করবার তাৎপর্য এই যে বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার আদর্শ হয় নীতি-নিরপেক্ষ জ্ঞানের সাধনায় না হয় একটা নাগরিক রুচি ও ভদ্রতার অনুশীলনেই পর্যবসিত। বঙ্কিমী শিক্ষাদর্শ সবুজপত্রের যুগেই প্রতিহত হয়েছে।—

'তত্ত্বজ্ঞেরা যাহাই বলুন না কেন শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ মানুষ গড়াও নয়, অতিমানুষ তৈরীও নয়। বিদ্যাশিক্ষাই কার্যত শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া আছে।'[১০]

এতেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর মনুষ্যত্ব সন্ধানকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, শিক্ষার নতুন সংজ্ঞা তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি।

৩

১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজি শিক্ষার নীতি স্বীকৃত হলে প্রগতিবাদীরা উল্লসিত হল। সেই উল্লাস এখনও অক্ষুণ্ণ। আমাদের এখনও ধারণা ইংরেজি শিক্ষার নীতি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর হয়েছে। দেশের যা কিছু উন্নতি দেখছি, ইংরেজি শিক্ষার জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই শিক্ষানীতি সে আর-একদিক থেকে নবযুগকে অসার্থক করে ফেলল, সে হিসাব আমরা করলাম না। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের সমগ্র সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত

[৯] "নানাকথা", শিক্ষাপ্রণালী
[১০] অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'শিক্ষার লক্ষ্য', সবুজপত্র ১৩২৩ ফাল্গুন

করে ফেলল। যারা ইংরেজি শিক্ষা করল তারা যে শুধু জীবিকার ক্ষেত্রেই বিশেষ সুবিধা ভোগ করল তা' নয়, মনের দিক থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকল। দেশের এক অতিবৃহৎ অংশ তাদের চিন্তাভাবনা প্রয়োজন-অপ্রয়োজন নিয়ে পড়ে রইল, আর এক অংশ ইংরেজির সাহায্যে বিশ্বসংস্কৃতির সুধা পান করে তৃপ্ত হয়ে রইল। আবার ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যে কম ব্যক্তিই শিক্ষা ও মনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পেরেছেন। যাকে মূল্যবোধ বলে, সেই অ্যাটিচুড-এ তেমন কোনো পরিবর্তন এই শিক্ষা আনতে পেরেছে কি? ইতিহাসবিধাতার ইচ্ছায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মহৎ যোগাযোগ ঘটে গেল, কিন্তু এল না তার ব্যাপ্তি কিংবা গভীরতা।

মেকলে যে এর অপূর্ণতা বুঝতে পারেন নি তা নয়। তিনি এর একটা ব্যবস্থা কল্পনা করেছিলেন। মেকলের সেই তত্ত্ব 'অভিসেচন-তত্ত্ব' বা filtration theory নামে পরিচিত। তিনি ভেবেছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার ভাবনা ভাববার দরকার নেই। উচ্চস্তরের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে সেই শিক্ষার ফল গড়িয়ে যাবে সমাজের নীচের স্তরেও। অ্যাডাম চেয়েছিলেন ঠিক এর উল্টো—নীচের স্তরটিকেই শিক্ষিত করে তুলবার জন্য প্রত্যক্ষ চেষ্টা করতে। অ্যাডামের শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হলে সমগ্র সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ত না। দেশের অগ্রগতি বা পশ্চাদ্গতির ফল সমাজ একসঙ্গেই ভোগ করত। এতে একটা অসুবিধা ছিল এই যে সমগ্র সমাজকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে হলে যাত্রা স্বভাবতই হত মন্থর। কিন্তু আমাদের দেশে জনশিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা স্বতন্ত্র। জনশিক্ষায় উচ্চশিক্ষা চলবে না আর উচ্চশিক্ষা মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে উপায় নেই। উচ্চশিক্ষাতে নবযুগের বাণী সঞ্চারিত হয়েছিল। আমাদের দেশে জনশিক্ষা কি আগে ছিল না? তার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। সমস্ত দেশের চিত্তকে স্পর্শ করার এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় আর নেই। জনশিক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার মিলন ঘটানোই হতে পারত নবযুগের শিক্ষানীতি। কিন্তু তা হয়নি। মেকলের যে শিক্ষাদর্শ আজ পর্যন্ত গৃহীত হয়ে এসেছে, বাংলার নবযুগের চিন্তানায়কেরা ঠিক এমনি করেই তা চেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ।

But this was hardly western civilization as appreciated by Ram Mohun Roy, Dwarkanath Tagore and the small band of reforming Hindus that had joined Macaulay to fight the Orientalists. To them it was essentially a means of combating existing moral and social evils. If in subsequent generations this ethical aim became dulled and materialised, if the prospect of Government employment gradually prevailed as an educational stimulus, it cannot be said that the Indian outlook on life or conception of values ever became unmistakably and aggressively victorian.[১১]

অ্যাডাম তাঁর শিক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধান শেষ করে রিপোর্ট পেশ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষানীতি গৃহীত হল এবং সেই শিক্ষানীতি জোরালো হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। সমস্ত দেশে স্থাপিত হল ইংরেজি শিক্ষার জন্য কয়েকটি কলেজ। ফলে সমাজের বিচ্ছিন্নতাকে আরও স্থায়িত্ব দেওয়া হল মাত্র।

[১১] Arthur Mayhew, *The Education of India* (1928) p. 28.

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এই বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হতে লাগল যে শিক্ষাকে সত্য সত্যই উপর থেকে গড়িয়ে আসতে হবে।

In truth the efforts to improve the indigenous village schools had failed and the few schools established by Government as models of good vernacular education to a limited number of pupils of a higher social grade had no effect whatever in raising the level of the indigeneous schools below them. It was probably the apparent hopelessness of really advancing popular education by direct means that kept alive the theory that education must filter downwards and that it was impossible to reach the lower strata of the people at all until the upper strata had been dealt with.[১২]

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে ফিলট্রেশন-থিয়রির সমর্থনে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন—

The lower strata of the social fabric must be permeated through the higher strata. Educate the upper and middle classes and the lower classes will be instructed and elevated.[১৩]

কিশোরীচাঁদের এই বক্তৃতার উত্তরে পাদ্রী লালবিহারী দে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন—

While a Brahmin Dives is faring sumptuously every day and luxuriating on logic, metaphysics and theology, the Sudra Lazarus is positively dying of starvation in vain expecting a few crumbs to fall from the lord's table.

ভিন্ন রূপক দিয়ে রবীন্দ্রনাথও দেশব্যাপী অশিক্ষা এবং অভিমানী শিক্ষিতসমাজের এই ক্লিষ্ট রূপ এঁকেছেন—

'বিপুল সংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ, সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেককাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশদেখা চোখ আমরা হারিয়েছি; গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত সমাজের দিকে।' ('শিক্ষার বিকিরণ', শিক্ষা)

লালবিহারী দে যে যুগে দেশের রসরিক্ত রূপ দেখেছিলেন, সে যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের যুগেও বিশেষ কোনো পার্থক্য ঘটেনি। কেননা শিক্ষার পদ্ধতির সেই ধারাই অব্যাহত, যাকে বিদ্রূপ করেছিলেন লালবিহারী এবং যার প্রতিবাদেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গদর্শন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনাতেই তিনি লিখলেন—

'এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন 'ফিল্‌টর্‌ ডোন' করিবে। একথার তাৎপর্য

[১২] H. A. Stark, *Vernacular Education in Bengal from 1813 to 1912* (1916) p. 88.

[১৩] পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৮৯

এই যে কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগের পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্‌ হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্যন্ত সিক্ত হয় তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালী জাতি রূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে।

আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?'

এই শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করব।[১৪]

৪

১২৯৯ সালের পৌষ মাসের সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার যোগ এই প্রবন্ধটিই রক্ষা করেছে। এই প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[১৫] এবং আনন্দমোহন বসু যে সমর্থন এবং প্রগাঢ় ঐক্যমত জানিয়েছিলেন[১৫ক], তাতেই বুঝতে পারা যায় সেযুগের শিক্ষাভাবনাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় নতুন করে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা সম্বন্ধে যে মত রবীন্দ্রনাথ এতে ব্যক্ত করেছিলেন সারা জীবনে বারবারই তিনি তা আবৃত্তি করে গিয়েছেন। যে আধুনিক মনন ও বিদ্যা আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে এসেছে, সেই বিদ্যাকে পুরোপুরি গ্রহণ এবং স্বীকরণের মধ্যেই আছে মনুষ্যত্বের মুক্তি। সেই মননশিক্ষা যেন দেশের অন্তঃস্থলে পেঁছিতে পারে এবং তা যেন মাতৃদুগ্ধের মতো সমস্ত দেশকেই পুষ্ট করে তুলতে পারে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত দুটি কথা বলেছিলেন—

'আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান

[১৪] রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূল কথাগুলির বিশদ আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন "রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা" (১৯৬১) গ্রন্থে।

[১৫] I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is diseminated through our own vernacular, consider the lesson that the past teaches. The darkness of the Middle Ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shone through the medium of the numerous modern languages. So in India, not withstanding the benign radiance of knowledge that has shone on the higher levels of our society through one of the clearest media that exist, the dark depths of ignorance all around will never be illuminated until the light knowledge reaches the masses through the medium of their own vernacular.
—১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রদত্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভোকেশন বক্তৃতা। *Gooroodas Centenary Commemoration Volume.* Ed. Anathnath Basu. Calcutta University (1948) p. 49.

[১৫ক] রবীন্দ্ররচনাবলী ১২, পৃঃ ৬১৭

মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল?...বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।'[১৬]

'ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধানে'র কথাই বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়। এই ব্যবধানই যে আমাদের নবযুগের সাধনাকে খণ্ডিত করেছে, আমাদের নবযুগের চিন্তানায়কদের সেটাই উদ্‌বিগ্ন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তা যথাযোগ্য হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য ভাবনেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কতখানি সাদৃশ্য আছে, তার অন্য প্রমাণও আছে। রবীন্দ্রনাথও ফিলট্রেশন-তত্ত্বকে দোষারোপ করেছেন—

'শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চিমাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্যসমাজ অলসভাবে মেনে নেয়নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দেই।'[১৭]

এই অভিসেচন-ক্রিয়ার প্রধান প্রতীক বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। এখান থেকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব যারা আর কিছুতেই দেশের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারে না। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কেও স্বাভাবিক বলে ভাবতে পারেননি। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষারই বিকাশ-রূপে দেখা দেবে তবেই সে সত্য হবে। যথার্থ বিদ্যাতরু সেটাই, যেটা দেশের ভিতর থেকে স্বাভাবিকভাবেই অঙ্কুরিত হয়ে বিকাশ লাভ করে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ পাশ্চাত্ত্য থেকে গৃহীত এবং আমাদের সমাজে আরোপিত।[১৮] সেইজন্যেই দেশের অন্তরের সঙ্গে এর যোগ কিছুতেই স্থাপিত হতে পারছে না। এর বিজাতীয় ভাষামাধ্যমই একে দেশের অন্তঃপুরের কাছে অপরিচিত ও সংকোচের বিষয় করে রেখে দিয়েছে। পরবর্তী কালে 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়'[১৯] নামে তাঁর শিক্ষাস্বপ্নের বর্ণনা তিনি করেছেন এবং এর প্রথম অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল তাঁর জাতীয় বিদ্যালয়ের কল্পনায় (১৩১৩)। 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' (১৩১২) প্রবন্ধে তিনি ছাত্রদের আহ্বান করলেন দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপন করতে এবং শিক্ষাকে পুঁথিগত না করতে।

নবযুগের সাধনার বিষয় ছিল নিজেকে জানা, মানুষকেই অনুসন্ধেয় করে তোলা। আধুনিক শিক্ষা সেই জ্ঞানের নানা সূত্র আমাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। অর্থনীতি

১৬ শিক্ষার হেরফের
১৭ 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' (১৩৪২)
১৮ 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' (১৯৩২) শিক্ষা (১৯৬০) পৃঃ ২৬৪
১৯ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য প্রবোধচন্দ্র সেন "রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা" (১৯৬১)

সমাজনীতি ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা আমাদের হাতে এসেছে কিন্তু মহাভারতের কচের মতো আমরা সেই বিদ্যার ভার বহন করছি মাত্র, প্রয়োগ করতে পারছি না। তার কারণ এই বিদ্যা আমাদের জীবনে সত্য হয়ে উঠছে না প্রধানত ভাষার ব্যবধানের জন্য। নবযুগ সার্থক হবে তখন যখন সেই বিদ্যা আমাদের নিজেদের সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে যথার্থ অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়োগবুদ্ধি জাগাতে পারবে। তবেই আধুনিক শিক্ষাকে আমরা অভি-শাপমুক্ত করতে পারব। রবীন্দ্রনাথ সেদিকেই আমাদের আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এখন মানুষ আর অলৌকিকের ব্যর্থ সন্ধান করে না। আপন অস্তিত্বকে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এবং কিভাবে সুষ্ঠুভাবে বাঁচা যায় সেই তত্ত্বই সে বের করতে চায়। একদিকে যেমন নেই অতীন্দ্রিয়তার সন্ধান, অন্যদিকে তেমনি নেই সমাজবিচ্ছিন্ন আত্মপর জীবনযাপনের আদর্শ। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোমতীয় আদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মবাদের যোগ নেহাৎ দুর্লক্ষ্য হবে না। কোমতের মানবতাবাদকে রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে "মানুষের ধর্ম" লিখলেন, সেখানে তিনি মানুষকে কোমতের মতোই সমাজবিবর্তনের মধ্যে স্থাপিত করেছেন। মানুষ বৃহতের অভিমুখী, এখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব। যে শিক্ষা মানুষকে বদ্ধ করে, সম্প্রদায়সংকীর্ণ করে এবং শেষ পর্যন্ত সমাজবিমুখ করে সেই শিক্ষাই মিথ্যা। রবীন্দ্রনাথ ধর্মগত অর্থে সমাজকে মানেননি, তিনি মেনেছেন মানুষের সমাজকে। নানা পার্থক্য সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল এই দিক দিয়েই যে বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন শেষ পর্যন্ত দুজনেরই ভাবনার বিষয়। মধ্যযুগ তাকেই বলে যখন আমরা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, অকিঞ্চিৎকর চরিতার্থতায় তৃপ্ত। আচারধর্মের সীমাবদ্ধতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, বুদ্ধির অনুপযোগিতা—এ সব ছিল বিশেষ একযুগের কালধর্ম। রবীন্দ্রনাথ 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছেন নবযুগে মানুষ নিজেকে অনেক বৃহৎরূপে উপলব্ধি করেছে। পূর্বদেশের মানুষ আজ আর শুধু পূর্বেই বদ্ধ নয়, পশ্চিমের জ্ঞানকেও সে আপনার বলে গ্রহণ করতে ব্যগ্র। আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের তীব্রতার দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নবযুগ-ধারণা থেকে বিচলিত হননি। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি বলিষ্ঠভাবে বলেছেন—

'আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।'

বাংলা ভাষার মাধ্যম আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দেবে, এরকম যুক্তি যে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেননি, তা বলাই বাহুল্য। 'শিক্ষার মিলনে'র মধ্যেই তিনি বলেছেন—

'এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে।...যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতি-বিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।'

নবযুগের শিক্ষাচিন্তায় ছিল নিখিল মানবের এই মুক্তির স্বপ্ন।

আধুনিক সাহিত্য

সৈয়দ মুজতবা আলির গল্পে পরিতুষ্ট হন না এমন পাঠক অতি বিরল। যাকে চিত্ত বিনোদন বলে সে গুণ আলি সাহেবের লেখায় বর্তমান। আমরা যারা আলি সাহেবের গল্প কিছুতেই বাদ দিই না, তারা প্রধানতঃ ঐ গুণের জন্যই তাঁর লেখার প্রতি আসক্ত। আলি সাহেবের মত লেখা বাংলাদেশে সহজে চট করে কেউ লেখেন না। লিখতে পারেন না বলে নয়, লিখতে চান না বলে লেখেন না। না চাওয়ার কারণ আছে। আমরা অধিকাংশই আলি সাহেবের মত বহু ভ্রমণে এবং বহু ভাষায় অভিজ্ঞ নই। অভিজ্ঞ নই অথচ যদি সরলতম গল্প লিখি তাহলে ন্যায্যতঃ লোকে আমাদের এলেমে সন্দেহ করবে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই আমরা সরল গল্প লেখা ছেড়ে দিচ্ছি। অথচ "ঘোষালের ত্রিকথা"র লেখকের হাত দিয়ে নীল লোহিতের নানা লীলার কাহিনী বাংলা সাহিত্যকে ইতোপূর্বেই সমৃদ্ধ করে রয়েছে। উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঊনপঞ্চাশী" বইখানার কথা আজকাল আর শোনাই যায় না। তাতেই আমরা পড়েছিলাম—একটা শেয়ালের একটা ল্যাজ হলে পঞ্চাশটা শেয়ালের কটা ল্যাজ?—এ প্রশ্নের জবাবে পুত্র ত্বরিৎ উত্তর ছেড়েছিল যে মণকষা ও সেরকষা অবধি পাঠশালে হয়েছে, ল্যাজকষা এখনও হয়নি। বাবা পুত্রকে প্রহারোদ্যত হলে ঠাকুমা পিতাকে আশ্বস্ত করেছিলেন—থাকগে বামুনের ছেলে মুখ্যু হয়তো পণ্ডিতী করে খাবে'খন। এ ধরনের সরস বাকনৈপুণ্য আজকাল সচরাচর দেখতে পাই না। আলি সাহেবের লেখায় চৌধুরী মশায়ের wit আছে, এবং উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যে ধারার প্রতিভূ সেই ধারালো satire-এরও অভাব নেই—শুধু তাঁর মধ্যে প্রথমোক্তের সংযম নেই, নেই দ্বিতীয়োক্তের সামাজিক অন্তর্দৃষ্টি। আলি সাহেব নিখুঁত মজলিসী মানুষ। এবং কাবুলী মজলিস থেকে খাটিয়া পেতে সরাইখানার ইরাণী মজলিস, আর, ওদিকে ফরাসী মজলিস থেকে জর্মন মজলিস পর্যন্ত নানা অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ হলেও আসলে তিনি বাঙালী আড্ডার মানুষ। ও. হেনরীর সেই বিখ্যাত গল্পের নায়ক কসমোপলিট মিঃ কগ্‌ল্যান, দি আর্থ, সোলার সিস্টেম, যাঁর ঠিকানা, তিনি যেমন শেষ পর্যন্ত নিজের গ্রামের নিন্দে সহ্য করতে না পেরে ক্ষিপ্ত—আলি সাহেব সে ধরনের বিশ্বনাগরিক অবশ্যই নন। তিনি বরঞ্চ বিরাজ করেন এর বিপরীতে। সারা বিশ্বেই তিনি খুঁজে পান বাংলাদেশকে। তিনি যে শুধু ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাঙালীদেরই সর্বত্র কুড়িয়ে পান তা নয়, তিনি বিদেশেরও যা কিছু দেখেন তার রূপকের মধ্যে বাংলাদেশের চেনা জীবন যাত্রারই ছায়া পড়ে। তাই "দেশে বিদেশে"র আবদুর রহমানের মধ্যে পুরাতন ভৃত্যের দেখা পাওয়া যায় অক্লেশে। বেঁচে থাকো সর্দি কাশি গল্পের নায়িকা যেন আমাদের প্রেম-ভীরু বাঙালিনী। এইখানেই মুজতবা সাহেবের গল্পের বৈশিষ্ট্য। তিনি সংস্কৃতিবিশারদ কতখানি আমি তার যোগ্য বিচারক নই, তাঁর ভাষাতত্ত্বও আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে না—কিন্তু তিনি খাঁটি বাঙালী ভদ্রলোক—বাংলাদেশ যাঁর প্রধান আবেগ, তাই তাঁর মানবপ্রেমের মধ্যে কোথাও খাদ নেই।

চৌধুরী মশায়ের মজলিস-সম্ভব গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাদের সরলতা। কিন্তু সেই সরলতা অন্তর্গভীর। গভীরতা আছে বলেই তির্যক দৃষ্টির কিরণসম্পাতে সেখানে

যে বিচিত্র আলোক লীলা ফুটে ওঠে তা অনবদ্য। হাসির রৌদ্রছটা গভীর সরোবরের উপরিতলে যে মাধুর্য সৃষ্টি করে তা গাম্ভীর্যের বন্ধনে পরিমিত বলেই স্ফটিক ঝরনার রৌদ্রলীলা থেকে স্বতন্ত্র। উপরন্তু চৌধুরীমশাই যে আড্ডার কথা নীল লোহিত প্রমুখকে কেন্দ্র করে বলেন সে আড্ডা কলিকাতা-বদ্ধ। দেশের মাটিতেই সে আড্ডার শিকড় বলে তার মধ্যে একটা ধীরতা এবং স্থিরতা আছে। চূড়ান্ত প্রলোভনের সময়েও আছে একটা নাতিদুর্লক্ষ্য বাঁধন। চণ্ডীমণ্ডপী মন্থরতাকে কাটানো চৌধুরী মশায়ের গদ্যের লক্ষ্য, বক্তব্যে ভাবালুতা পরিহৃত বলেই গদ্যে নেই মেদভার। বলা যায় কলকাতার একশ বছরের নাগরিক ইতিহাসে যে আলাপী আসর-ভব্যতা গড়ে উঠল তার ট্র্যাডিশনকে রীতিমত পরিশীলিত করে সাহিত্য-সাৎ করলেন প্রমথ চৌধুরী। এই পরিশীলনেরও একটা চিন্তোদ্দীপক আদি ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবন বিবৃতির শেষাধ্যায়ে তার ইঙ্গিত বিদ্যমান। কলকাতাই অপভ্রংশের বিপরীত কূলে যে ঠাকুরবাড়ির ভাষা বলে খ্যাত একটা আলাপী আসর-ভব্যতার মান গড়ে উঠছে তার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। তাকে নিঃসন্দেহে আমরা মার্জিত নাগরিকতার প্রথম বিকাশের নিদর্শনগুলির অন্যতম বলে মনে করতে পারি।

আড্ডার বিবর্তনে রাজসভা > জমিদার-কাছারি, চণ্ডীমণ্ডপ ও বৈঠকখানার যে ভূমিকা ছিল তার কথা অনেকে বলেছেন। যতদূর স্মরণ হয় "চতুরঙ্গে"ই বুদ্ধদেব বসুর একটি মনোজ্ঞ দীর্ঘ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল—আড্ডা ছিল তার বিষয়। কিন্তু আমাদের নাগরিকতা গঠনে আড্ডার ভূমিকা এখনো বিস্তৃত আলোচনাসাপেক্ষ। আমাদের সমাজ বিবর্তনে ইউরোপের চাল আমরা কেউ খুঁজি না। এবং এখানে সম্পর্কগুলির হেরফের স্পষ্টতঃই পশ্চিমের রীতিতে হয়নি। কিন্তু উনিশের ও বিশের শতকে কলকাতার আড্ডার মধ্যে পুরনো সামাজিক আর্থিক, পারমার্থিক সম্পর্কগুলির জের ছিল না বললেই হয়। এর একটা প্রধান প্রমাণ হিসাবে উনিশের শতকের দুই ঠাকুর বাড়িরই উল্লেখ করা চলে। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ি ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আলাপী আসরগুলির প্রধান বিকাশ। কিন্তু পরমহংসদেব উচ্চাসনে বসে ধর্ম বিতরণ না করে, যাকে সাদাভাষায় বলে লোকজনদের সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসতেন। এবং সেই ধর্মীয় আড্ডায় রামকৃষ্ণের আচরণের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি উপদেশামৃত বিতরণ না করে কথামৃত বিতরণ করতেন। আর তাঁর কথার প্রাচীন বৈশিষ্ট্য হল, যে তিনি সচেতনভাবেই নিজেকে উহ্য রেখে কথা বলতে পারতেন। সে কথার প্রাণবস্তু ছিল সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার বহতা স্রোত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আড্ডাতেও প্রসঙ্গের ব্যাপকতা ও বিভিন্নতা থাকলেও, প্রকরণের মিল দুর্লভ নয়। আড্ডার মূল কথা হল এই যে সে উপস্থিত ব্যক্তিদের পাত্তা দেয় না—তার যত কথাবিলাস তা শুধু অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিয়ে।

আড্ডা সম্বন্ধে এ ভূমিকাটুকু আলি সাহেবের গল্প প্রসঙ্গে এই কারণেই প্রাসঙ্গিক যে আড্ডাই আলি সাহেবের গল্পের প্রাণ-ধর্ম এবং রস-ধর্ম। একমাত্র 'পাদটীকা' ছাড়া "সৈয়দ মুজতবা আলির শ্রেষ্ঠ গল্পে"র সমস্ত গল্পই পরিকল্পিত হয়েছে এমনভাবে যেন তা আড্ডা থেকে কুড়ুনো। পাদটীকা-গল্পটি প্রত্যক্ষভাবে গল্পলেখকের বলা গল্প। যদিও মজলিসী গল্পের ধাঁচ বা আদল এখানেও অনুপস্থিত নয়। সুতরাং মজলিসী গল্পের দৃষ্টিতেই আলি সাহেবের গল্পের বিচার হওয়া উচিত। মজলিসের বা আড্ডার গল্পের কতকগুলি লক্ষণ আছে; আপাত লঘুতা, সরস বাগ্‌ভঙ্গী ও সংক্ষিপ্ত কিন্তু দীপ্ত উক্তি প্রত্যুক্তি।

গাল্পিক কাঠামোরও একটা ন্যূনতম আদর্শ বিদ্যমান। কয়েকজন সদস্য-বিশিষ্ট আড্ডার কোনো এক মজলিসী পরিবেশ থেকে প্রতি গল্পের শুরু। কথোপকথনের ভিতর দিয়ে একজন একটি গল্পের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান। গল্প বলা শুরু হয়। মাঝে মাঝে লঘু মুহূর্তে সমবেত হাস্যপরিহাসে আড্ডার বিস্মৃত পরিবেশ জেগে ওঠে। কিন্তু গল্প যখন ঘনীভূত, তখন শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে রসিক স্তব্ধতা ছাড়া আর কিছু নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় যে চরিত্র পাত্রের লঘুতা এসব গল্পে কখনো আতিশয্যে পৌঁছয় না। সার্কাসের ক্লাউন যেমন সব থেকে ওস্তাদ খেলোয়াড় এ গল্পের মজলিসের চ্যাংড়া-সদস্যরাও প্রায় তাই। এই পাত্রগুলির ভঙ্গিতে বাহিরের হাসির ছটা শুধু ভিতরের চোখের জলকে অধিকতর ঝিকমিকিয়ে তোলে।

মুজতবা আলির গল্প তখনই সুন্দর হতে পেরেছে যখনই করুণকে তিনি ব্যবহার করেছেন স্থায়ী রস হিসেবে, এবং সঞ্চারীতে রেখেছেন কখনো শৃঙ্গারকে, কখনো হাস্যকে। প্রসঙ্গতঃ 'নোনাজল' এবং 'পাদটীকা' গল্প দুটির কথাই ধরা যাক। ছোট গল্পের রসোত্তীর্ণতা অবশ্য 'নোনাজলে'ই সার্থক হয়ে উঠেছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি 'পাদটীকা' গল্পটিকে বেশী ভালবাসি। গুরু-পন্ডিত-শিক্ষক স্থানীয় চরিত্রগুলিকে আলি সাহেব অতি পরিমিত রেখায় প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন। চাচাকাহিনীর সেই বর্ণ-সঙ্কর-বিরোধী প্রুসিয়ান ভদ্রলোক হের ওবেস্টের কথা যেমন স্মরণীয় তেমন স্মরণীয় 'পাদটীকা' গল্পের পন্ডিতমশাই। বিদেশী শাসনের ধাক্কায় ভেঙেপড়া প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যা সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা অপেক্ষা এই একটি গল্প যথেষ্ট লক্ষ্যভেদী। পন্ডিতমশাইয়ের পান্ডিত্যের বোঝা এবং ব্যর্থতা দুই-ই সকরুণ শ্রদ্ধায় রূপায়িত হয়েছে এই গল্পটিতে। পন্ডিতী রসিকতার উজ্জ্বল নিদর্শনও অমর হয়ে রয়েছে দুটি একটি উক্তিতে (তার মধ্যে একটি—মর্কট এবং সারমেয় কদাচ এক গৃহে অবস্থান করে না)। 'নোনাজল' গল্পটিতে দূর সমুদ্রগামী জাহাজের বাঙালী খালাসী-জীবনের এক অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। সমিরুদ্দির প্রবাসী জীবন কোনোদিন নিজবাসে গৃহস্থ হতে পারল না—এই সামান্য বক্তব্যকে লেখক বলবার গুণে অসামান্য করেছেন। নোনাজল চোখের জলের, মাথার ঘাম পায়ে ফেলার, এবং সমুদ্রের সার্থক ইঙ্গিত।

বিস্তৃত পর্যটন আলি সাহেবকে বিস্তৃত অভিজ্ঞতার সুযোগ দিয়েছে। নানা ধরনের মানুষের সান্নিধ্য এবং সংস্পর্শে তাঁর মতই তাঁর গল্পের মেজাজ সব সময় শুভ্র এবং উদার। চাচাকাহিনীতে যে আড্ডার বিবরণ রয়েছে তার অভিনবত্বটুকুও এই প্রসঙ্গেই অনুধাবনীয়। চৌধুরীমশায়ের গল্পের কল্পিত আসরে মার্জিত কলকাতাই মন্থরতা স্বাভাবিক। ঈষৎ হুল্লোড়ের পরিবেশ আলি সাহেবের গল্পের কল্পিত মজলিসে তেমনি সঙ্গত। বিয়ারে যতটুকু মাদকতা (আমার শোনা কথা) এই হুল্লোড়েও ততটুকু চপলতা। মানসিকভাবে শঙ্কাসঙ্কোচমুক্ত একদল যুবকের কথা দেশ-গাঁয়ের বাইরের পটভূমিতে আলি সাহেব স্থাপন করেছেন বলেই আড্ডার ঈষৎ উন্দামতা ও চপলতা মানিয়ে গেছে। মানব রসই শেষ পর্যন্ত এই সব মজলিসী কাহিনীর উপজীব্য। 'কর্ণেল' গল্পে সিবিলার কাহিনীতে সেই শুভ্র মানবিকতার অশ্রুসিক্ত মাধুর্যের পরম পরিচয় লাভ করা যায়। 'নোনামিঠা' গল্পটির কথাও এই সঙ্গেই স্মর্তব্য। আলি সাহেব মানবিক আবেগের এবং সম্পর্কের কাছে আমি শতবার কুর্ণিশ ঠুকতে প্রস্তুত। এটাই, তাঁর ত্রুটিগুলোর কথা আমাদের ভুলিয়ে দেয়।

আলি সাহেবের গল্পের ভাষা অবশ্যই অন্তরঙ্গ ভাষা। তাঁর গদ্যে প্রমথ চৌধুরীর

সংযম নেই, মিত বাচনের মহিমা সম্বন্ধেও আলি সাহেব ওয়াকিবহাল কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু গদ্যে একটা সতেজ সঙ্কোচহীনতা আছে—যার মূল্য নিশ্চয় স্বীকার্য। এই গদ্যে গুরু-বিষয়ক কিছু করা যাবে কিনা সে কথা বলতে পারি না। তবে গুরুচন্ডালীর প্রকৃত মাধুর্য তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কারণে যে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সব ভাষারই এই দুই চাল সম্বন্ধে তিনি সমান আগ্রহী। বিশেষ করে সয়াজি রাওয়ের সিংহের গল্পের কথক মৌলবী যখন গল্প বলেন তখন চলতি ভাষার খরস্রোতকে তিনি যেমন কলমে ধরতে পারেন তা বিস্ময়কর। (প্রসঙ্গত দুটো কথা বলি। এই গল্পটি এবং অনুরূপ আরো কতকগুলি গল্প শ্রেষ্ঠগল্পে নেই, এবং এমন দু-একটি গল্প শ্রেষ্ঠগল্পে রয়েছে যা শ্রেষ্ঠগল্পে না থাকলেও চলত। আর, মৌলবী সাহেবের আজগুবি গল্প আলি সাহেব এখনো আরো কতকগুলি বলুন। এগুলি স্বতন্ত্র রসের গল্প।) যে সতেজ এবং সজীব সঙ্কোচহীনতা মুজতবা আলির গদ্যের প্রাণধর্ম তা পরবর্তী কোনো কোনো লেখককেও প্রভাবিত করেছে। এই সঙ্কোচহীনতার জন্য আলি সাহেব মাঝে মাঝে বাংলা উর্দু আরবী ফারসী জর্মন ফরাসির মৃদুমন্দ খিচুড়ি পাকান এবং ভাষাবিদ মুজতবা আলিও হয়তো আত্মপ্রকাশের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন, কিন্তু এই গদ্যরীতি যখন উপযুক্ত বিষয়ের টানে স্রোতঃস্বিনী হয়ে ওঠে তখন চমৎকৃত হতেই হয়। ফারসী মিশেল আমরা অবন ঠাকুরের ভাষায়, নজরুলের ভাষায় পাইনি যে তা নয়। আলি সাহেবের মিশেলের মধ্যে একপোঁচ হিউমার থাকে বলেই এটাকে তাঁদের থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হয়।

এই ধরনের লেখার একটা ত্রুটি থাকে। সে ত্রুটি থেকে মুজতবা সাহেবও মুক্ত নন। শ্রেষ্ঠগল্প সংকলনটির প্রথম গল্প থেকে শেষ গল্প পর্যন্ত গল্পলেখকের কোনো বিবর্তন বা পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় নয়। গল্প লেখার প্রথম দিনেও আলি সাহেব যা লিখতেন আজো তাই লিখছেন। বলার বিষয় বদলায়নি, কাজেই বলবার কৌশলেরও হেরফের ঘটানো দরকার হয়নি। ফলে অনেক সময় একই বক্তব্যের রকমফের, একই প্রকাশভঙ্গির পুনরাবৃত্তি দেখা দিচ্ছে। মানুষ সুন্দর, মানুষ মহৎ, মানুষ বিচিত্র এ কথাগুলো একজন লেখকের অবশ্যই প্রিয়-বিষয় হতে পারে। কিন্তু বিষয়টিকে যদি বারে বারে একই আধারে পরিবেশিত হতে দেখা যায় তাহলে তা লেখকের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। নিজের বিষয় এবং বক্তব্যের জাল থেকে আলি সাহেবকে বেরিয়ে আসার পথ নিজেকে উদ্ভাবন করতে হবে, অথচ দেখতে হবে যে বেরিয়ে আসতে গিয়ে ভেতরে নিজের খাঁটি রসবোধটুকু ফেলে না আসেন। নইলে শুধু বিচিত্র মানুষকে দেখেছি এই অহঙ্কার ছাড়া আর কিছু থাকবে না। অভিজ্ঞতার কারবারী বলেই আলি সাহেবকে একটা কথা তাঁর অনুরাগী পাঠক হিসাবে বলছি : অভিজ্ঞতা অনাদি এবং অনন্ত। কেউ বলতে পারে না তার সীমা কোথায়। মানসোৎকর্ষই প্রধান কথা। সে উৎকর্ষ জাগিয়ে রাখা অনলস শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুস্তক "দেশে-বিদেশে"র পর তিনি যা লিখেছেন তা সবই যেন "দেশে বিদেশে"র ছায়ায় লিখিত। তিনি এই অলসতা পরিহাস করুন। এর জন্যে মনে হয় তাঁর গল্প বলার টেকনিক পাল্টাতে হবে। তাঁর অধিকাংশ গল্পই অপরের মুখে বলানো গল্প। এ ধরনের গল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে গল্পরস জমাট হয়—কিন্তু চরিত্র সৃজনের পক্ষে এ আঙ্গিক-রীতি ততটা ফলপ্রসূ নয়। একজন কথক একজনকে বা একদলকে গল্প শোনাচ্ছে বলেই তার লক্ষ্য থাকে গল্পরসে শ্রোতাকে বুঁদ করে দেবার দিকে। সুতরাং এ ধরনের গল্পে কথককেই চরিত্র হয়ে উঠতে হয়। সে ক্ষেত্রে মুজতবা আলির এখনো দৌর্বল্য রয়েছে। নীললোহিত

একটা চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের স্বরূপ সর্দার একটা চরিত্র—কিন্তু চাচা একটা চরিত্র হিসাবে সার্থক নয়। সে শুধু গল্পের ভাঁড়ারী। সয়াজি রাওয়ের সিংহের গল্পের মৌলবীর সেদিক দিয়ে সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু লেখক তাকে ভাল করে ব্যবহার করেন নি।*

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

*সৈয়দ মুজতবা আলির শ্রেষ্ঠ গল্প। বাক্-সাহিত্য। মূল্য চার টাকা।

সমালোচনা

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। সাহিত্য সংসদ। কলিকাতা-৯। মূল্য পনর টাকা।

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত দীর্ঘকাল যাবৎ ইংরেজী ও বাংলায় বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়া আমাদের দেশের খ্যাত, অখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত নানারূপ ধর্মানুষ্ঠান এবং দেবদেবীর ইতিবৃত্ত ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। পূর্বে তিনি শ্রীরাধার বর্ণনাপ্রসঙ্গে শক্তিতত্ত্বের দার্শনিক স্বরূপ বিচার করিয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থে সেই বিচারের ধারা অনুসরণ করিয়া ভারতীয় সাধন ক্ষেত্রে এক সর্বাত্মিকা মহাদেবীর ঐতিহাসিক বিকাশ ও আধ্যাত্মিক পরিণতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ অবলম্বনে দেবীকথার সাহিত্যিক বিন্যাসের একটা সুসম্বন্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য বলিলে প্রথমেই তান্ত্রিক পূজাচার ও তন্ত্রশাস্ত্রের কথা মনে পড়ে, কিন্তু এই গ্রন্থে তন্ত্রপদ্ধতি বা তান্ত্রিক বিবরণ মুখ্যরূপে আলোচিত হয় নাই। শক্তির প্রতিষ্ঠা কেবল তন্ত্রেই নিবদ্ধ নয়, বেদে পুরাণে কাব্যে—সর্বত্র তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া আছে। যুগে যুগে সাধকের মননে ও ভাবকের বর্ণনে মহাশক্তির মহিমা নানা ধারায় প্রবাহিত হইয়া এক সমৃদ্ধ সৌষ্ঠবে ভারতীয় সংস্কৃতির মহাসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। দেবীর নানা রূপ; তিনি ব্রহ্মস্বরূপিণী হইয়াও আদরিণী বালিকা, চঞ্চলা কিশোরী, সুন্দরী যুবতি, তাপসী সাধিকা, লজ্জাবতী নববধূ, স্নেহশীলা জননী, দৈন্যার্তা ভিক্ষুকপত্নী, ঐশ্বর্যময়ী অন্নদা এবং উগ্রা অসুরসংহারিণীরূপে ভারতবাসীর চিত্তে ও সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। দেবীরূপের এই বিচিত্র বিবরণই "ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্যে" চৌদ্দটি অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু। সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, রামায়ণ সাহিত্য, বাংলা মঙ্গলকাব্য, বাংলা শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলী, পরবর্তী কালের বাংলা কাব্য ও সঙ্গীত এবং ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া ও হিন্দী ভাষার শাক্ত সাহিত্য হইতে রচনা তুলিয়া গ্রন্থকার অধ্যায়ে অধ্যায়ে দেবীমহিমার বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি 'উপক্রমণিকা' অধ্যায়ে শক্তি-সাধনার মূল উৎসের সন্ধান করিয়াছেন। আর্যেতর জাতিগোষ্ঠীর মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আদর্শ হইতে মূলে মাতৃপূজার উদ্ভব হইয়াছিল এই প্রচলিত মতের সমর্থনে যেসব যুক্তি আছে, ডক্টর দাশগুপ্ত তাহার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি সুপ্রাচীন বৈদিক গ্রন্থের মধ্যেও যে দেবীতত্ত্বের বীজ নিহিত আছে, সে কথাও তিনি বিশদভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি সর্বাধুনিক মতবাদও অনুল্লিখিত রাখেন নাই। নূতন নূতন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের ফলে সম্প্রতি নৃবিদ্যার পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন যে, অতি প্রাচীন কালে 'ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আদিম জাতিগুলির মধ্যে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল'। মাতৃপূজার ইতিহাসের মত একটা সমস্যাবহুল বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে যেরূপ

নিরপেক্ষ মনন আবশ্যক, তাহা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়া গ্রন্থকার সকল দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন।

তিনি শক্তিতত্ত্বের আলোচনায় বলিয়াছেন যে, বহু স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ছোট ও বড় নানা প্রকারের ও নানা স্থানের দেবীগণ ক্রমে এক হইয়া শাক্তরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন (পৃঃ ২)—'যে স্থানে যেকালে যত দেবী ছিলেন, সকলকে মিলাইয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন এক মহাদেবী'। তিনি আরও দেখাইয়াছেন (পৃঃ ৭)—'ভারতীয় সাহিত্যে আমরা যে শক্তি বা দেবীর উল্লেখ পাই, তাঁহার মধ্যে বিভিন্ন ধারা পরম কৌতূহলজনকভাবে মিশিয়া গিয়াছে'। ইহাই ত আমাদের বৈদিক দৈবতবিদ্যার মূল তত্ত্ব—'মাহাভাগ্যাদেকৈব দেবতা'। বহুর মধ্যে ঐক্য বুদ্ধি দিয়া দেবতাগণের একীকরণ প্রক্রিয়া ভারতবর্ষের অধ্যাত্মদৃষ্টির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। 'এক সত্যকে বিপ্রেরা বহুরূপে বর্ণনা করেন' ইহা ঋগ্বেদের কথা। একের নানারূপে উপাসনা, বিরাটের ক্ষুদ্ররূপে ধারণা শাক্ত শাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। পুরাণে পিতা ও পুত্রীর কথোপকথনে স্বয়ং পার্বতী হিমালয়কে বলিয়াছেন—

অশক্তো যদি মাং ধ্যাতুমৈশ্বরং রূপমব্যয়ম্।
যদেব রূপং মে তাত মনসো গোচরং তব।
তন্নিষ্ঠতৎপরো ভূত্বা তদর্চনপরো ভব॥

'তাত, যদি তুমি আমার ঐশ্বর্যময় অব্যয় রূপের ধ্যান করিতে অসমর্থ হও, তবে যে রূপ তোমার মনের ধারণযোগ্য, তৎপর হইয়া তাহারই অর্চনা করিও'।

বাংলার শাক্ত সমাজ আজও এই উপদেশ পালন করেন। বহু বাঙালী হিন্দুর গৃহে প্রতিবৎসর 'নিস্তারিণী' দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই দেবী হয়তো মূলে পূর্ববঙ্গের বনবাসীদের স্থানীয় দেবতামাত্র। ইঁহার এক নাম বনদুর্গা। ইঁহার সঙ্গে বারজন পরিকরও পূজা গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই গ্রাম্য বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। দুইজনের নাম গাভূরডলন ও মোচরাসিংহ—এই দুই ব্যক্তি ছিলেন যশোহরের রাজা সীতারামের বিশ্বস্ত সেনানী। ইঁহারা নিশ্চিতই স্বীয় বিক্রমের বলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়াও জ্ঞানী গৃহস্থ বন্যজাতিপূজিতা নিস্তারিণী দেবীর কিংবা তাঁহার বাগ্‌দীজাতীয় পরিকরগণের পূজা ত্যাগ করেন নাই। কারণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে এক অখণ্ড অমিতশক্তির প্রকাশ এই তত্ত্বকথা, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, ভারতবাসীর অন্তরে গাঁথিয়া গিয়াছে। দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন—'একৈবাহং জাগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—এই জগতে এক আমি বর্তমান, আর দ্বিতীয় কে আছে?

ডক্টর দাশগুপ্ত প্রধানত উত্তরভারতের শাক্ত সাহিত্যেই তাঁহার আলোচনা নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কর্ণাটক, অন্ধ্র, দ্রাবিড় ও কেরল দেশের শাক্ত বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে প্রায় বাদই পড়িয়াছে। দক্ষিণ দেশে তন্ত্রালোচনা ও কালীপূজার প্রচলন আছে, সেকথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'দক্ষিণ দেশের এই শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্যের একটা পরিচয় দিতে পারিলে আমার আলোচনা অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারিত।' আমরা আশা করিয়া থাকিব যে, গ্রন্থকার ভাষার বাধা অতিক্রম করিয়া শক্তি-সাধনা সম্পর্কে সকল প্রান্তীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং গ্রন্থের অপর এক খণ্ডে সে সকল তথ্য পরিবেষণ করিয়া তাঁহার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করিবেন।

ডক্টর দাশগুপ্ত কালী, দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু

ললিতা দেবীর কথা কিছুই বলেন নাই। এই দেবী বাংলা দেশে তেমন পরিচিত না হইলেও ইঁহার খ্যাতিবিস্তৃতি কম নয়। পদ্মপুরাণোক্ত দেবীনামের তালিকায় ললিতার উল্লেখ আছে, চণ্ডীকবচে ও 'হৃদয়ে ললিতা দেবী' স্থান পাইয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের পর্বতবাসিনী চণ্ডিকার মত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পার্বতী ললিতাও অসুর নিধন করিয়া দেবগণের 'কার্যসিদ্ধি' করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের চল্লিশটি অধ্যায়ে (৪র্থ খণ্ড, ৫-৪৪ অধ্যায়) বর্ণিত ললিতোপাখ্যান, ললিতাত্রিশতী বা ললিতা-সহস্রনাম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভক্তির সহিত পঠিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ললিতা ত্রিশতীর উপর শঙ্করাচার্য ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তন্ত্রাচার্য ভাস্কর রায়ের ললিতা-সহস্রনামভাষ্য ছাপা হইয়াছে। শারদীয়া দশহরা উপলক্ষে এখনও নানা স্থানে ললিতাদেবীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অসুরঘাতিনী হইলেও ললিতাদেবীর নামে ও রূপে স্নিগ্ধতা আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ভাষায় তিনি 'ইচ্ছাশক্তি-জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়াশক্তি-স্বরূপিণী'।

স্কন্দ পুরাণের নাগর খণ্ডে আর এক প্রসিদ্ধ দেবীর প্রচারকথা পাওয়া যায়। এক সময়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে হাটকেশ্বর প্রদেশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তখন জনগণ রক্তশৃঙ্গে (আবু পাহাড়ে?) অম্বাদেবীকে রক্ষয়িত্রীরূপে সুপ্রতিষ্ঠ করেন। এই পুরাণ-বার্তা নিশ্চিতই প্রান্তীয় শাক্ত ধর্মের প্রসার কাহিনী।

ডক্টর দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'মাতৃপূজা এবং শক্তি-সাধনার প্রচলন বাঙলা দেশে অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে।' এই নবরূপটি কি তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াবিশেষের প্রবর্তনের ফলে লাভ হইয়াছে?

হ্রীং ক্লীং প্রভৃতি সাঙ্কেতিক বীজমন্ত্র দ্বারা দেবীর পূজা, দেহস্থ ষট্‌চক্রে ধ্যানধারণার অনুষ্ঠান, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি আভিচারিক ষট্‌কর্মের প্রয়োগ এবং সাধনায় পঞ্চ মকারের প্রবর্তন—তন্ত্রোক্ত সাধনার বৈশিষ্ট্য। প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্যের মূল অথর্ববেদে পাওয়া যায়। এই বেদে বীজমন্ত্রের মত সাঙ্কেতিক দুর্বোধ শব্দের প্রয়োগ আছে। দেহমধ্যে 'অষ্টাচক্রা নবদ্বারা' পুরীর কল্পনা এই বেদেই প্রথম দেখা যায়। আভিচারিক ক্রিয়া ত অথর্ববেদের একটা মুখ্য বিষয়। সুতরাং বীজমন্ত্র, দেহপূজা ও অভিচারকর্মের জন্য তন্ত্রাগম অথর্ব-বেদের নিকট ঋণী কি না তাহা বিচার্য। অপর কারণেও তন্ত্রের সহিত অথর্ববেদের সম্পর্ক অনুমান করা যায়। তান্ত্রিক ও আথর্বণিক উভয় পক্ষই তাঁহাদের পরস্পর সম্পর্ক স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এক দিকে শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আছে—

অথর্ববেদাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমহাকালিকা পরা।
বিনা কালীং বিনা তারাং নাথর্বণো বিধিঃ ক্বচিৎ॥

—'শ্রীমহাকালী অথর্ববেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; কালী ও তারা ভিন্ন কখনও আথর্বণিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না'। অপর দিকে অথর্ববেদের আঙ্গিরসকল্পে (অপ্রকাশিত) আথর্বণিক দেবতা প্রত্যঙ্গিরার সঙ্গে পৌরাণিক দুর্গা ও তান্ত্রিক ভদ্রকালীর অভেদ ঘোষিত হইয়াছে—

যা দুর্গা সা ভদ্রকালী সৈব প্রত্যঙ্গিরা মতা।

এই অথর্ববেদ বিশেষত এই বেদের পৈপ্পলাদ শাখা প্রাচীনকালে পূর্ব ভারতে চলিত ছিল। দক্ষিণ বাংলা ও উড়িষ্যায় এই শাখার হাজার হাজার অনুগামী এখনও বাস করেন। এই শাখার মূল সংহিতার সহিত কয়েকখানা কল্প ও পদ্ধতি গ্রন্থ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।

পদ্ধতির সহায়তায় অথর্ববেদীয় পুরোহিতগণ রাজাদের উপকারার্থ অভিচারকর্মের অনুষ্ঠান করিতেন। আভিচারিক ক্রিয়া অথর্ববেদে ও তন্ত্রে একেবারে একরূপ। আথর্বণ পদ্ধতির কোন কোন পুঁথিতে প্রদত্ত দিনাঙ্ক হইতে জানা যায় যে, এইগুলি চারিশত বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। আভিচারিক প্রয়োগের প্রচলন অবশ্যই সপ্তদশ শতক অপেক্ষা আরও প্রাচীন।

অথর্ববেদের প্রয়োগে ও তান্ত্রিক ষট্‌কর্মে কোন কোন অংশে সাদৃশ্য থাকিলেও বেদে তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের দেখা পাওয়া যায় না। 'যামলী সিদ্ধি' কিংবা 'যত্র রুচিস্তত্র বিধিঃ' এইরূপ সহজিয়া ভাবের ত কোন ইঙ্গিতই উহাতে নাই। এই সহজিয়া ভাব এবং পঞ্চ মকার-ই কি চীনাচার বা বামাচার? ইহাই কি চীনাঞ্চল হইতে আসিয়াছে? অর্বাচীন যুগের বৌদ্ধাচারও কি ইহারই নাম? তারাতন্ত্রের সাক্ষ্য অনুসারে বশিষ্ঠ এদেশে চীনাচারের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, পরবর্তী কালের চৈনিক তাও-ধর্ম হইতে সহজিয়া অনুষ্ঠান তান্ত্রিক আচারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

শাক্ত বামাচারের ইতিহাস বড়ই রহস্যময়। ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার নিষ্পক্ষপাত ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও শ্রদ্ধালু সাংবেদনিক মন লইয়া তন্ত্রশাস্ত্রের এই দিকের একখানা ইতিহাস রচনায় হাত দিলে তান্ত্রিক শাক্তবিদ্যার বহু সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

Memoirs of a Bengal Civilian. *By* John Beams. Chatto & Windus. London. 30*s*.

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন 'এক্ষণে (ইংরেজী আগস্ট ১৮৮৯) সিভিলিয়ান বীম্‌স সাহেবের নাম প্রায় সকলেই অবগত আছেন।' এই কথার পুনরুক্তি করিলে বলিতে হয় বর্তমানে প্রায় কেহই বীম্‌স সাহেবের নাম অবগত নহেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশে বীম্‌স-এর নাম ছড়াইয়া পড়ার কারণ ছিল। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে হঠাৎ ভারত সরকারের নির্দেশে তাঁহাকে বোর্ড অব রেভিনিউর মেম্বার পদ হইতে সরাইয়া লইয়া একটি নিম্নপদে নিযুক্ত করা হয়। এই শাস্তির কারণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। রাজনারায়ণ বসু বলেন বীম্‌সকে দেনার অপরাধে পদাবনত করা হয়। ইহা সত্য যে বীমস্‌ বারম্বার অর্থকষ্টে পড়িয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। তথাপি দেনার দায় সম্যক কারণ বলিয়া মনে হয় না। ১৮৮৭ সালে ২২শে আগস্ট তারিখে বীম্‌স কলিকাতায় একটি শিক্ষা কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহূত হন। পরে দেখা যায় তাঁহার রোজনামচায় ঐ তারিখে তিনি লেখেন 'আজ আমি কমিশনে সাক্ষ্য দিয়াছি এবং নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের গলায় ছুরি বসাইয়াছি।' তিনি তাঁহার সাক্ষ্যে কি বিবৃতি দেন তাহা আজও সঠিক জানা যায় নাই। তবে ইহা অনুমান করা অমূলক নহে যে বীম্‌স তাঁহার স্বভাবসুলভ স্পষ্টভাবে এমন কথা বলিয়াছেন যাহা কর্তৃপক্ষ অবজ্ঞাসূচক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বীম্‌স-এর ভীতি মিথ্যা হয় নাই। পদাবনতির পর ভারতীয় পত্রিকাগুলিতেও তাঁহাকে

বিষম গালিগালাজ করা হয়। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পুনর্বার বোর্ড অব রেভিনিউর মেম্বর পদে উন্নীত হন।

বীম্‌সকে লইয়া রাজনীতিক কোলাহল কবে বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বীয় কীর্তির বলে তিনি আজও সগৌরবে বাঁচিয়া রহিয়াছেন। ইহার কারণ বীম্‌স তৎকালীন 'কোই হাই'দের ন্যায় চাকুরী ও মদ্যসর্বস্ব ছিলেন না। কঠিন কর্মজীবনের মধ্যেও তিনি ভাষাতত্ত্ব লইয়া যে কাজ করিয়া গিয়াছেন কাল তাহার জ্যোতি ম্লান করিতে পারিবে না। সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রিয়ারসন বীম্‌সকে গুরুজ্ঞান করিতেন। ১৯০২ সালে বীম্‌স-এর মৃত্যুর পর গ্রিয়ারসনের শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহার অকপট ও গভীর ভক্তির পরিচায়ক। এই লেখাটিতে দেখা যায় যে ১৮৭৯।৮০ সালে বীম্‌সের একটি পত্র যুবক গ্রিয়ারসনকে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আজীবন সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বীম্‌সকে আর্য-ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। আজিকালিকার এই ভাষাবিজ্ঞানকে একটি বিরাট প্রবহমান নদীর সহিত তুলনা করিয়া তিনি বলেন যে ইহার উৎস হইল ১৮৬৭ সালে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত *Outlines of Indian Philology* নামক বীম্‌স-এর প্রণীত একটি চটি গ্রন্থ। বীম্‌স-এর সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য অবশ্য তাঁহার *Comparative Grammar of the Aryan Languages of India*। ইহা ব্যতিরেকে বীম্‌স একটি অতি উৎকৃষ্ট বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন যাহা ১৯২২ সাল অবধি বাংলাদেশের সিভিলিয়ানগণের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। মৃত্যুকালে বীম্‌স বাবরের আত্মজীবনীর অনুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি আমাদের ন্যায় পাঠকের অধিকার বহির্ভূত। বীম্‌স-এর *Memoirs of a Bengal Civilian* অবশেষে সাধারণ পাঠকবর্গকে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার উপায় করিয়া দিল। এই আত্মজীবনীটির ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই অবগত ছিলেন না। তাঁহার দৌহিত্র ক্রিস্টোফার কুক-এর উদ্যোগে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে কুক ভারত হইতে কার্যে ইস্তফা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। একদিন তিনি তাঁহার মাতার বাক্সের পারিবারিক কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এই অমূল্য আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বে ইহার কিয়দংশ ফিলিপ মেসন তাঁহার *The Men Who Ruled India* নামক গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

জন বীম্‌স ১৮৩৭ সালে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা পাদ্রী ছিলেন। ইস্কুল কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া বীম্‌স বিশ বৎসর বয়সে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তৎকালে নবনিযুক্ত সিভিলিয়ানগণকে ভারতে পাঠাইবার পূর্বে হালিবারী কলেজে তালিম লইবার জন্য পাঠানো হইত। বীম্‌স্‌ হালিবারী কলেজে ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তির জন্য পারিতোষিক লাভ করেন। ১৮৫৮ সালে অন্যান্য 'কম্পিটিশানওয়ালাদের' ন্যায় তাঁহাকেও ভারতে আসিয়া ফার্সী ও হিন্দী ভাষায় পরীক্ষা দিবার জন্য বৎসরাধিক কাল থাকিতে হয়।

বীম্‌স-এর কলিকাতা বিষয়ক নাতিদীর্ঘ পরিচ্ছেদটি এই পুস্তকটির একটি উপভোগ্য অংশ। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যাঁহারা মিসেস ফে, বিশপ হেবর, এমিলি এডেন, ফ্যানি পার্কস, কোলস্‌ওয়ার্দী গ্র্যান্ট, এম্মা রবার্টস, ভিক্টর জাকমো, জনসন, ক্যাপটেন্‌ বেলিউ, ক্যাপটেন্‌ উইলিয়ামসন ইত্যাদির লেখার সহিত পরিচিত তাঁহারাও 'তাজা বিলাইতি' যুবক

বীম্‌স-এর কলিকাতার প্রথম অভিজ্ঞতা পড়িয়া আহ্লাদিত হইবেন। ফার্সী মুন্সী হরিপ্রসাদ দত্ত, মিডল্‌টন স্ট্রীটের হোটেলওয়ালীর সুন্দরী কন্যা লুলুর সহিত সাময়িক আশনাই ও সেই প্রসঙ্গে টমাস নামক স্থূলকায় নীল ও অহিফেন ব্যবসায়ীর দৌরাত্ম্য—এই সকল কাহিনী গুরুগম্ভীর ও ভীতিপ্রদ ভাষাবিদ পণ্ডিত বীম্‌স-এর লঘু রসজ্ঞানের পরিচয় দিয়া সাধারণ পাঠকের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে সাহায্য করিবে।

ইহার পরের পরিচ্ছেদটিতে বীম্‌স তাঁহার কলিকাতা হইতে কার্যে যোগদানের জন্য পাঞ্জাব যাত্রা ও চাকুরী জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। রেললাইন পাতার পূর্বে সাহেববিবি ও দেশীয় বড়লোকগণকে কার্যব্যপদেশে ভ্রমণ করিতে হইলে হয় নৌকাকে, নাহয় ঘোড়ার ডাকগাড়ি নতুবা পাল্‌কির আশ্রয় লইতে হইত। তদানীন্তন ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি পড়িলে এইরূপে যাতায়াত করা কিরূপ শ্রমসাধ্য, বিপদসঙ্কুল এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ ছিল তাহা জানা যায়। বীমস্‌-এর সময়ে সবে রেলগাড়ির পত্তন হইয়াছে। বীম্‌স কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জ অবধি রেলপথে যান। তথা হইতে বজরা, রেলগাড়ি ও ঘোড়ার ডাকগাড়ি চড়িয়া এলাহাবাদ, কানপুর ও দিল্লী হইয়া বীম্‌স লাহোরে পেঁছান। লাহোরে উপরওয়ালাদের নিকট হাজির হইলে হুকুম হইল : তুমি গুজরাট শহরে গিয়া কাজে নিযুক্ত হও। এই সংক্ষিপ্ত হুকুম তামিল করিতে গিয়া বীম্‌স কিছুটা বিপদে পড়িলেন কারণ গুজরাট নামক স্থানটির অবস্থান সম্পর্কে তাঁহার বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। খবর লইয়া জানিলেন স্থানটি উত্তর পশ্চিমাভিমুখে পেশোয়ারের পথে পেশোয়ার হইতে ৭০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। অবশেষে কলিকাতা ছাড়িবার ২৬ দিন গতে এক শীতের প্রাতঃকালে চারি ঘটিকায় বীম্‌স তাঁহার অভিষ্ট গুজরাট নামক গণ্ডগ্রামে পেঁীছিলেন। পরদিবস যুবক ডেপুটি কমিশনার এডামস্‌ তাঁহাকে দেখিয়া কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইলেন কারণ তিনি নিজে কাজে জেয়াদা লায়েক না হওয়ার জন্য একজন অভিজ্ঞ সহকারীর অপেক্ষায় ছিলেন। এডাম্‌স নবাগত বীম্‌সকে নিজের কাছারী দেখাইয়া অপর একটি কামরায় লইয়া গিয়া বলিলেন—এই লও তোমার দপ্তর, এই লও তোমার আমলা, এবার কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া পড়। এডাম্‌সের কাণ্ড দেখিয়া বীম্‌স আকাশ হইতে পড়িলেন, কারণ তিনি না জানেন ভাষা, না জানেন আইনকানুন, না জানেন কোনো কিছু।

However, no time was to be lost; the people were already staring at me rather wonderingly as I hesitated for a minute, so I took my seat at a plain and rather dirty table separated from the rest of the room by a plainer and dirtier railing. The amla took their seats, some on a form beside the table, others on carpets on the floor, and the head man of them a young, slight Musulman named Mushtak Ali, who I afterwards learnt was my sarishta-dar, rose and pointing to a pile of papers covered with writing in the Persian character, said in beautiful Delhi Hindustani with many courteous periphrases, 'These are the cases on your Honour's file for trial—what is your order?' I said as by instinct, 'Call up the first case', though what I was to do with it I knew as little as the man in the moon. Mushtak Ali smiled and looked round at his fellows as who should say, 'Guessed

right the first time'. Then he mentioned some names to a six-foot-high Sikh with a turban as big as a bandbox, armed with sword and shield, who went out into the veranda and bawled loudly for some minutes. Then entered a dirty, greasy shopkeeper, the plaintiff, who was sworn by the tall Sikh, and had a wooden tablet given him with the words of the oath written on which he held tight all the while he was making his statement. I was furnished with a printed form and requested to fill in what the greasy man said in a certain column, other columns being intended for the statements of the defendant and witnesses. The defendant was next sworn and deposed. He was a big, powerful zemindar, i.e. peasant with a long black beard. Both these people spoke Panjabi, of which I could not understand one word, but the sarishtadar translated it into Hindustani as they spoke, so I got on wonderfully well. By four o'clock I had disposed of all my cases. বীম্‌স পাঞ্জাব-গুজরাটের পর ক্রমান্বয়ে আম্বালা, লুধিয়ানা, সাহাবাদ, পূর্ণিয়া, চম্পারণ, বালেশ্বর, কটক ও চট্টগ্রামে কর্ম গ্রহণ করিয়া পেনশন গ্রহণ করেন।

বীম্‌সের চাকুরী জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী যেরূপ চিত্তাকর্ষক সেইরূপ মূল্যবান। এই সমালোচনার স্বল্প পরিসরের মধ্যে অবশ্য আমরা তাহার মাত্র দুই একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতে পারিব।

বীমস্‌ যখন ১৮৬৬ সালে চম্পারণ জিলায় বদলি হন তখন সেই স্থানে নীলকর সাহেবগণের বড়ই জুলুম, বড়ই দৌরাত্ম্য ছিল। অসহায় রায়তগণের উপর এই কুঠিয়ালগণ যে অমানুষিক অত্যাচার চালাইত তাহার কোন চারা ছিল না। কারণ শুধু চম্পারণ নহে বিহার ও বঙ্গদেশের সর্বত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাহাদের 'ভাই বেরাদর'ও সহায়ক ছিল। ১২৬৫ সালের ১লা (ইংরাজী ১৮৫৮) মাঘের সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে গুপ্তকবির নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য :

'নীলকর সাহেবরা ম্যাজিস্ট্রেটদিগের নিকট প্রতিবাদীরূপে উপস্থিত হইলেও অতি সম্ভ্রমের সহিত গৃহীত হয়েন, হরিহর মূর্তির ন্যায় একাঙ্গ হইয়া হাস্যবদনে 'সেকহেন' করেন, ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া যাহা বুঝাইয়া দেন তাহাই বুঝেন। কোনো কুটিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের শালা, কেহ ভাই, কেহ ভগিনীপতি, কেহ পিসে, কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ গ্রামস্থ, কেহ সমাধ্যায়ী, এই প্রকার পরস্পর সম্বন্ধে এক একটা সংযোগ আছে, এবং তাহা না থাকিলেও সকলেই 'এক সানকীর-ইয়ার' কোনোমতে ছাড়াছাড়ি হইবার জোটি নাই...

'কিন্তু কোন-কোন সাহেব এমত ধার্মিক আছেন, যে তাঁহারা যুধিষ্ঠির তুল্য। তন্মধ্যে কেহ কেহ মনের বিনা সংকল্পে সঙ্গদোষে কলঙ্কি হয়েন। আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি শাদা হাকিমের দ্বারা শাদা নীলকরেরা কোন মতেই শাসিত হইবেন না।'*

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বীম্‌স 'সঙ্গদোষে কলঙ্কি' হন নাই। তিনি চম্পারণ জেলায় কুঠিয়াল নীলকরদিগের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

* বিনয় ঘোষ সম্পাদিত "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র" (১ম খণ্ড)।

The planters' policy was to get rid as much as possible of the authority of the magistrate because it interfered with the despotic control which they consider it essential to use over their ryots. This control often degenerated into cruel oppression. কিন্তু বীম্‌স নিজের ক্ষমতাকে এতটুকুও হ্রাস হইতে দেন নাই। কারণ :

It was not, as some of my detractors alleged, from mere lust of power that I insisted on being master of my own district and having my own way in all things, but because the district was a sacred trust delivered to me by the Government, and I was bound to be faithful to that charge. I should have been very base had I from love of ease or wish for popularity sat idly by and let others usurp my place and duties. Ruling men is not a task that can be performed by *le premier venu* and though I was young at it, still I had five years' training and experience prefaced by a liberal education, while these ex-mates of merchant ships and *ci devant* clerks in counting-houses had had neither। ইহা যে বীম্‌সের মিথ্যা আস্ফালন নহে তাহা তিনি কার্যে দেখাইয়াছিলেন। যখন চম্পারণ জিলার দোর্দণ্ড প্রতাপ কুঠিয়াল বলডুইন এক গরিব রায়তকে নীল চাষ করিতে নারাজ হওয়ার জন্য তাহার ক্ষেতখামার হইতে উৎখাত করিবার চেষ্টা করে তখন বীম্‌স সমন জারী করিয়া তাহাকে ও তাহার লোকজনকে নিরস্ত করেন। শুধু তাহাই নহে বলডুইন মোটা টাকা দিয়া চাষীটির সহিত আপোষ-মীমাংসা করিয়া লইতে বাধ্য হয়। ইহার অল্পদিন পরে বলডুইনের সহকারী এডওয়ার্ডস নামক কুঠিয়াল যখন কয়েকজন লোককে জোর জুলুম ও মারধোর করিয়া বেগার খাটাইতে বাধ্য করে তখন বীম্‌স তাহাকে পাঁচশত টাকা জরিমানা করেন এবং আবার এইরূপ করিলে ছয়মাস কয়েদ করিবার ভয় দেখাইয়া শায়েস্তা করেন। ফলে বীম্‌সের সময়ে চম্পারণ জিলা কিছুদিনের জন্য নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে অনেকটা মুক্ত হয় যেরূপ ইহার ৭।৮ বৎসর পূর্বে দেশী হাকিম চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে মুর্শিদাবাদের চাষীরা কিছুদিনের জন্য নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল।

বীম্‌স-এর চাকুরী জীবনের সবচেয়ে সুসময় উড়িষ্যায় কাটে। ১৮৬৯-৭৩ সালে বালেশ্বরে থাকাকালীন তিনি তাঁহার *Comparative Grammar* রচনা শুরু করেন এবং প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করেন। এই দুঃসাধ্য কর্ম তিনি কি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সম্পাদন করেন নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে তাহার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাইবে।

It was difficult to find time for linguistic work, not so much because official work was heavy, as because of the constant interruptions to which one in my position is subjected. Still, I managed to devote some time nearly every day to my *Grammar*, and to extend my slight knowledge of European languages. I used to take up one language at a time and stick to it for a month or two, after which I went on to another. One cold weather I read *Don Quixote* through

in the original Spanish and a great part of Ercilla's long and rather tedious poem, *La Arancana*, with which, after the flowing description of it in Humboldt's *Cosmos*, I was rather disappointed. Another time I had a spell of Goethe, or Tasso, or Balzac, a strange farrago! I was, however, more in need of German, because in writing my *Comparative Grammar* it was necessary to consult so many German authorities. Much painful wading through Bopp, and Grimm and Pott had to be done. It was a relief to turn from them to the grand old Spanish ballads of Rey Don Sancho, or el Cid Campeador, though both had often to be laid aside to settle some knotty point about the collection of revenue or detection of crime. It was a curiously mixed life as regards the mind and its workings that I led in those days.

বালেশ্বরে থাকাকালীন সুবিখ্যাত ডবলিউ. ডবলিউ. হান্‌টার তাঁহার গৃহে কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। হান্‌টার সাহেবকে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট পরিচয় করা নিষ্প্রয়োজন। হান্‌টার সম্বন্ধে বীম্‌স-এর পরিহাসপূর্ণ মন্তব্যটির উদ্ধৃতি করিবার লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না :

About this time we received a visit from that vivacious but not very accurate writer, Dr. W. W. Hunter, who during a stay of seven days subjected me to such an unceasing fire of questions that on his departure I solemnly forbade anyone to ask me any more questions for a month. He was then a small, lean, hatchet-faced man with a newspaper-correspondent's gift of facile, flashy writing, and a passion for collecting facts and figures of which he made fearful and wonderful use afterwards. The light-hearted subalterns of the regiment at Cuttack had amused themselves by inventing for his benefit wonderful yarns, all of which he duly entered in his note-book and reproduced in his book on Orissa. He was rather a troublesome guest as he was not contented with our simple food.

বীম্‌সকে রাজনারায়ণ বসু বাঙ্গালী বিদ্বেষী বলিয়াছেন। এই অভিযোগের মধ্যে সত্য থাকিতে পারে কারণ বর্তমান পুস্তকটির একটি ফুটনোটে কোন একটি মর্মান্তিক ঘটনা প্রসঙ্গে বীম্‌স বাঙ্গালীদের পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভীরু জাতি বলিয়া কটু মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু গরিবের প্রতি সহানুভূতি, এবং তাহাদিগের দুঃখ বুঝিবার ক্ষমতা বীম্‌সের চরিত্রের একটি মহত্তম গুণ ছিল। নীলকরদিগের অত্যাচার বন্ধ করা ছাড়া, বালেশ্বরে তৎকালীন লবণ শুল্ককে তিনি অমানুষিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা রদ করিতে প্রচেষ্টিত হন। বীম্‌স লিখিয়াছেন তখনকার দিনে পুলিশগণ নিমকের আড়ং হইতে পেশাদার শুল্কাপহারক দল 'পুকুরচুরি' করিলেও কিছু করিতে পারিত না কিম্বা চোখের মাথা খাইয়া দেখিত না। কিন্তু গরিব লোক একহাঁড়ি সমুদ্রের জল লইয়া নুন তৈরি করিলে

পুলিশ তাহাদিগকে 'ঘাটদান' না দিবার অপরাধে মারপিট করিয়া বেলিগারদে চালান দিত।

বীম্‌স একটি বৃদ্ধার উপর এইরূপ অত্যাচার করার কথা অত্যন্ত বেদনার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধা এক কলসী জল লইয়া পান্তাভাতের সহিত খাইবার জন্য নুন তৈরি করিতে গেলে পুলিশ তাহাকে শুল্ক ফাঁকি দিবার অভিযোগে গ্রেফ্‌তার করিয়া নড়া ধরিয়া টানিয়া পঁচিশ-ত্রিশ ক্রোশ দূরে বালেশ্বরের আদালতে লইয়া যায়। অবশ্য "ধর্মভীরু" হাকিম বৃদ্ধাকে আইনসম্মতভাবে জরিমানা করিয়া মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিতে কুণ্ঠা করেন নাই। বীম্‌স কিন্তু এইরূপ মামলায় গরিব আসামীগণকে সর্বদা বেকসুর খালাস দিতেন। এই ধরনের উল্টা বিচারের ফলে সরকারী মহলে প্রথমে হুলুস্থুলু পড়িয়া যায়। অবশেষে বীম্‌স-এর 'ফতে' হয়। ফাইল ও পত্র মারফৎ বহু লড়ালড়ির ফলে সরকার বাহাদুর অবশেষে গরিব লোকদিগকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য লবণ করিবার অনুমতি দেন।*

বীম্‌স-এর সাহস ও তেজস্বিতা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে দীপ্তিশালী করিয়াছিল। তিনি তাঁহার সদ্বুদ্ধি ও বিবেক-প্রণোদিত কার্য সর্বদা নির্ভীকরূপে করিয়া যাওয়া কর্তব্যজ্ঞান করিতেন। অন্যায় ও মূর্খতার নির্মম বিরোধিতা ও স্পষ্ট সমালোচনা করার জন্য বীম্‌সকে চাকুরী জীবনে বড়লাট হইতে সকল উপরওয়ালাদের কোপে পড়িয়া যে বারম্বার নাজেহাল হইতে হইয়াছে তাহার একটি উদাহরণ আমরা প্রথমেই দিয়াছি। কিন্তু বীম্‌স কদাচ ওপরওয়ালাদের তোষামোদ করেন নাই। পরন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে অহেতুক অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছেন যাহার মধ্যে আত্মম্ভরিতার আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। ফিলিপ মেস্‌ন লিখিয়াছেন যে বীম্‌স্ 'did not really care for lieutenant Governors as a class'. বাংলার তদানীন্তন সুবিখ্যাত ছোট লাট তীক্ষ্ণধী স্যার রিচার্ড টেম্পল সম্পর্কে তিনি নানা চোখা চোখা মন্তব্য করিয়াছেন এবং একস্থানে লিখিয়াছেন 'No flattery was too gross for him'. সরকারী হৃদয়হীনতা ও নির্বুদ্ধিতার ওপর তিনি পুস্তকটিতে শতবার কষাঘাত করিয়াছেন। আজিকালিকার ন্যায় তখনকার দিনেও সরকারী হোমরা-চোমরার কোন স্থান পরিদর্শন করিতে গেলে চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া যাইত। এবং স্থানীয় রাজকর্মচারী ও খয়েরখাঁগণ চূড়ান্ত ধুমধামের ব্যবস্থা ও ঘটা করিতেন। এই জাতীয় জাঁকজমকের অর্থহীনতা বীম্‌স-এর নিম্নোক্ত কথাগুলির মধ্যে যেরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা বিরল এবং কথাগুলি আজিকার 'সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র' এই স্বাধীন ভারতেও মর্মান্তিকভাবে সত্য।

'But the idea that by a hurried tour—and all tours in so vast a country as India must be more or less hurried, because there is so much ground to be got over in a limited time—a Governor can make himself really acquainted with a province as big as England is a delusion. The place does not look itself to begin with, because it is dressed up for his reception and looks as unlike itself as a workman in his

* সিট্‌ন-কারের *Selections from the Calcutta Gazette (1789 to 1797)* হইতে জানা যায় যে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার আইনজারী করিয়া জনসাধারণের লবণ প্রস্তুত করা বন্ধ করেন এবং মণ প্রতি ৩।० শুল্ক ধার্য করেন। যে বৎসর এই আইন হয়, সেই বৎসর আনুমানিক ৭০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

Sunday clothes. All the natural everyday dirt and misery is bundled out of sight. 'Eye-wash', as it is called in India, prevails everywhere, even if everyone does not go to the length attributed by a well-known story to the Collector who had the trunks of the trees on all the station-roads white-washed. So the great man does not see the real place, and unless he is an exceptionally keen-sighted man he takes his superficial, hastily-formed impression for real knowledge, which does more harm than good.

If also we set against the problematical benefit of the great man's seeing things, or thinking he sees them, with his own eyes, the real and undoubted mischief he does by disorganizing the whole administration for a week or more, closing the courts, delaying the disposal of cases, putting a stop to business of all sorts, leading Municipalities and other public bodies to spend more money than they can afford in decorations, fireworks, illuminations and triumphal arches, it will be seen that the net gain for these tours is infinitesimal, if not absolutely nil.' এই পর্যন্ত লিখিয়া মনে হইতেছে যদিও আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে বীম্‌স সাহেব শুধু সুপণ্ডিত নহেন সুরসিকও বটেন তবুও যেন আমরা বইটির গুরুত্ব সম্বন্ধে একটি বেশি ঠেশ দিয়াছি। গ্রীয়ারসন বীম্‌স এর *Comparative Grammar* এর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তিনি পুস্তকটির পাণ্ডিত্য না চিন্তা ও লিখনভঙ্গীর স্বচ্ছতা কোনটির বেশি তারিফ করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইতেন না। *Memoirs of a Bengal Civilian*-এ শাণিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের পরিচয় পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে আছে। আমরা যে বীম্‌স-এর উদ্ধৃতিগুলি ইতিপূর্বে দিয়াছি তাহা হইতে বীমস্-এর সহজ, সুন্দর রচনা ক্ষমতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। ফিলিপ মেসন্ তাঁহার ক্ষুদ্র মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে কারলাইল ও রাস্কিনের যুগে এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল ইংরাজী বড় বেশি লোকে লিখিতেন না। আমরা এই স্থলে বীম্‌স কয়েকটি আঁচড়ে চট্টগ্রামের বাবু রামকিনু দত্তর যে চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতে চাই। দত্তজা মহাশয়ের ইংরাজী ভাষায় পদ্য লিখিবার বড়ই বাতিক ছিল এবং তাঁহাকে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে কেহ কেহ 'Byron of Bengal' আখ্যা দিয়াছিলেন। রামকিনুবাবুরও নিজের কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি বড়লাটকে পর্যন্ত তাহার কবিতা পাঠাইতে পিছপাও হইতেন না কারণ তিনি ভাবিতেন যে তিনি যাহা লিখিতেন তাহাই পাকা সোণা। চট্টগ্রামের মেডিকেল সার্ভিস হইতে পেনশন গ্রহণ করিবার পর, তিনি বীম্‌সকে যে 'কবিতা'গুচ্ছ পাঠাইয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে বীম্‌স লিখিয়াছেন :

The poems he sent me on this occasion were written in a beautiful copperplate hand on large sheets of paper, with an elaborately drawn and coloured border which it must have taken him a long time to do. The following are the only scraps of his immortal work which I can now find. As he had all his poetry printed for him by a

friendly Bengali printer, posterity will not be deprived of them. I copy literatim and verbatim.

Old Year!

Sir (*me—not the old year*).
Our friend old year gasping his last
Neither he tastes supper nor break-fast,
Not inclines sago, not a drop of tea,
Never feels well even in the land or sea;
His declining health now never gives him hopes,
Shudders at the face, and senselessly mopes.
(then a hundred lines ending with):
He is sorry for a look about Cabul prepotency
is to assume the beauty of a decadency—Adieu!

R. K. D.

কর্মজীবন ছাড়া বীম্‌স তাঁহার স্মৃতিকথায় বংশপরিচয়, বাল্যজীবন ও পারিবারিক জীবনের কথাও চিত্তগ্রাহীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বীম্‌স তাঁহার আত্মজীবনী ছাপাইবার উদ্দেশ্যে লেখেন নাই। একথাও অবশ্য ঠিক যে ছাপাইবার উদ্দেশ্যে লিখিলেও যে ইহার চেহারার খুব হেরফের হইত তাহা মনে হয় না। তিনি বইটিতে সকল কথা সোজাসুজিভাবে বলিয়াছেন এবং সাজপোষাক পরিয়া নিজেকে 'স্টেজে' নামাইবার চেষ্টা করেন নাই। যাহা তিনি নন তাহা সাজা বীম্‌স-এর ধাত-বিরুদ্ধ ছিল। এই অকপটতা বীম্‌স-এর আত্মজীবনীর মোহনীয় আকর্ষণ।

পরিশেষে আমরা বলিতে চাই পুস্তকটি শুধু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের ভারতশাসন প্রণালী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্যের আকরই নহে, ইহা একটি অসাধারণ ব্যক্তির জীবন্ত চিত্র। আমাদিগের বিশ্বাস সকল রসিক ও বুদ্ধিমান পাঠকই ইহা পড়িয়া মুগ্ধ হইবেন।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

Has Capitalism Changed? An International Symposium. Edited by Shigeto Tsuru. Iwanami Shoten. Tokyo.
Beyond the Welfare State. *By* Gunnar Myrdal. Gerald Duckworth. London. 21*s*.
The Waste Makers. *By* Vance Packard. Longmans. London. 21*s*.

গত কয়েক দশকে সমাজবিজ্ঞান প্রভূত উন্নতিলাভ করেছে, শাখা-প্রশাখায় এর পরিধি ব্যাপ্ত হয়েছে, বিশ্লেষণের কৌশল তীক্ষ্ম হয়েছে, আলোচনা নিঃসন্দেহে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা যায় যে সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক অনুশীলনে প্রাক্তন বীক্ষার

বিস্তার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আলোচনার পটভূমি অধিকাংশ সময়ই সমাজজীবনের অংশবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে, বিশ্লেষণের প্রখর অনুবীক্ষণ প্রায়শ ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ নিয়ে আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম হয়। আমাদের ক্যানভাস অনেক ছোট, আমাদের গবেষণায় ঐতিহাসিক দর্শন বা Historic Vision-এর ব্যাপ্তি দুর্লভ। হয়ত আধুনিককালের প্রকৃতিই এই, বিরাট উদার সৃষ্টির পরিপন্থী এর আবহাওয়া, তাই আধুনিক সাহিত্যে এপিকের সৃষ্টি প্রায় অসম্ভব, আধুনিক দর্শনে পজিটিভিস্ট কচকচিতে আমরা জীবনের গভীর সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবতে ভুলে যাই, আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে সমাজজীবনের ঐতিহাসিক প্রবাহের বিরাটত্ব খুঁজে পাই না। মাঝে মাঝে যদি আমরা আমাদের বিক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ গবেষণা থেকে মুখ তুলে সমগ্র সমাজব্যবস্থাটিকে একটু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখি তাহলে সম্ভবত সমাজবিজ্ঞানের প্রগতি আরও একটু সুষম হতে পারে।

পৃথিবীর যে বিরাট ভূখণ্ডে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা আজও সগৌরবে অব্যাহত, সেখানে এই সমাজব্যবস্থার ভগ্নাংশিক রূপ বিশ্লেষণের যে চেষ্টা হয় তার তুলনায় সামগ্রিক গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা নিতান্তই পরিমিত। চেষ্টা যদিও বা হয়, তাও অধিকাংশই হয় অবিমৃশ্য স্তাবকতায় পঙ্কিল নয় বিনাশক পক্ষপাতিত্বে জর্জর। অথচ গত কয়েক দশকে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রচুর পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের মৌলিকত্ব বা স্থায়িত্ব এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনে এর তাৎপর্য সম্পর্কে প্রাজ্ঞ গবেষণার অবকাশ আছে। যদিও বর্তমান প্রবন্ধকার ইত্যাকার উচ্চাভিলাষে উদ্বাহু নন, তথাপি উল্লিখিত পুস্তকত্রয়ের মূল্যবান্ সহায়তায় আলোচনার সূত্রপাত করলে তা কিঞ্চিৎ কার্যকরী হলেও হতে পারে। অবশ্য প্রারম্ভেই বলা প্রয়োজন যে ধনতন্ত্রের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতির বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশে আমরা যথাসম্ভব নিরস্ত থাকব, এই পথে বিবাদ-বিতর্কের যে অতল ঘূর্ণাবর্ত তা থেকে দূরে থাকাই সমীচীন। আরও বলা প্রয়োজন যে যেহেতু ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ আজ যুক্তরাষ্ট্রে, আমরা আমাদের আলোচনায় ঐ দেশের সামাজিক ও আর্থিক জীবন থেকেই তথ্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করব।

গত দুই দশকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ধনে-ধান্যে-পুষ্পে যথেষ্ট সমৃদ্ধিলাভ করেছে, জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে জাপান ও পশ্চিম জার্মানীর আর্থিক বৃদ্ধির হার অন্য দেশগুলির বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে যুদ্ধোত্তর যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক বৃদ্ধির হার এমন কিছু চমকপ্রদ নয়; ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে মোট জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির বার্ষিক গড়পড়তা হার ছিল শতকরা ২·২, অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৮ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ঐ হার ছিল শতকরা ২·৯। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সমৃদ্ধি পূর্বের তুলনায় অনেক সুস্থিত, উত্থানপতনের মাত্রা অনেক কম, ছোটখাট মন্দা যে একেবারেই অনুপস্থিত ছিল তা নয়; ১৯৪৮-৪৯, ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৬০-৬১তে ব্যবসা-বাণিজ্যের নিম্নগতি যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়েছে। কিন্তু ১৯২০-২১, ১৯২৩-২৪ এবং ১৯৩৭-৩৮এর মন্দার তুলনায় এদের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম ছিল, সবচেয়ে বড় কথা ১৯৩০এর সর্বনাশা মন্বন্তরের এখনও পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি হয়নি। ধনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শত্রু অর্থনৈতিক জীবনের এই উত্থানপতন। এই সমস্যা নিরাকরণের সামর্থ্যই অনেক সময় ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সাফল্যের কষ্টিপাথর বলে বিবেচিত হয়। তাই ধনতন্ত্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসের গভীরতর পর্যালোচনায় আগ্রহান্বিত

হবার কারণ আছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক জীবনের দোলাচলবৃত্তি সম্পর্কে সম্যক্ আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মোট চাহিদার পরিমাণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ, একথা আজ অনস্বীকার্য যে চাহিদার অপ্রাচুর্য ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধির পথে একটি প্রধান অন্তরায়।

প্রথমেই ধরা যাক ভোগ্যপণ্যের চাহিদার কথা। ভোগ্যপণ্যের ব্যক্তিগত ব্যয় ১৯৩৭-৩৯ সালে গড়ে ছিল মোট চাহিদার ৭৫ শতাংশ, ১৯৫৪-৫৬ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ শতাংশে। ভোগ্যপণ্য আবার দুই প্রকারের, স্থায়ী এবং অস্থায়ী। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোট খাদনের ৬০ শতাংশেরও বেশী ছিল খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, পরিধেয় ইত্যাদি অস্থায়ী ভোগ্যপণ্যে। ১৯৫৭ সালে তা নেমে এসেছে ৪৫ শতাংশে। সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটর গাড়ী, রেফ্রিজারেটার, টেলিভিসান, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, প্রক্ষালন যন্ত্র ইত্যাদি স্থায়ী ভোগ্যপণ্য আজ মার্কিন জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ। হিসেব করে দেখা গেছে যে ১৯৫৩-৫৭ সালে প্রধান স্থায়ী ভোগ্যপণ্যগুলি এবং বসতবাড়ির উপর মোট ব্যয় শিল্প-বাণিজ্যে মোট বিনিয়োগের চেয়েও ২০ শতাংশ বেশী ছিল। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনে স্থায়ী ভোগ্যপণ্য অভূতপূর্ব গুরুত্বলাভ করেছে। অনেকে মনে করেন যে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের এই গুরুত্ববৃদ্ধি ধনতন্ত্রের সুস্থিত সমৃদ্ধির পক্ষে কল্যাণসূচক। কারণ, যখনই বিনিয়োগ বাড়ন্ত হবে, সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের উপর গার্হস্থ্য ব্যয়ের মাত্রাবৃদ্ধিতে নিয়োগ করে সঙ্কটের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত কয়েকটি মন্দার সময়ে মোটরগাড়ী এবং বসতবাড়ির উপর ব্যয়বৃদ্ধিই প্রধান ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

ধনতন্ত্রের সঙ্কটনিরোধে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ভূমিকা সম্পর্কে অবশ্য কয়েকটি প্রশ্ন তোলা যায়। প্রথমত, প্রাথমিক ব্যয়ের বিপুলতা, ভোগ্যসামগ্রীর অবিভাজ্যতা, বাজার মূল্যের উত্থানপতন, খাদকের প্রত্যাশা এবং রুচির অস্থৈর্য ইত্যাদি কারণে ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয় বাণিজ্যচক্র নিরসনে সাহায্য না করে এবং কখনও কখনও বাড়তি চিন্তার কারণ হতে পারে। তাছাড়া ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয়ের একটা বড় অংশই ঋণের উপর নির্ভর করে। সহজ কিস্তিতে মূল্যশোধের লোভনীয় সুযোগ এমন অনেক ভোগ্যপণ্যকে ক্রেতার নাগালে এনেছে যা পূর্বে তার ক্রয়ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। গত দশকে ব্যক্তিগত আয় যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে খাদকঋণের বৃদ্ধির হার ছিল তার তিনগুণ। কিন্তু সমস্যা এইখানেই। ভোগ্যপণ্যের উপর ঋণনির্ভর ব্যয় যে শিল্পবাণিজ্যে ঋণনির্ভর বিনিয়োগের মতই চপল এবং অনিশ্চিত থাকবে না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে একটি সাধারণ মার্কিন পরিবার তিন মাসের আয়ের অভাবেই সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় আর্থিক জীবনে সামান্য বিপর্যয়েই ঋণনির্ভর ভোগ্যব্যবস্থার এই বিরাট সৌধ ভেঙে পড়তে পারে। এসব ছাড়াও ভবিষ্যৎকে বন্ধক দিয়ে তাৎক্ষণিক সঙ্কটত্রাণের এই প্রয়াস কতদূর দূরদর্শিতার পরিচায়ক বা অদূর ভবিষ্যতে স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের চাহিদার মাত্রাবৃদ্ধির অবকাশ অপরিমিত কিনা সেই সম্পর্কেও প্রশ্নাতীত নিশ্চয়তা নেই।

মোট চাহিদার আর একটি বড় অংশ হচ্ছে শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগ। এই বস্তুটি চিরকালই কিঞ্চিৎ চঞ্চল, যদিও সাম্প্রতিকালের কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্কার এবং বাণিজ্যচক্র

সম্পর্কে শিল্পপতিদের অধিকতর সচেতনতার ফলে এই চঞ্চলতা হ্রাস পাওয়ার কথা। তবে ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসে চিরকালই সাফল্য ও সমৃদ্ধির দূত হয়ে এসেছে বিজ্ঞানের সহায়তায় উৎপাদনপ্রথায় মৌলিক পরিবর্তন। উনিশ শতকের বাষ্পচালিত যান, বিদ্যুৎ, মোটর এবং রসায়নের মাধ্যমে উৎপাদনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে। যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্রেও আণবিক শক্তি, ইলেকট্রন, সংশ্লিষ্ট (synthetic) দ্রব্যাদি প্রভৃতির ব্যবহারে উৎপাদনশক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নতুন নতুন শিল্পের উদ্ভব হয়েছে। অনেকের ধারণা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যদি এইভাবে ছোটখাট শিল্পবিপ্লব প্রায়শই সংঘটিত হয়, তবে ধনতন্ত্রের পৌনঃপুনিক সঙ্কটত্রাণের একটা সুরাহা হয়। কিন্তু এখানে বলা যেতে পারে যে উৎপাদনব্যবস্থার নবীকরণ মাত্রই বর্ধিত হারে বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বিশাল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যদি আণবিক শক্তি ব্যবহার করা যায় তবে মূলধনের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং সেই সঙ্গে বিনিয়োগে ব্যয় তথৈব কম হয়। এছাড়াও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন-সাধনের অর্থ বহুলাংশেই আসে আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ স্ফীতকায় সংস্থান থেকে। তাই নূতন নীট বিনিয়োগের প্রয়োজন অনেক কম হয়। বিনিয়োগের অপ্রাচুর্যের চিরন্তন উদ্বেগ থেকে ধনতন্ত্রের নিষ্কৃতি নেই।

এরপর শিল্পবাণিজ্যের মোট ব্যয়ের যে অংশ নানাপ্রকার অপচয়মূলক কার্যে নিঃশেষিত হয়, তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ভোগ্যপণ্য সম্পর্কে তথ্যপরিবেশনে এককালে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু আজ সাধারণ ক্রেতা ম্যাডিসন এভিনিউর হাতে ক্রীড়নক মাত্র। নানাপ্রকার ছলাকৌশলে ক্রেতার অবচেতনমনের অন্ধকারেও বিজ্ঞাপনের পরিক্রমা। ক্রেতার ভোগবাসনার কৃত্রিম উদ্দীপনে এবং সৌখীনতার চটুল মান নিয়ন্ত্রণে বিজ্ঞাপন আজ সর্বশক্তিমান। গত কয়েক দশকে বিজ্ঞাপনের ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে; ১৯২৯ সালে এই খাতে খরচ হত ১১২ কোটি ডলার, আর এখন ১২০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি। পাকার্ড লিখছেন যে সমস্ত মার্কিন জীবনযাত্রা আজ এই অপচয়ের নেশায় আচ্ছন্ন। এর নৈতিক ফলাফলের কথা ছেড়ে দিলেও অর্থনৈতিক জীবনে এই অপচয়প্রবণতা উৎপাদনের গুণগত উৎকর্ষবৃদ্ধির পরিপন্থী এবং সেইহেতু আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের বিক্রয়যোগ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর।

সর্বশেষে সরকারী ব্যয়। মার্কিন অর্থনৈতিক জীবনে সরকারী ব্যয় এবং অন্যান্য আর্থিক নীতির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পঞ্চাশ বছর আগে মোট সরকারী ব্যয় ছিল জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ, ১৯৫৭ সালে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশে। মোট জাতীয় ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশেরও বেশী সরকারের আয়ত্তে থাকায় চাহিদার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকার অর্থনৈতিক স্থৈর্যসাধনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

সরকারী ব্যয়ের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের অংশই বৃহত্তম। ১৯২৬-৩০ সালে এই ব্যয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ০·৮ শতাংশ, বর্তমানে তা ১০ শতাংশের কাছাকাছি। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে বর্তমানে জাতীয় আয়ের যে বৃহৎ অনুপাত প্রতিরক্ষায় ব্যয় হয় সেই অনুপাতে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে খুব বেশী বৃদ্ধি পাবে না। সরকারী ব্যয়ের আর এক অংশ যায় অন্যান্য দেশকে সামরিক এবং অর্থনৈতিক কারণে সাহায্যদানে। তবে এর মাত্রা নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং আন্তর্জাতিক শীতল সমরের তাপমাত্রার উপর। অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্যদানের ব্যাপারে মীরডাল পশ্চিমের ধনী

দেশগুলির জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার কথা উল্লেখ করেছেন। সামাজিক নিরাপত্তা (social security) সাধনের উদ্দেশ্যে কিছু সরকারী অর্থ ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি করে। এই ব্যয় নীট ব্যক্তিগত আয়ের ১ শতাংশ ছিল ১৯২৯ সালে, আর ১৯৫৮ সালে ৬·৫ শতাংশ। এই ব্যয় বিস্তারের এখনও প্রভূত অবকাশ আছে। তারপর স্কুলকলেজ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ও হাসপাতাল নির্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কার্যেও সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির দুরবস্থা নিয়ে অনেকেই আক্ষেপ করেছেন। মুনাফার প্রত্যাশা যেখানে কম, বেসরকারী উদ্যোগের সেখানে স্বাভাবিক শৈথিল্য। প্রসঙ্গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এক মার্কিন ট্যাঙ্কচালক সরল মনে যে একটি প্রশ্ন করেছিল তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সে জিজ্ঞাসা করেছিল যে যদি মৃত্যুর উপকরণে ('instruments of death') অজস্র ব্যয় করে যুক্তরাষ্ট্র তার সমৃদ্ধি বজায় রাখতে পারে তবে বাঁচবার উপকরণে ('instruments of life') ব্যয় করেও সেই উদ্দেশ্য কেন সাধিত হবে না। এই প্রশ্নের উত্তরে এক রাজনৈতিক সমস্যা নিহিত আছে যা আমরা একটু পরেই আলোচনা করছি। কিন্তু তা ছাড়াও জীবনের উপকরণের চেয়ে মৃত্যুর উপকরণ নির্মাণ অনেক বেশী মহার্ঘ, অর্থাৎ চাহিদার ঘাটতিপূরণে মারণাস্ত্রের কার্যকারিতা অনেক বেশী। (উদাহরণ : একটি আধুনিক বোমারু বিমানের যা মূল্য তাতে ত্রিশটি শহরে একটি করে আধুনিক বিদ্যালয় নির্মাণের খরচ চালানো যেতে পারে বলে হিসেব করা গেছে।)

আমরা দেখলাম যে সাম্প্রতিক কালে যদিও ধনতন্ত্রে মন্দা-প্রতিরোধশক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি মন্দার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অপসৃত হয়েছে এমন নিশ্চয় করে বলা যায় না। এখনও এবং গত বেশ কয়েক বৎসর ধরেই কর্মহীন শ্রমিকের বার্ষিক গড়পড়তা হার ৪ শতাংশেরও বেশী। তবে আর কিছু না হক সামাজিক নিরাপত্তা এবং নানা জনহিতকর কার্যে সরকারী ব্যয়ের মাত্রাবৃদ্ধি ভবিষ্যতে সংকটত্রাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হতে পারে।

এখানে মার্ক্সবাদীদের একটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি সরকারের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত। মার্ক্সবাদীদের মতে ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র ধনিকসম্প্রদায়ের হাতে তাদের শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির একটি উপকরণ মাত্র। সরকারী ব্যয়ের প্রসার এবং অর্থনৈতিক জীবনে সরকারের হস্তক্ষেপ যদি ব্যক্তিগত মালিকানার সামান্যতম স্বার্থবিরোধী হয় তবে ধনিকসম্প্রদায় তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। ইতিহাসে নাকি এর সাক্ষ্য মেলে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে ধনিকস্বার্থের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ধনিকশ্রেণীর এই প্রভাব সম্পূর্ণ অপ্রতিহত নয়, শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য শ্রেণীও সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট এবং যদিও ধনিক-সম্প্রদায় প্রায়শই আর্থিক এবং সাংগঠনিক দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী, অন্যান্য স্বার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা আজ কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়াও শ্রেণীস্বার্থসংঘাত যার উপর মার্ক্সবাদীরা নাটকীয় গুরুত্ব আরোপ করেন তা' আজকের সমৃদ্ধ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পটভূমিকায় কতদূর প্রকট সেই সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। যেভাবে বিভিন্ন দেশে রক্ষণশীল দলগুলি সরকারী হস্তক্ষেপের মাত্রাবৃদ্ধি স্বীকার করে নিচ্ছে এবং যেভাবে শিল্পজাতীয়করণ ইত্যাদি কয়েকটি প্রধান বিষয়ে বামপন্থীদের প্রাক্তন উগ্রতা স্তিমিত হয়ে এসেছে, তাতে মনে হয় রাষ্ট্রনৈতিক স্তরে শ্রেণীসংঘাতের প্রখরতা অনেক কমে এসেছে। মীরডালের মতে :

'We are now witnessing a fundamental convergence in our thoughts and aims . . . The internal political debate in these countries is becoming increasingly technical in character ever more concerned with detailed arrangements, and less involved with broad issues, since these are slowly disappearing.'

তবে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে সরকারী ব্যয় এবং আর্থিকনীতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল যে সমাজব্যবস্থা তা' সত্যিকারের ধনতন্ত্র বলা চলে কিনা। যেখানে প্রায়শই সংকটত্রাণের জন্য বিনিয়োগের একটা বড় অংশ সরকারের কুক্ষিগত হয় (কেইন্‌সের ভাষায় 'a somewhat comprehensive socialisation of investment') এবং যেখানে সরকারের বিভিন্ন নীতি আর্থিক জীবনকে নানাদিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে বেসরকারী প্রয়াসের নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। মীরডালের ভাষায় :

It will, as time goes on, be less and less possible to maintain that ours is a 'free' or a 'free enterprise' economy, with exceptions for a certain number of acts of state intervention. The exceptions are gradually becoming the rule. As a matter of fact, ours is a rather closely regulated society, leaving a certain amount of free enterprise to move within a frame set by a fine-spun system of controls, which are all ultimately under the authority of the democratic state.

অনেকে বলেন যে সাম্প্রতিক কালে ধনতন্ত্রে আয়বণ্টনব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক বেশী সুষম হয়েছে এবং সেই হিসেবে মার্ক্সীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনেকাংশেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। পরিসংখ্যানের সাক্ষ্য নিলে দেখা যায় যে ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে মোট লোকসংখ্যার নিম্নতর দুই-পঞ্চমাংশ মোট ব্যক্তিগত আয়ের যে অংশ পেত, তা' ১৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ শতাংশ হয়েছে, এবং ঊর্ধ্বতম এক-পঞ্চমাংশের আয় ৫৪ শতাংশ থেকে কমে ৪৫ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পরিসংখ্যানে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আয়ের হিসেব আছে, জাতীয় আয়ের যে বর্ধিষ্ণু অংশ কোম্পানীর সঞ্চয়, অলব্ধ মূলধন মুনাফা (unrealised capital gains), এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানিক আকারে ধনিকসম্প্রদায় আত্মসাৎ করেন তার কোন হিসেব সেখানে থাকে না। মোট একথা বলা যায় যে যদিও কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে, আয়বণ্টনব্যবস্থার এমন কোন চূড়ান্ত রদবদল হয় নি।

অনেকে আবার বলেন যে বর্তমানে কোম্পানীগুলির শেয়ারের মালিকানা জনসাধারণের মধ্যে বহুবিস্তৃত এবং স্বভাবতই এই বারোয়ারী ধনতন্ত্রে (People's capitalism) ধনবন্টনের অসাম্য অনেক কম। এই মর্মে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যদি কোন আমূল পরিবর্তনের কথা কেউ কল্পনা করেন তবে তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে এই ধারণা সম্পূর্ণই অলীক। কোম্পানীগুলির অংশীদার মোট লোকসংখ্যার যে অংশ, ১৯৩০ সালের তুলনায় ১৯৫৬ সালে তা' কমে গেছে, সকল শ্রমিক পরিবার মিলে মোট শেয়ারের ০·৩ শতাংশ মাত্রের স্বত্ব ভোগ করেন এবং ১৯৫২ সালে সকল অংশীদারের ৮ শতাংশ (অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার ১ শতাংশের কম) মোট শেয়ারের ৮০ শতাংশেরও অধিকের মালিকানা ভোগ করেন। স্পষ্টতই কোম্পানীগুলির স্বত্বের প্রধান অংশ এখনও স্বল্প লোকের আয়ত্তে।

কোম্পানীগুলির স্বত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। একথা প্রায়শই শুনতে পাওয়া যায় যে আধুনিক ধনতন্ত্রে কোম্পানীর মালিকানা এবং পরিচালনা পৃথক্। পরিচালনার ভার যে বেতনভুক্ ম্যানেজারদের হাতে তাদের কোম্পানীতে কোন স্বত্বস্বার্থ নেই। কিছুকাল আগে জেম্স বার্নহাম ম্যানেজারীয় বিপ্লবের দুর্নিবার আসন্নতার কথা উল্লেখ করে এই ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে সম্প্রতি একাধিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এখনও প্রধানত অংশীদারদের হাতেই এবং পরিচালক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বহুলাংশেই অতিরঞ্জিত।

এর পর আসা যাক আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রায়নের প্রশ্নে। অ্যাডাম স্মিথ ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সময় ধনতন্ত্র ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির সমাজ। রঙ্গমঞ্চ এখন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। শিল্পবাণিজ্য এখন মুষ্টিমেয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কায়েমী নিয়ন্ত্রণাধীন। আদি ধনতন্ত্রের প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনব্যবস্থা এখন ইতিহাসের ভগ্নস্তূপে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে এই পরিবর্তনের শুরু এবং আজ পর্যন্ত এর অব্যাহত জয়যাত্রা পরিসংখ্যানগত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

একচেটিয়া ধনতন্ত্রে আদি ধনতন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ে, সমস্ত উৎপাদনব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী অনমনীয় এবং আড়ষ্ট হয়ে পড়ে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দতা কমে আসে। একথা ঠিক যে বর্তমানে উৎপাদনপ্রযুক্তির নবীকরণে যে বিপুল সঞ্চয়, ব্যাপক গবেষণা এবং নিরাপদ বাজারের প্রয়োজন তা' কেবল একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে একই কারণে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পথ প্রায়শই রুদ্ধ থাকে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার মত আধুনিক উৎপাদনপ্রযুক্তির প্রগতিতেও ব্যক্তির ভূমিকা সঙ্কীর্ণ, নৈর্ব্যক্তিক সঙ্ঘবদ্ধতারই প্রাধান্য। আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে তাই দেখতে পাই শুম্পীটারিয়ান entrepreneur এর উদ্যোগী নেতৃত্বের পরিবর্তে বিশেষজ্ঞদের দলীয় প্রয়াসের যান্ত্রিকতা, শিল্পবাণিজ্যে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ—যা' ছিল এককালে বুর্জোয়া সভ্যতার প্রাণশক্তি—তা' আজ দ্রুত অবলুপ্তির পথে।

এই প্রসঙ্গে আধুনিক সমাজে ব্যক্তির মূল্যায়নের বৃহত্তর প্রশ্নের অবতারণা করা অযৌক্তিক হবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্র ছিল নিতান্তই অন্তর্মুখী (inner-directed) ব্যক্তির ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতা ও কৃতিত্বের ইতিহাস, কিন্তু আধুনিক মানুষ সমাজের বিশাল উৎপাদনের ক্ষুদ্র এক যান্ত্রিক উপকরণমাত্র। আধুনিক সংগঠনের বিশালতায় ব্যক্তি হারিয়ে যায়, ব্যক্তিগত প্রয়াস, ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর ব্যক্তিগত স্বার্থ, যা' থেকে আদি ধনতন্ত্রের উৎসার, সব যায় তলিয়ে।

মার্ক্সবাদীরা বলেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গত কয়েক দশকে এমন কিছু মৌলিক প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয় নি। ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ তাঁরা করেন উদ্বৃত্ত মূল্যের মালিকানার উপর ভিত্তি করে; এই মালিকানা সামন্ততন্ত্রে ছিল জমিদারশ্রেণীর হাতে, ধনতন্ত্রে ধনিকশ্রেণীর হাতে, এবং সমাজতন্ত্রে সার্বিক সমাজের হাতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ধনতন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই: অধ্যাপক শিগেতো সুরুর এই অভিমত। কিন্তু ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার জটিল প্রশ্নের বিশদ আলোচনা না করেও একথা বলা যায় যে ইতিহাসে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন কেবল উদ্বৃত্তমূল্যের স্বত্ব হস্তান্তরের উপর নির্ভর করে না। মালিকানা বদল নিঃসন্দেহে ইতিহাসের

অনেক নাটকীয় ঘটনার সূত্রপাত করেছে, কিন্তু মানবসভ্যতার বিকাশের দিক থেকে সমাজব্যবস্থার সত্যিকারের মৌলিক পরিবর্তন তখনই হয় যখন সামাজিক কাঠামোয় ব্যক্তিগত মানুষের স্থান সম্পর্কে নতুন কোন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এই দিক দিয়ে সাম্প্রতিক ধনতন্ত্র থেকে আদি ধনতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট এবং গভীর। ক্রমবর্ধিষ্ণু শিল্পোৎপাদনের সাংগঠনিক প্রয়োজনে উৎপাদনব্যবস্থায় এবং পরিশেষে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির যে নবমূল্যায়ন ক্রমশ সমাজে ব্যাপ্ত হচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের সমস্যাকে বিচার করতে হবে।

প্রণবকুমার বর্ধন

Wonderful Clouds. *By* Francoise Sagan. Translated by Anne Green. John Murray. London. 10*s*. *6d*.

প্রথম উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই সৌভাগ্যের স্বর্গে উত্তরণ যাদের সম্ভব হয়েছে, শ্রীমতী ফ্রাঁসোয়াজ সাগাঁ তাদের অন্যতম। প্রায় আট বছর আগে, তাঁর প্রথম গ্রন্থ *Bonjour Tristesse* প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর তদানীন্তন বিষাদ প্রার্থনা, যন্ত্রণাকাতর কৈশোরের উদ্ভাস এক অপূর্ব ব্যতিক্রম। স্মর্তব্য, তখনও তিনি কুড়ির কোঠা অনুত্তীর্ণ। এই উপন্যাস প্রকাশে সকলেই আশা করেছিলেন, তিনি রাজনৈতিক আলোড়ন অথবা কফিখানার দার্শনিকতার ঝড় এড়িয়ে সাধারণ জীবনের হাসি বেদনার একটি সুন্দর অধ্যায় ফরাসী সাহিত্যে যোগ করবেন।

কারও সে প্রত্যাশা পরিপূরণ হয়নি। তাঁর পরবর্তী সংযোজনা *A Certain Smile* অথবা *Those Without Shadows* পূর্ব সম্ভাবনার অক্ষম পরিপূরক। তাঁর সাম্প্রতিক লেখায় বিষণ্ণতার সেই ধূসর ছায়া আর কোথাও পড়েনি। কান্নার সেই সম্মোহন অপসৃত।

আলোচ্য উপন্যাস *Wonderful Clouds*-ও তাঁর প্রচিন্তার এক দীন স্বাক্ষর। তাঁর মানসিকতা অপরিণত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। জীবনের বিস্তৃত দিগন্ত, যা' মেঘে, রঙে অপূর্ব, তাঁকে আকর্ষণ করেনি। গ্লানির প্রচ্ছন্ন অন্ধকারে তিনি আলোর রহস্য অনুসন্ধানে প্রয়াসী।

উপন্যাসটির দৃশ্যপট ফ্লোরিডা, নুা-ইয়র্ক এবং পরিশেষে পারী। ঘটনার প্রধান নায়ক ও নায়িকা চিত্রকর অ্যালান অ্যাস ও তার স্ত্রী জোসে।

এমন বৃহৎ পটভূমি সত্ত্বেও ঘটনার সংস্থাপনা, চরিত্র সন্নিবেশ অথবা মানব-সম্পর্কের আন্তরাশ্রয়ী অন্বিষ্টা—উপন্যাসের এ-জাতীয় মৌল সব লক্ষণই এই গ্রন্থে অনুপস্থিত।

অ্যালান মার্কিন এবং তার স্ত্রী ফরাসী। ফ্লোরিডায় জোসে প্রথম অনুভব করল, সে তার স্বামীকে ভালবাসে না। সে সমুদ্রের মুক্ত হাওয়া চায়। উদ্দাম জীবন চায়। তাই তার মন অ্যালানের অস্থির বৃত্তের আকর্ষণ উপেক্ষা করে। সমুদ্রে রিকার্ডোর সঙ্গ লিপ্সা তার কাছে দুর্বার।

সম্ভবত সে কারণেই সে বার্নার্ডের কাঁধে মাথা রেখে মুক্তি প্রার্থনা করে।

অ্যালানও অবশ্য স্বামীত্বের আদর্শে অবিশ্বাসী। ইভ-কে তখন সে তার অস্তিত্বে

জড়িয়েছে।

তাই তার পক্ষে ঘোষণা করা সহজ—

I've called up my lawyer . . . I told him divorce on ground of mutual misconduct, or just mine.

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, উভয়পক্ষের সম্মতি সত্ত্বেও তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়নি। তারা দু' জনই এসে তখন ন্যু-ইয়র্কে আশ্রয় গ্রহণ করল। তারপর একদিন, জোসে একা পারীর পথে পা বাড়াল।

এখানে শ্রীমতী সাগাঁর বক্তব্য অস্পষ্ট। বিবাহ কি সম্মোহন, না এক প্রয়োজনীয় অভ্যাস। যাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়?

উপন্যাসের অবশিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ পারী, তার গ্রামাঞ্চলের বাড়ি ঘিরে। পারীতেই জোসে এক পানসভায় সিভেরিনের সাক্ষাৎ লাভ করে। এমনকি অ্যালানেরও। কয়েকদিনের অনুপস্থিতির পর সে তখন সেখানে উপনীত। এই পানসভায় লরার সঙ্গে তার পরিচয় হল। লরা তখন বিগত যৌবনা, কিন্তু যৌবনের প্রতি তার আকর্ষণ এক অতৃপ্ত অনুষঙ্গ।

প্রথম দর্শনের পরই লরার অ্যালানকে মনে হল, সে তার এক নূতন পুতুল। তাকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারবে, খেলতে পারবে যেমন ইচ্ছে তেমন করে। তাই 'ভো'-এ সে সকলকে নিমন্ত্রণ জানাল।

লরা ও অ্যালানের প্রথম পরিচয়ের চিত্রটি শ্রীমতী সাগাঁ সুন্দর এঁকেছেন। বার্নার্ড বলছে—

'It seems to be going off very well.'

'What?'

'Laura and Alan. Look.'

Did you see her expression?'

বার্নার্ডের ভাষ্য : That's called passion. Passion as expresed by Laura Dort. Love at first sight, darling.'

এখানে জোসের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উল্লেখ্য : 'Poor thing'.

'ভো'-এর গৃহে, নূতন দৃশ্যপটে জোসে পুরনো স্মৃতির রেখা দেখতে পায়। এক নয়, একাধিক বন্ধুর সঙ্গে সে এখানে যাপন করেছে। এখানেই মার্ক প্রথম জোসের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুযোগ পায়।

সর্বশেষ দৃশ্য হল লরার ফ্ল্যাট। অ্যালান অ্যাসের চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন রজনী। অনেক অতিথি সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে। এমন কি মার্কও।

জোসের রক্তে আবার সেই পুরনো প্রবাহ : 'They looked at one another in the mirror. He seemed delighted with herself. She gave a little laugh, kissed his cheek and went out first. She knew that behind her he would be lighting a cigerette, giving his hair a final pat and would walk out at last looking so thoroughly unconcerned that the least attentive observer have become suspicious. But who would imagine that on the very day of her young and handsome husband's exhibition, Josée Ash would make love . . . . with an old friend that

she was not in love with? That she had never loved? Even Alan would not think of it.'

অবশ্য ব্যঙ্গোক্তি সত্ত্বেও অ্যালানের কাছে প্রশ্নের উত্তরে সবই বলেছে জোসে। কিছুই বাকী রাখেনি।

কিন্তু আশ্চর্য, অ্যালন ঈর্ষা বোধ করেনি। সহসা হাঁটুমুড়ে বসে। তারপর তার কাতরোক্তি, what I have done—what I have done to you? I wanted all of you . . . I wanted the worst.

জোসের উত্তর : 'I could not keep it up'.

অথচ শেষবারের মত অভ্যস্ত আশ্রয়ে অ্যালানের ফিরে যাবার চেষ্টা লক্ষ্যণীয়। 'It was a mistake'.

হয়ত শ্রীমতী সাগাঁ-ই ঠিক। আমরা বারেবারে অভ্যাসের বিন্দুতে ফিরে যাই। আবার নূতন বৃত্ত রচনা করি সেই একই বিন্দুকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু অ্যালানের কথার উত্তরে জোসে যখন বলে, It would always be like that, the game is over. তখন সংশয়ের প্রশ্ন স্বাভাবিক—সত্যি কি তাই? অবশ্য এর উত্তর অন্বেষণের মত মানসিক শক্তি লেখিকার নেই।

উপন্যাসটি আদ্যন্ত পাঠের পর হতাশা বোধ করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় থাকে না। কোনো গভীর বোধ, জীবনের কোনো বেদনাবোধ—যা একদা সাগাঁর অনন্য আশ্রয় ছিল, তার অভাব মর্মান্তিক।

যতদূর মনে পড়ে, দেশের ঝড় লেখিকার গায়েও একবার লেগেছিল। আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকামী বন্দীদের তিনি মুক্তি দাবী করেছিলেন। বন্দীনিগ্রহের অবসান এবং কুৎসিত ফাসিস্তদের তিনি বিচার দাবী করেছিলেন। পারিপার্শ্বিকের এই ছোঁওয়া যখন তাঁকে বিভ্রান্ত করে, তখন কি করে সম্ভব তাঁর পক্ষে রিরংসায় অবগাহন?

এতদসত্ত্বেও শ্রীমতী সাগাঁর লেখা স্থানে স্থানে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বিশেষ করে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির সংযোজনা।

নৃপেন্দ্র সান্যাল